মেঘে মাটিতে

প্রতিমা ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মূল্য— তিন টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
পি ১৬, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

আমাদের আত্মীয় এবং সুহৃৎ
সুকবি শ্রীনরেন্দ্র দেবের করকমলে —

আমাদের ভ্রমণের ঘরোয়া-বিবরণটুকু
ঘরের মানুষ হিসাবেই
আপনার হাতে তুলে দিলাম।

আপনার স্নেহের
প্রতিমা

নিবেদন

আমার সর্বপ্রথম নিবেদন, আমি 'লেখিকা' নই। সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ আছে বটে, কিন্তু নিজে সাহিত্যশিল্পী নই। আমার প্রথম লেখা এই ভ্রমণবৃত্তান্ত, সাহিত্য-রচনার মানদণ্ডে, উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-কাহিনীর গুণ ও লক্ষণের দিক দিয়ে বিচার করলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে।

বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার সময়ে আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ অনুরোধ করেছিলেন, প্রতিদিনের বিবরণ লিখে আনার জন্য। এর আগে ডায়েরি লেখারও অভ্যাস আমার ছিল না।

পথে পথে, দেশে দেশে দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে কখনও হোটেলের ঘরে বসে, কখনও বা আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় বিমানে বসে ডায়েরি লিখতাম। আমাদের ভ্রমণপথে প্রতিদিনের সুবিধা অসুবিধা, দুঃখ সুখ, আনন্দ বিস্ময়ের বিবরণ সংক্ষেপে খাতায় চিহ্নিত ক'রে রাখতাম। এই বিবরণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের জন্যই লিখে এনেছিলাম। একে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। কিন্তু নিজের যথেষ্ট দ্বিধা ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও, আত্মীয় বন্ধুগণের উৎসাহে ডায়েরিখানি 'মহিলা' মাসিকপত্রে ১৩৫০ সালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এর জন্য অনেকটা অপরাধী। হিন্দু-পরিবারের অন্তঃপুরিকা মেয়ের পৃথিবী বেড়িয়ে আসার সহজ সরল অনাড়ম্বর বিবরণ নাকি অনেকেরই ভাল লাগবে এই ছিল তাঁর অভিমত। রচনাক্ষেত্রে, একজন অজ্ঞাতনাম্নীর লেখাকে যথেষ্ট সমাদরে ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থাই শুধু তিনি করেন নি, 'মহিলা'য় প্রকাশিত ছবির কয়েকখানি ব্লক তিনি আমাকে এই বইতে ব্যবহার করতে দিয়েও উপকৃত করেছেন।

ডায়েরিতে যখন এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলাম, তখন কল্পনা করিনি এগুলি ছাপার হরফে উঠবে এবং শেষপর্যন্ত বইয়ের আকৃতি ধারণ করবে। 'মহিলা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত সেই রচনা আজ আবার পুস্তক আকারে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল, আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ ঘোষের একান্ত আগ্রহে। এর মধ্যে আরও এক ব্যক্তির প্ররোচনা

আছে, তিনি আমাদের পরম আত্মীয় এবং একান্ত সুহৃৎ কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব। বিদেশ-যাত্রার দিন, তিনি দমদম্ বিমানক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয়-গণের সঙ্গে আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন। সেদিন বিমানক্ষেত্রেই বসে তিনি স্লিপ্ কাগজে একটি বিদায়-অভিনন্দন কবিতা রচনা ক'রে আমাদের হাতে উপহার দেন। বিমানে উঠে, অজানার পানে আকাশে ভাসতে ভাসতে, সেই কবিতাটির আন্তরিকতা আমাদের হৃদয়-স্পর্শ করেছিল। বিদেশযাত্রার স্মৃতির সঙ্গে কবিতাটি বিশেষভাবে জড়িত ব'লে সেটি এই বইতে সযত্নে তুলে রাখলাম আমরা দু'জনে।

পরিশেষে বক্তব্য, ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় আমি রং চড়াবার চেষ্টা করিনি। ঘরোয়া মেয়ের চোখে ও মনে বৃহত্তর বিশ্ব যে সহজরূপে ধরা দিয়েছে সেই সহজের উপর আমি ভৌগোলিক তথ্য, ঐতিহাসিক নজীর, প্রত্নতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক বিবরণের গুরুভার চাপাই নি। এ লেখা সকলের না হোক, দু'চার জনেরও যদি ভাল লাগে তাহলেই আমার সার্থকতা।

মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় বইখানি প্রকাশের ভার নিয়ে এবং নাভানা প্রেসের শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় বইখানির মুদ্রণ-ব্যাপারে সহযোগিতা ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন।

প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করেছেন, প্রচারদক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গো-পাধ্যায়। সেই পরিকল্পনাকে রেখা ও রঙে রূপ দিয়েছেন, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশ পাল। মেসার্স বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোম্পানী খুব কম সময়ের মধ্যেই তৎপরতার সঙ্গে ব্লকগুলি তৈরি ক'রে দিয়েছেন। বইখানির নামকরণ ক'রে দিয়েছেন, সুকবি রাধারানী দেবী। প্রসাধন-কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। এঁদের সকলের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।

মহালয়া, ১৩৫৮

৬৫।২ হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা ২৯

বিনীতা
প্রতিমা ঘোষ



বিদায় অভিনন্দন

বিশ্ব-বিহারে চলেছ দুজনে আকাশ-পথে,
ময়দানবের মেঘলোকচারী পুষ্প রথে;
শুভকামনার অর্ঘ্য এনেছি আমরা তাই,
সাধ হয় মনে তোমাদের সনে উড়িয়া যাই।

সাগর-মেখলা পৃথিবী বিপুলা ঘুরিয়া আসি,
রমণীয় এই ধরণীর রূপ ভাল যে বাসি।
ভুবন ভ্রমিয়া ফিরিবে তোমরা এ গৌরবে
পুলকিত যত আত্মীয় আর বন্ধু সবে।

তোমাদের মুখে ভ্রমণ-ভাষণ শুনিতে চাই,
উৎসুক প্রাণে চাহি পথপানে রহিনু তাই।
ধরা-বিচরণ শেষে নিজ দেশে ফিরিলে পরে
আসিব আবার স্বাগত জানায়ে বরিতে ঘরে।

আজ শুধু দূর বিরহ-বেদনা উথলে বুকে,
শিব হোক তব পন্থ, প্রবাসে রহিও সুখে।

শুভার্থী
নরেন্দ্র দেব

দমদম বিমান-ক্ষেত্র
৯ই মে ১৯৪৯

মিশরে

সোমবার, ৯ মে ১৯৪৯, সকাল আটটা। বিমানপথে ॥

গত কাল এই সময়ে আমরা কলকাতায় বালিগঞ্জের বাড়িতে। বহু আত্মীয়-বন্ধুর সমাগমে বাড়ি মুখরিত। মনের মধ্যে আলোড়িত হয়ে চলেছে দারুণ উত্তেজনা, আশঙ্কা অথচ আনন্দমিশ্রিত এক অননুভূতপূর্ব অনুভূতি। আজ ঠিক সেই সময়েই উড়ে চলেছি মেঘলোকের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে নীলনদের কূলে মিশরদেশের পানে।

কাল যখন আমরা দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছলাম, বিদায় দেওয়ার জন্য সমাগত আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে দেখে মন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। তিনটি সন্তানকে এখানে রেখে একা চলেছি স্বামীর সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অজানা-অচেনা দেশদেশান্তরে পাড়ি দিতে।

সন্তানসন্ততির কাছছাড়া হওয়া জীবনে আমার এই প্রথম। বড় ছেলেটির তবু বাবা-মাকে ছেড়ে দূরে থাকার মত বয়স ও বুদ্ধি হয়েছে। ছোট মেয়েটি এবং ছোট ছেলেটির পক্ষে বাবা-মা উভয়কেই ছেড়ে দীর্ঘদিন অন্যের কাছে থাকা কতটা সহনীয় ও সম্ভবপর হবে স্পষ্ট আন্দাজ করতে না পেরে আমি মনে মনে বেশ একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম। বিশেষ ক'রে আবার ছোট ছেলে-মেয়ে দুটির স্বাস্থ্য খুব দুর্বল এবং স্পর্শকাতর। যদিও তাদের নিরাপত্তার জন্য আমি যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত ক'রে এসেছি, তবুও মন হতে ব্যাকুল শঙ্কা নির্মূল করা সম্ভবপর হয়নি।

তাই কাল দমদমে Air Indiaর বিমানে ওঠার জন্য যখন

ডাক এলো, আমি আশপাশে কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা সামনের পানে চেয়ে বিমানে এসে উঠেছিলাম।

বিমানখানি বত্রিশজন যাত্রী বসার উপযোগী। যাত্রিগণ আপন আপন আসনে এসে বসার পরে স্টুয়ার্ডেশ এসে পিঠের কাছে ছোট বালিশ দিয়ে গেল এবং ট্রেতে ক'রে টফী, লজেন্স্, চুইং-গাম্ প্রভৃতি দিয়ে, কানের ছিদ্র রুদ্ধ করার জন্য সবাইকে তুলা বিলি ক'রে গেল। তারপরে সামনেই লাল আলোর হরফে নোটিশ ফুটে উঠলো—'Bind Your Belt' এবং 'Smoking Prohibited.'

প্রত্যেক যাত্রীর চেয়ারের সঙ্গে চামড়ার চওড়া বন্ধনী (Belt) ছিল। আট্‌কে নিলাম সকলেই। উপরে ওঠার সময় একটু ঝাঁকুনি লেগেছিল। আমি মনে মনে খুবই ভয় পেয়েছিলাম 'না জানি কি হবে' গোছের। কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়নি। ঘণ্টাখানেক বাদে স্টুয়ার্ডেশ এসে কার্ড দিয়ে গেল, তাতে লেখা ছিল আমরা চৌদ্দ হাজার ফীট ঊর্ধ্বে উড়ে চলেছি ধরণীর মাটি হতে।

দুই পাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি, মেঘের রাজ্য। মাঝে মাঝে যখন খুব গাঢ় মেঘ বিদীর্ণ ক'রে বিমান অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটু ঝাঁকুনির মত অনুভব করছিলাম।

বেলা দেড়টার সময় স্টুয়ার্ডেশ এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো — আমিষ না নিরামিষ লাঞ্চ্ দেবে ? আমরা একটা আমিষ এবং একটা নিরামিষ ব'লে দিলাম। চেয়ারের হাতলের সঙ্গে টেব্‌ল্ তৈরি ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্প্রিংএর বোতাম টিপতেই টেব্‌ল খুলে গেল এবং তার উপরে লাঞ্চের বাক্স দিয়ে চলে গেল। নিরামিষ বাক্সটিতে

দু'টি শিঙাড়া, দু'টি কচুরি, লুচি, আলুর তরকারী, বেগুনী, জিলাপি ইত্যাদি অনেক রকম দেশী খাদ্য সুসজ্জিত। প্রত্যেকটি খাবার পাত্‌লা কাগজে মোড়া। বাক্সের সঙ্গে পাত্‌লা কাঠের ছুরি ও চামচ, একটি ক'রে কাগজের গ্লাস, লবণ, মরিচগুঁড়া — কিছুরই অভাব নেই।

আমিষ লাঞ্চের বাক্সটিতে মাংস, ডিম, আনাজ-সিদ্ধ, রুটি, মাখন, স্যাণ্ডুইচ্‌ আর কেক্‌। দু'টি বাক্সেই ফলের মধ্যে ছিল দু'টি ক'রে বড় বড় পাকা কলা। আমরা দু'রকম খাবারই দু'জনে ভাগ ক'রে মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। আমি যথেষ্ট পেট ভরেই খেয়েছি, তবুও দু'টি বাক্সেই যথেষ্ট খাবার পড়ে রইলো। একটু পরে স্টুয়ার্ডেশ এসে জিজ্ঞাসা ক'রে গেল, চা বা ফলের রস, কি খেতে চাই ? আমি চা খেলাম, উনি একগ্লাস লেবুর রস খেলেন। তারপর কৌটা থেকে মিঠাপাণ (বাড়ি থেকে উপহার পাওয়া) বার ক'রে মুখে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসা গেল। তখন বেলা ২টা ২০মিনিট।

উনি সারাটা দুপুর আরামে ঘুমিয়েছেন, আমি বসে বসে দেখেছি চারিদিকে তাকিয়ে। মধ্যে আর একবার স্টুয়ার্ডেশ জানিয়ে দিয়ে গেল, আমরা এখন বারো হাজার ফীট উঁচুতে উড়ে চলেছি।

৬টা ৫মিনিটে বম্বের মাটিতে এসে পদার্পণ করলাম। বিমানঘাঁটির বসবার জায়গায় গিয়ে আমি বসলাম, উনি গেলেন পাস্‌পোর্ট্‌ নিয়ে লগেজ্‌ দেখতে। বম্বের বিমান-ঘাঁটিটি আমাদের কলকাতার বিমানঘাঁটির তুলনায় ছোট, তেমন সুসজ্জিত ও আরামপ্রদও নয়। কতকগুলি রঙিন বাঁশের চেয়ার টেব্‌ল কুশান্‌ সাজানো আছে খানিকটা ঘেরা জায়গায়।

আমরা কলকাতা থেকে এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিমানে বম্বে এলাম। এদেরই গাড়ি ক'রে তাজমহল হোটেলে আমাদের নিয়ে গেল সমুদ্রের ধার দিয়ে। প্রায় সাড়ে সাতটার পরে আমরা হোটেলে পৌঁছলাম এবং হোটেলেরই নিচে অবস্থিত T. W. A. অফিসে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে যখন উপরে উঠে গেলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা। উনি বললেন — "ন'টার সময় এদের গাড়ি এখান থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাবে সাণ্টাক্রুজ বিমানঘাঁটিতে। তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরি হয়ে নাও এর ভিতর।"

মুখ হাত ধুয়ে শাড়িটা একটু আঁটসাট ক'রে নিয়ে দৌড়ে খেতে চ'লে গেলাম। তাজমহল হোটেল ডিনার বেশ ভালই দিয়েছিল। খেয়ে নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে ছু'জনে নীচের তলায় নেমে এসে T. W. A. অফিসে ব'সে পড়লাম। ভাবলাম, এখান থেকে পোস্টকার্ড লিখে ফেলে দিয়ে যাই বাড়ির ঠিকানায়। খোঁজ ক'রে দেখা গেল, ফাউণ্টেন্ পেন্‌টি ফেলে এসেছেন! যাই হোক্, তখনই যাবার ডাক পড়লো। T. W. A.র বাসে গিয়ে উঠলাম। এদের গাড়িটি চমৎকার। নতুন ধরনের। প্রায় রাত্রি সাড়ে ন'টায় বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে শুল্ক-অফিসের পরীক্ষা, স্বাস্থ্য-বিভাগের পরীক্ষা ইত্যাদি মেজাজ-তিক্তকর ব্যাপারগুলি চুকিয়ে আমরা যখন স্থির হ'লাম তখন রাত্রি পৌনে এগারটা। রাত্রি এগারটায় বিমান ছাড়বে, অতএব খাড়া পুতুল হয়ে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পালা। উনি বললেন—"লেমনেড্ বিক্রি হচ্ছে, খাবে নাকি?" ছুটোছুটি ক'রে আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, লেমনেড্ খেয়ে সুস্থ হওয়া গেল। ঠিক রাত্রি এগারটায়

বিমান ছাড়লো। T. W. A.র বিমান বেশ প্রকাণ্ড। পঞ্চাশজন যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা। চেয়ারগুলি এবং চারিদিকের ব্যবস্থাও খুব আরামপ্রদ। এপাশে-ওপাশে কলকব্জার ব্যাপার কিছুই আমরা বুঝি না। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে চেয়ার-খানি একেবারে ইজিচেয়ারে রূপান্তরিত হয়ে লম্বা হয়ে গেল। বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়া গেল। স্টুয়ার্ডেশ এসে লজেন্স্ ইত্যাদি দিয়ে গেল। শরীরে বেল্ট্ বাঁধা হ'ল। বিমান হু-হু ক'রে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে লাগলো। রাত্রি সাড়ে এগারটা আন্দাজ সময়ে একগ্লাস ক'রে লেবুর রস খেতে দিয়ে গেল।

সমস্ত রাত্রি বেশ ভালোই কেটেছে, একটুও কষ্ট বা অস্বস্তি হয়নি কারুর, কারণ এ বিমানটি মোটেই দোলেনি। রাত্রে শুনলাম, ছাব্বিশ হাজার ফীট উপর দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি, গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে এই গভীর রাতে।

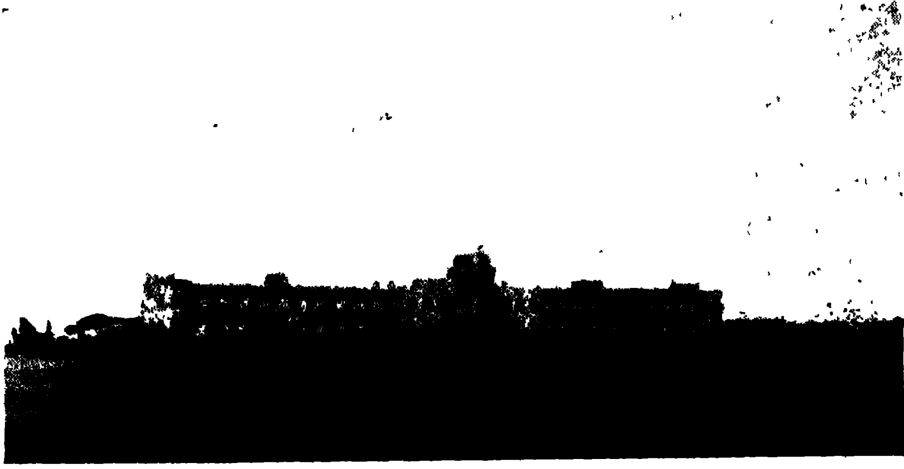


সৌদি অ্যারেবিয়ার বৃদ্ধ সেখ

ভোর পাঁচটা থেকে আমি ঘুম ভেঙে জেগে দেখছি উনি পাশের চেয়ারে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সকাল ৬টা দশ মিনিটে আমরা সৌদি অ্যারেবিয়ায় এসে ৪৫ মিনিটের জন্য মাটির বুকে নামলাম। জনৈক সুন্দর চেহারা, মাথায় বিঁড়ে আঁটা ঘোমটার মত কাপড় টানা আরববাসী এসে প্রত্যেক যাত্রীর ছাড়পত্র দেখে নিল। বিমান থেকে নেমে মাঠে একটু

বেড়াতে লাগলাম। চমৎকার স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া। সবে ভোর হচ্ছে, সূর্যোদয় হয়নি তখনো।

বিমান ছাড়লো সকাল আন্দাজ ৭টা ১৫ মিনিটে। বস্‌রায় গিয়ে অবতীর্ণ হ'লাম প্রাতরাশ সমাধার জন্য। বস্‌রার বিমানঘাঁটির বাড়িটি খুব প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত। এর



বস্‌রা-বিমানাবতরণ স্থান, শাট্-এল্-আরাব হোটেল

বাগানটিও অত্যন্ত সুন্দর। এখানেও ছাড়পত্রগুলি নিয়ে তবে আমাদের ভিতরে যেতে দিল। একখানি ক'রে টিকিট দিল প্রত্যেককে, খাওয়ার হলে (Hall) যাওয়ার জন্য। এখানে সমস্ত-কিছুতেই টিকিটের ব্যবস্থা। ওভারকোট, টুপিতে সব সময়ে টিকিট এঁটে রাখতে হচ্ছে। যাই হোক্, প্রকাণ্ড ডাইনিং-হলে লম্বা টেব্‌লে খেতে বসলাম একসঙ্গে প্রায় কুড়ি জন। দু'টি ক'রে ডিম, রুটি, মাখন আর লেবুর রস। চা নেই দেখে আমার তো প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা। উনি ডেকে বলাতে তখন চা আর দুধ দিয়ে গেল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে প্রাতরাশ সমাপ্ত ক'রে আমরা বাইরের বাগানে গিয়ে বসলাম।

চমৎকার সব বিচিত্র ফুল ফুটে বাগান আলো হয়ে রয়েছে। কিন্তু বস্‌রাই গোলাপ কই? বস্‌রা বললেই তো আমাদের আগে বস্‌রাই গোলাপের কথা মনে আসে। নানা কাব্যে সাহিত্যে পরমাসুন্দরী নারীদের যে বস্‌রাই গোলাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কোথায় সেই বহুবিখ্যাত ও কবিবন্দিত অপূর্ব ফুল? আমাদের বন্ধু সুধীরবাবু যাত্রার সময় বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের কানে কানে বলেছিলেন—"আমার জন্য বস্‌রাই গোলাপ আনতে ভুলো না যেন।" অনেক খুঁজে-খুঁজে গোলাপ পাওয়া গেল বটে কিন্তু সে আমাদের বাড়ির টবের গোলাপের চেয়েও অনেক ছোট এবং অতিসাধারণ। সুতরাং সুধীরবাবুর জন্য আর বস্‌রাই গোলাপ নেওয়া হ'ল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হতেই আবার আমরা ত্বরিৎপায়ে এসে বিমানে উঠে পড়লাম। আবার সেই বেল্ট্ বাঁধা, আলো জ্বলা, চুইং-গাম ও টফীর ট্রে আসা। অভীক আর খুকু, আমার ফেলে-রেখে-আসা শিশু দু'টির জন্য মন-কেমন করছিল বারবার, তাদের এই প্রিয় সামগ্রী চুইং-গাম আর টফী চকোলেট্ দেখে।

আর-একটু পরেই কায়রো পৌঁছবো। Gulf of Cambara পার হয়ে উড়ে চলেছি আকাশপথে। এটা উত্তীর্ণ হতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এর পরেই সুয়েজ প্রণালী পার হবো, সেও কুড়ি মিনিট লাগবে, স্টুয়ার্ডেশ ব'লে গেল।

মঙ্গলবার, ১০ মে ১৯৪৯, রাত্রি আটটা। কায়রো।
রুম নং ১৩৩, শেফার্ড্ হোটেল॥

আজ আমরা বেলা এগারটা নাগাদ কায়রোয় এসে পৌঁছেছি। বিমান থেকে নেমে ছাড়পত্র-পরীক্ষা, স্বাস্থ্য-

পরীক্ষা এবং শুল্ক-পরীক্ষায় বেলা একটা বেজে গেল। কী হয়রানি যে করলো ঐ সব ঝঞ্ঝাটে, বলা যায় না। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পরে আমরা T. W. A.র বাসে এসে উঠলাম। হোটেলে পৌঁছে খবরাখবর নিয়ে ঘর পাওয়া যেতে আরও প্রায় একটি ঘণ্টা লাগলো। তারপরে স্নান ও আহার।

এদের ভাষা কিছুই বোঝা যায় না। ভাঙা ভাঙা ইংরাজী কেউ কেউ অল্পস্বল্প জানে, তাই রক্ষা। খেয়ে উঠে আমি ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখতে বসলাম আর উনি গেলেন ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা ও চেক্‌বুক জমা দিতে। আধ ঘণ্টা শুয়ে বিশ্রাম করলাম। তারপর সাজসজ্জা অন্তে চা পান ক'রে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।



পিরামিড ও স্ফিংক্স — মিশর

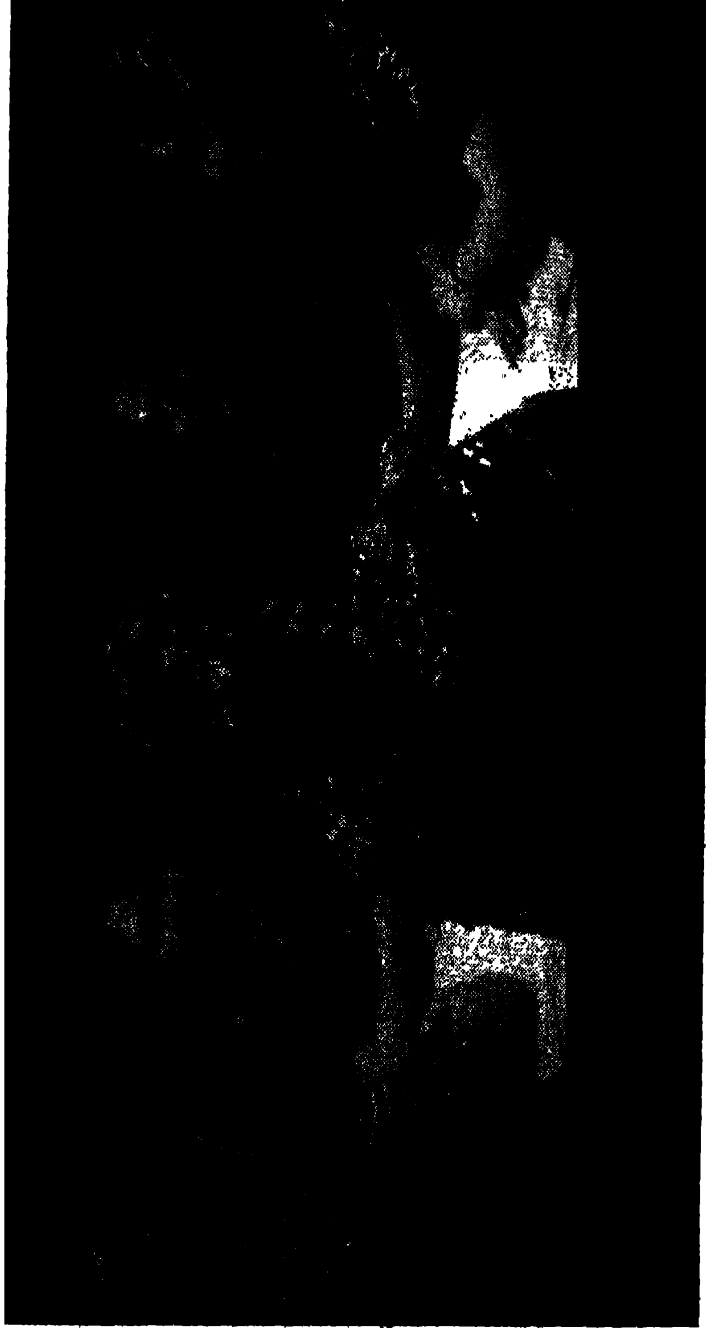
সকালেই T. W. A.র অফিসে এক গাইড্ ঠিক করা হয়েছিল। হোটেল থেকে নিচে নেমেই দেখি সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোধ হয়, আরও ঐ ধরনের লোক ছিল ওখানে,

কারণ প্রত্যেকেই আমাদের নিয়ে যেতে চাইছিল। শেষে সেই বুড়োই আমাদের জোর ক'রে একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে পিরামিডের দিকে নিয়ে চললো।

পিরামিড দেখে খুব ভালো লাগলো। গাইড্ সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। কোথায় মমি ছিল, বা'র ক'রে এখন মিউজিয়মে রেখেছে, কোথায় জুয়েলারি ছিল ইত্যাদি। পিরামিড দেখা হ'লে কিছুক্ষণ ট্যাক্সি ক'রে ঘুরে শহরটি দেখা হ'ল। শহরটি চমৎকার সাজানো, বাড়িগুলি সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনার, প্রতিটি বাড়িতে সংলগ্ন সুন্দর ফুলবাগান। বাড়িগুলি সুন্দর বটে, কিন্তু এদেশের মানুষগুলি দেখে আমি তো বিস্ময়ে আড়ষ্ট। কী লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা! এদের রং ফর্সা এবং কালো দুই-ই আছে, কিন্তু সবশুদ্ধ বিরাট চেহারাখানা দেখলে যেন ডাকাত-ডাকাত মনে হ'তে থাকে। ভয়ও হয় বেশ। গাইড্‌টি মোটামুটি ইংরাজী জানে, তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, যে-সকল মেয়েদের লম্বা কালো পোষাক ও কালো ওড়না, মুখের উপরে ভেল্ টানা, তারা প্রাচীনপন্থী মিশরীয় মেয়ে। আর মেমেদের মত গাউন্-পরা মেয়েগুলি আধুনিক ঈজিপ্‌সিয়ান মেয়ে। আমরা ভাবছিলাম এরা ইয়োরোপীয়ান কিংবা অ্যাংলো-ঈজিপ্‌সিয়ান।

আমরা যে হোটেলটিতে উঠেছি সেটি প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ি। ঘরটি পেয়েছি খুব সুন্দরভাবে সাজানো এবং বেশ বড় বাথরুম্-সংলগ্ন। সামনের দিকে রাস্তার উপরে মস্ত বড় বারান্দায় চেয়ার টেব্‌ল পাতা—ব'সে রাস্তা দেখার জন্য। ব্যবস্থা খুবই ভালো। হোটেলের চার্জ আরও ভালো।

আমাদের ফিরতে দেরি হয়েছিল। তখন হোটেলে



ক্যামেরার কারচুপি ! —কায়রো

ডাইনিং-হলে ডিনার শেষ হয়ে গেছে। আমাদের স্পেশ্যাল্ ডিনার ঘরে দিয়ে যেতে বলা হ'ল। তার জন্য আলাদা ক'রে চার্জ করবে অবশ্য।

আজ পিরামিড দেখে ফিরে আসার সময়ে একটি এদেশীয় জিনিসের দোকানে নেমে এখানকার জিনিস দেখছিলাম। উনি একটি এদেশী ভেল্ (ওড়না) আমার জন্য পছন্দ ক'রে জোর ক'রে কিনে ফেললেন। কাস্টম্‌সের ভয়ে বেশি কিছু কেনার উপায় নেই। 'ভেল্'টি চমৎকার দেখতে। কালো নেটের উপর রূপালি কারুকার্য। ওরা সেইটি ওদেশীয় মেয়েরা যেভাবে পরে তেমনি ক'রে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিল— "ঠিক এদেশী মেয়ে ব'লে মনে হচ্ছে।" খুব সম্ভব সেটা ক্রেতাকে খুশী করার জন্যই বোধ হয়। আজ এই পর্যন্ত।

বুধবার, ১১ মে ১৯৪৯, কায়রো। শেফার্ড্ হোটেল॥

সকাল থেকে বসে বসে দেখছি কতরকম ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। হকাররা কাগজ দিয়ে যাচ্ছে। শাকসব্জী বেশির ভাগ ঠেলাগাড়িতেই আসছে। এদেশের অধিকাংশ মেয়ে ও পুরুষের খুবই সুন্দর চেহারা। শিশুগুলিও দেখতে ভারি চমৎকার।

বেলা সাতটার পর আমরা হোটেলের কাছাকাছি একটু বেড়াতে বেরুলাম। বেশি দূর এগোবার সাহস হ'ল না, পাছে দূর বিদেশে পথ হারিয়ে মুস্কিলে পড়ে যাই। অতো সকালে তখনও সব দোকানপাট খোলেনি, দু'-একটা সবেমাত্র খুলেছে। আমি কয়েকটা ঈজিপ্‌সিয়ান দোকানে ঢুকেছিলাম। চমৎকার পছন্দসই সব জিনিসপত্র। কিন্তু কেনার উপায় নেই,

পাছে যাওয়ার পথে লগেজের বোঝা বেড়ে শুল্কের ঝঞ্ঝাট জটিলতর হয়ে ওঠে সেই ভয়। আটটা নাগাদ ফিরে এসে হোটেলের ভিতরটি ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। চমৎকারভাবে সাজানো এবং হোটেলের ভিতরকার কারুকার্য অতি সুন্দর। মেঝেতে বিছানো গালিচাগুলি প্রত্যেকটি বিভিন্নতর নক্সার, দেখে দেখে চোখ ফেরানো যায় না, এতই সুন্দর। বাগানে নেমে গেলাম। চারিদিক নানা বিচিত্র রঙের ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে আছে। কী ক'রেই যে এরা এই মরুভূমির বুকে এমন ফুল ফুটিয়ে তুলেছে ভেবে আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত না হয়ে পারিনি। বাগানের ভিতর মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য নানা রঙের সিল্কের প্রকাণ্ড ছাতার চন্দ্রাতপতলে হাল্‌কা সুদৃশ্য চেয়ার টেব্‌ল সাজানো। বাগানের ঠিক কেন্দ্রস্থলে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি গোলাকৃতি চত্বর। চত্বরটির চতুর্দিকে বৈদ্যুতিক বাতি সংলগ্ন রয়েছে। প্রশ্ন ক'রে জানা গেল, রাত্রে সেখানে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তার পাশেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, সেইটি পানশালা (Bar)।

ব্রেকফাস্টের পর বেলা দশটা নাগাদ আমরা মিউজিয়ম দেখতে বেরুলাম। এদেশের লোকেরা বেজায় ঠক, জুয়াচোর। আমরা একেবারেই নবাগত বিদেশী মানুষ বুঝতে পেরে প্রত্যেক লোকই যথাসাধ্য আমাদের ঠকাতে কসুর করেনি — এমন কি ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা পর্যন্ত!

মিউজিয়মে দেখার মত কত জিনিসই না রয়েছে! খ্রীষ্ট জন্মের বহু আগের প্রাচীন মিশরপতি ফ্যার‍্যাও (সম্রাট) টুটান্‌খামেনের 'মমি' (সংরক্ষিত শবদেহ) এবং তাঁর সঞ্চিত ধনরত্ন এখানে রয়েছে। অলঙ্কার যা' রয়েছে, অপূর্ব।

সেকালের অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার, প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ও আসবাব প্রভৃতি। সোনা ও রূপার ছড়াছড়ি। সোনার জুতা থেকে আরম্ভ ক'রে শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গের পরিচ্ছদ সোনায় তৈরি। বহু 'মমি'র আধার দেখে বিস্মিত হতে হয়। সে-যুগে ফটোগ্রাফির উদ্ভাবন হয়নি, অথচ, যে মানুষটি যে রকম দেখতে ছিল, অবিকল তার প্রতিকৃতি ধাতুতে বা পাথরে তৈরি ক'রে 'মমি' সংরক্ষণ-বাক্সের ঢাক্‌নিটি প্রস্তুত হ'ত। তারপর সেই প্রতিমূর্তি-উৎকীর্ণ বাক্সসহ 'মমি'টি সমাধি-গুহায় সযত্নে রক্ষিত হ'ত। টুটান্‌খামেনের 'মমি'র আধারগুলি আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া এবং তার উপরে অপূর্ব কারুকার্য করা। অলঙ্কারের আধারগুলির ডালার উপরে বেশিরভাগ সাপের চিত্র উৎকীর্ণ। সে-যুগের মিশরীয়রা বোধ হয় সর্পকে দেবতা ব'লে মনে করত।

মিউজিয়ম দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু, যাঁরা এ সমস্ত বোঝেন, তাঁরা নিশ্চয় এই সকল প্রাগৈতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য-সামগ্রী দেখতে পেয়ে আরও খুশী হতেন।



মহম্মদ আলি মস্ক্‌ — কায়রো

এখানকার 'মহম্মদ আলি মস্ক্‌'ও দেখার মত স্থাপত্য। কোথায় লাগে আমাদের দেশের তাজমহল! ভিতরের সোনার কারুকার্য আর প্রস্তরশিল্প

অপূর্ব সুন্দর! মসজিদের উপর থেকে সমস্ত কায়রো শহরটি দেখতে অতি অপূর্ব লাগছিল।

কায়রোর মিউজিয়ম এবং মহম্মদ আলি মস্‌জিদ দেখে বেলা একটায় হোটেলে ফিরলাম অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে।

বৃহস্পতিবার, ১২ মে ১৯৪৯। কায়রো। ভোর ৬টা॥

কায়রো চমৎকার সাজানো শহর। বোম্বাইয়ের চেয়ে অনেক সুন্দর। হোটেলে খাওয়াদাওয়া বেশ ভালোই দিচ্ছে।

আজ আমরা রওনা হ'ব রোমে। এখানে জিনিসপত্র কিনে দাম দেবার সময় হিসাবের হয়রানিতে হিমসিম খাচ্ছি আমরা, ভারতীয় টাকার সঙ্গে এদের পিয়ার্সের হিসাব ঠিক ক'রে বুঝতে। এখানে ওঁর প্যাণ্ট কোট এবং আমার একটা শাড়ি এই তিনটি কাপড় ইস্ত্রি ক'রে তার মজুরি ৩১ পিয়ার্স নিল এরা। হিসাব ক'রে দেখা গেল এদের এক পিয়ার্স আমাদের দশ পয়সার সমান। অর্থাৎ ১টা শাড়ি, ১টা কোট এবং ১টা প্যাণ্ট ইস্ত্রির মজুরি আমাদের টাকার হিসাবে চার টাকা সাড়ে তেরো আনা।

আমরা বিমানপথে আসার সময়ে দেখেছিলাম বিমান যখন যে-দেশের মাটিতে নামছিল, প্রত্যেক জায়গায় সেখানকার লোক এসে স্থানীয় সময় (Local Time) জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো এবং বিমানযাত্রীরা সকলেই সেই সময় অনুযায়ী নিজেদের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

কায়রো ছাড়লাম আমরা বেলা তিনটায়।

রোমে

বৃহস্পতিবার, ১২ মে ১৯৪৯, বিকেল সাড়ে সাতটা।

এথেন্স্ থেকে আকাশপথে ॥

প্রাচীন গ্রীসের বহুবিখ্যাত এথেন্স্ নগরী ছেড়ে এখন আমরা উড়ে চলেছি রোমের পানে — সেই বিরাট অতিপ্রাচীন সভ্যদেশের পানে, যেখানে ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্ম ও বিস্তার ঘটেছে ; গ্রীস এবং রোম — যাদের নাম আজও সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মানসচক্ষের সম্মুখে হাজার হাজার বৎসরের মানব-সভ্যতার উত্থান-পতনের বহুবিচিত্র চলচ্চিত্র মেলে ধরে ; যেখানে শৌর্যের, বীর্যের, সৌন্দর্যের, কল্পনার এবং শিল্পের চূড়ান্ত অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

ঘননীল সমুদ্রের বুকের অনেক উপরে নীল নভোমণ্ডল দিয়ে উড়ে চলেছি পাখির মত বিংশ শতাব্দির মানুষ আমরা,— অতীতের গৌরব-সমুজ্জ্বল প্রাচীন রোমের মহিমময় দিনগুলির স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কোথায় ছিল তখন অধুনা-অর্ধ-পৃথিবীশ্বর বৃটেন — আর অতি-নব-আগন্তুক সুবর্ণ-কুবের মার্কিন! সুদূর এশিয়ার ভারত-উপদ্বীপের ক্ষুদ্র গৃহগণ্ডীগতপ্রাণ সংস্কারাবদ্ধ মানুষ আমরা — কোথায় উড়ে চলেছি আজ!

কায়রো থেকে আমরা বেলা তিনটায় যাত্রা ক'রে এথেন্সে এসে পৌঁছেছিলাম ৬টা ৫ মিনিটে। এথেন্সের মাটিতে ৪৫ মিনিট আমরা নেমেছিলাম। এথেন্সের এয়ারপোর্টটি ছোট-খাটো হ'লেও বেশ সুসজ্জিত। শহরটি মস্ত বড়। তিনধার পাহাড়-পরিবেষ্টিত, একদিকে সমুদ্র। আমরা বহুক্ষণ ধ'রে সমুদ্রের বুকের উপরে শূন্যলোকে যখন এথেন্সের পানে চলে-

ছিলাম, বেশ সুন্দর লাগছিল চারিদিকে তাকিয়ে। নীলাভ পাহাড়শ্রেণী এবং নীল সমুদ্র যেন বর্ণে ও তরঙ্গে একাকার হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। এথেন্সের মানুষগুলি অর্থাৎ গ্রীক্‌রা দেখতে অতি সুদর্শন এবং দেহ তাদের সুগঠিত এ তো সর্বকালবিদিত।

এখনও আমরা নীল সাগরের বুকের উপরে মেঘলোক দিয়ে উড়ে চলেছি। দূরে দিনান্তের সূর্য অস্তাচলে নামছেন ধীরে ধীরে। দিগন্তবিস্তৃত স্থির সমুদ্রের ঘননীল দর্পণে অজস্র সিন্দূরবর্ণ আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। রঙের বৈচিত্র্যের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। আকাশে ও সাগরে সোনালী গোলাপী বেগুনী জর্দা ধূসর রক্তিম—হাজার রঙের হোলি খেলা চলেছে। আকাশপথ হতে সাগরে সূর্যাস্তদৃশ্যের মহিমময় চিত্র চিরকালের মত আমাদের মনের পটে আঁকা রইলো।

শুক্রবার, ১৩ মে ১৯৪৯। হোটেল য়ুনিভার্সো — রোম ॥

গত কাল রাত্রি প্রায় দশটায় রোমে এসে নেমেছি। পাস্‌-পোর্ট্, পুলিশ এবং কাস্টম্‌স্‌এর প্রাচীর ডিঙিয়ে T. W. A.র বাসে উঠতে আমাদের রাত্রি এগারটা বেজে গিয়েছিল। প্লেনেই ডিনার দিয়ে দিয়েছিল। T. W. A. অফিস হ'তে হোটেলের ঠিকানা নিয়ে একখানি ট্যাক্সিতে আমরা হোটেল Universoতে এসে উঠলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার ইংরাজী জানে না, হোটেল ম্যানেজার এসে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলেন আরোহী এবং সারথির মধ্যে দ্বিভাষীর মধ্যস্থতা ক'রে। হোটেলের মধ্যে একমাত্র হোটেল-ম্যানেজার এবং মালিক ছাড়া আর কেউই ইংরাজী জানে না, সকলেই ইতালীয়ান ভাষায় কথাবার্তা কয়। ওয়েটার্, মেইড্ কেউ একটিও ইংরেজী শব্দের অর্থ বোঝে না।

হোটেল চার্জ ইত্যাদি জেনে নিয়ে উপরে যখন এলাম, রাত্রি ১২টা বেজে গেছে। এখানে বেশ শীত। ওভারকোট প'রেও শীত বোধ হচ্ছিল। বিছানায় গিয়ে শুতে রাত্রি ১টা বেজে গেল।

শুল্ক-অফিসে সমস্ত বাক্স খুলে ঢেলে ফেলে তছ্‌নছ্‌ করেছিল এখানে। আমার স্বামীর চার বাক্স চুরুট ছিল। তার মধ্যে ওরা মাত্র এক বাক্স ওঁকে নিতে দিল এবং বাকি তিন বাক্স ওদের অফিসে জমা রেখে একটা চিরকুট (Slip) লিখে দিল, রোম ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন ঐ চিরকুটটি দেখালে তিন বাক্স চুরুট ফেরত পাওয়া যাবে।

সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘর থেকেই স্বামী নিচে ফোন ক'রে দিতে প্রাতরাশ ঘরেই পৌঁছে দিয়ে গেল। খাদ্যবাহকদের যা-কিছু প্রশ্ন করা যায় তারা কেবলি মাথা নাড়ে, ইসারা করে এবং নিজেদের ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে থাকে। মহা-মুস্কিলের ব্যাপার! শেষে আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত ক'রে ঘরে চাবি দিয়ে দু'জনে নিচে হোটেলের অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ম্যানেজার এলে আমার স্বামী ম্যানেজারকে টমাস্ কুক্ কোম্পানীর মিঃ মিত্রকে ফোন ক'রে আমাদের আসার সংবাদ জানাতে অনুরোধ করলেন।

আমরা ভ্রমণকারী শুনে ম্যানেজার বললেন, "তোমরা যদি রোমের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে চাও, আমি টেলিফোনে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।" উনি প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তিনি একখানি ইংরাজীতে ছাপা কাগজ দিলেন। প'ড়ে দেখা গেল, টুরিস্ট্‌দের দেখানোর জন্য একটি কোম্পানী আছে, তারা বেলা

৯টা থেকে ১২টা এবং ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত তাদের কোম্পানীর বাসে ক'রে ভ্রমণকারীদের নিয়ে রোমের সমস্ত দ্রষ্টব্যস্থান

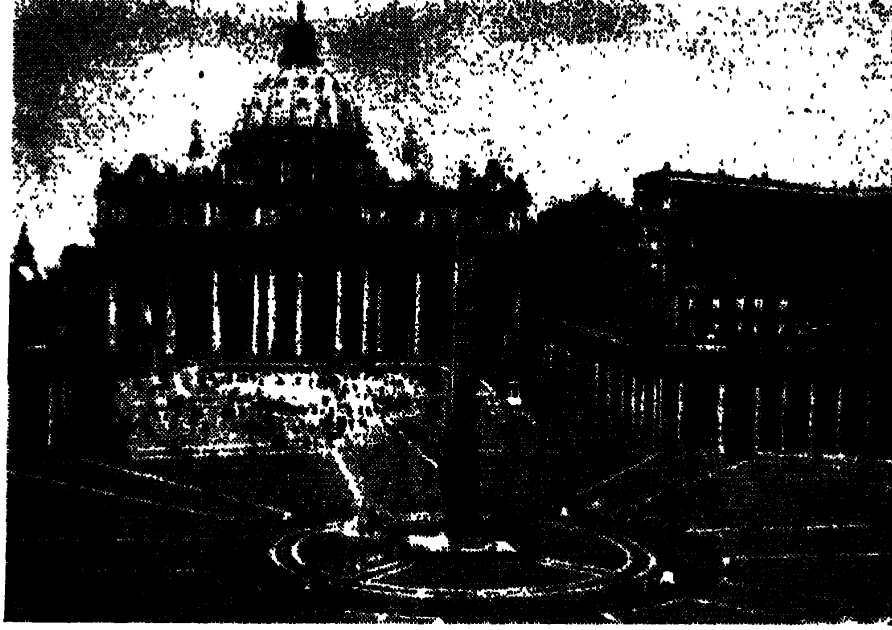


রোমের একটি বিশিষ্ট লেক

দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ন'টা বাজতেই সেই বাস্ এলো এবং আমরা ও আরও চারজন সেই বাসে যাত্রা করলাম। বাস-চালক ইংরাজীতে অভিজ্ঞ, তিনি বললেন, তোমাদের সব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন হোটেল থেকে ভ্রমণকারী তুলে তুলে নিয়ে বাস্‌টি পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা হু'বেলার জন্যই হু'জনের হু'খানি টিকিট করেছিলাম। প্রায় হু' পাউণ্ড দিতে হ'ল।

রাস্তায় হু'পাশের পরিচয় দিতে দিতে চল্‌লো। সবই বড় বড় বাড়ি এবং পুরানো ধরনের। শেষে আমরা আর্ট্ গ্যালারি,

সেণ্ট্ পিটার্স্ ক্যাথিড্রাল্ ইত্যাদি দেখে সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে এসেছি। আর্ট্ গ্যালারিতে ঢুকে যেদিকে চাই সবই



সেণ্ট্ পিটার্স ক্যাথিড্রাল — রোম

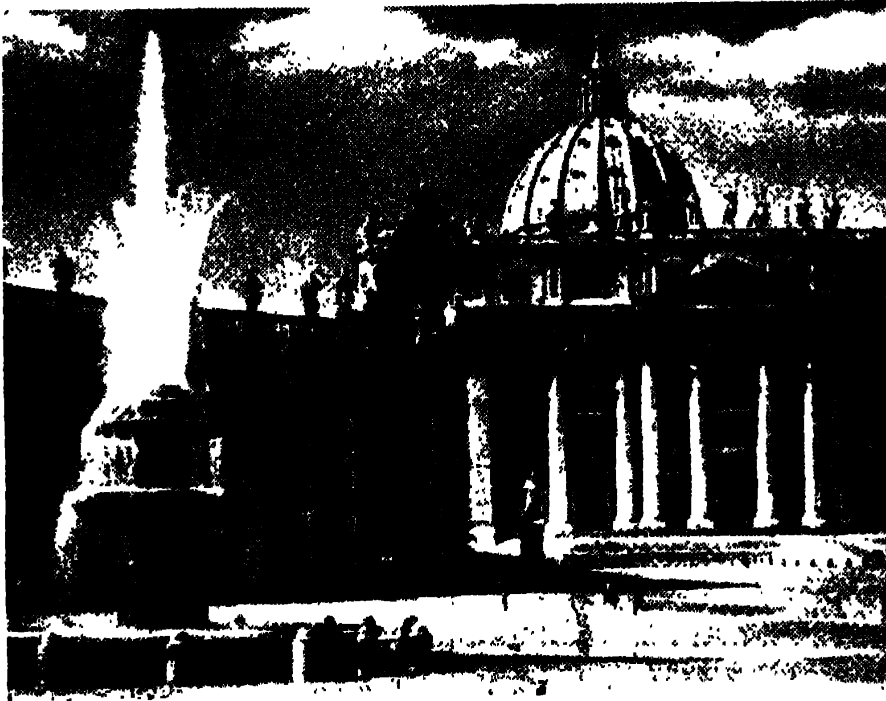
অপূর্ব, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি, অয়েলপেণ্টিং — সবই সুন্দর। র‍্যাফেলের আঁকা সব ছবি রয়েছে নানা রকমের। উপর নিচে দেখে দেখে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভিতরের দেওয়ালে ও ছাদের নিচে (Ceiling) যে-সব রঙিন তৈলচিত্র আছে সে-সব না দেখলে বলা যায় না। ক্যাথিড্রাল্‌টিও ঐরকম অপূর্ব-শিল্পে সাজানো। এখানে পঞ্চাশ হাজার লোক একসঙ্গে ব'সে ঈশ্বরোপাসনা করে। ভিতরটি ভেলভেট্ কিংখাব দিয়ে আগা-গোড়া আবৃত। চারিদিকে অজস্র বাতি জ্বলছে। সকলে জানু পেতে ব'সে নতমস্তকে ঈশ্বরের প্রতি প্রণতি-নিবেদন করছে। অনেকটা আমাদের মন্দিরের মতই। হাজার হাজার বছর আগে তৈরি, চমৎকার আছে আজও। বাইরেটা কিন্তু ভীষণ

পুরানো ও নোংরা হয়েছে। তারপর পোপের রাজধানী — তা-ও দেখালো।

রাত্রে আমরা অপেরার টিকিট কিনেছি। বুঝি, না-বুঝি, দেখে আসবো। হোটেলে আমাদের পাশের ঘরের এক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বামীর আলাপ হয়েছে। তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন। তিনিও যাবেন আজ অপেরায়।

শনিবার, ১৪ মে ১৯৪৯। রোম॥

আজ সকালে উঠে সাজসজ্জা ক'রে ব্রেকফাস্ট খেয়ে টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাসে বেলা ন'টায় আমরা বেরিয়েছিলাম, প্রায়



ভ্যাটিকান সিটি — রোম

সাড়ে বারোটায় ফিরেছি। আজ ভ্যাটিকান্ সিটির মধ্যে সব দেখালো। পোপের রাজত্ব (ভ্যাটিকান্ সিটি), দেড় মাইল

স্কোয়ার ছোট্ট জায়গার মধ্যে সব-কিছু ব্যবস্থা। আজ ওখানে মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, আর্ট্ গ্যালারি সবই দেখালো। কিন্তু সেটা তিন দিনে দেখলে তবেই দেখা যায় ; এ কোনও রকমে চোখবুলোনো। অপূর্ব স্ট্যাচু, পেন্টিং, মার্বল্ ও মোজেইকের কাজ। রোমে যা-কিছু পুরানো আছে সবই আশ্চর্য। বাইরে থেকে বাড়িগুলো দেখতে ভাঙা ভাঙা পাথরের,—তার মধ্যে যে কী অদ্ভুত জিনিস সব রয়েছে, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। এক-একটা হল্ প্রকাণ্ড লম্বা, তার দেওয়াল, ছাদের তলা (Ceiling) আগাগোড়া ছবিতে মোড়া। ঘরের মধ্যে চারিদিকে প্রস্তর-মূর্তি, কোন্‌টা দেখবো আর কোন্‌টা না-দেখবো ! যেগুলো বিশেষ দ্রষ্টব্য, গাইড্ সেগুলোই বুঝিয়ে দিচ্ছিলো ! এই রকম প্রায় ৫০।৬০টি ঘর আছে মিউজিয়মে। তারপর লাইব্রেরী। সে তো আমরা কিছুই বুঝি না, তবু কত হাজার হাজার বছর আগের বই রয়েছে দেখলাম। এক-একটা দেওয়ালে শুধু্ মোজেইক্ দিয়ে রংএর কাজ। কেউ বুঝবে না যে সেটা মোজেইক্—এমনই আশ্চর্য কারুকলা।

গালিচার উপরে কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্যের অসামান্য নিদর্শন দেখলাম। খ্রীষ্টের সমগ্র জীবনী গালিচায় বয়ন-চিত্রের দ্বারা সুচিত্রিত। শোনা গেল, এইগুলি তৈরি করতে নাকি পঞ্চাশজন লোকের দশ থেকে চৌদ্দ বছর সময় লেগেছিল।

এখানে সবই দেখা হ'ল দু'দিনে। রোমের প্রসিদ্ধ উদ্যানবাটি 'ভিলা-বোর্গেস্' খুব ভাল লাগল। যেখানে প্রথম গিয়ে নামলাম, দেখলাম টুরিস্ট্ কোম্পানীর চার-পাঁচটা বাসের সব যাত্রী নামিয়ে সেখানে জড়ো ক'রে কোম্পানীর লোক

যে-সকল যাত্রী ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝবে তাদের একটা গ্রুপ্ ক'রে নিয়ে চলে গেল। ঐ রকম যারা ইতালীয়ান ভাষা বুঝবে, তাদের



রোমের প্রসিদ্ধ উদ্যানবাটি "ভিলা বোর্গেস্"

অন্য একটি গ্রুপ্ ক'রে নিয়ে গেল এবং যারা ইংরাজী ভাষা বুঝবে তাদের একটি গ্রুপ্ ক'রে গাইড্ সেই গ্রুপ্টি নিয়ে যাত্রা করলো। আমরা অনেকেই প্রায় মাঝে মাঝে দলছাড়া হয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু গাইড্ আবার সব ঠিক জড়ো ক'রে গুণে নিচ্ছিলো। প্রত্যেক জায়গায় প্রবেশের ফী বা টিকিট অথবা অন্যান্য খরচ ওরাই সব দিয়ে দিচ্ছিলো, আমাদের আর আলাদা ক'রে দিতে হয়নি। ফিরবার পথে যে যেমন উঠেছে তেমনি যথাক্রমে আগে পরে নামাতে নামাতে বাস্ এলো।

মিউজিয়ম এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানগুলিতে ছোট ছোট স্টল্ আছে, সেখানে অনেকেই ছবি, আল্‌বাম বা ছবির কার্ড্ কিনছিলেন। অনেক আর্টিস্ট্ ঐ সকল মিউজিয়মে বসে বসেই

সেখানকার মূল চিত্রগুলির কপি করছেন সুন্দরভাবে। সেগুলি সেখানে বিক্রিও হচ্ছে বেশ। ছোট ছোট লকেট্, ফোটোস্ট্যাণ্ডে ছবি ইত্যাদিও বিক্রি হচ্ছে। দাম খুবই বেশি।

ইতালীয়ানরা দেখতে অতি সুন্দর। যেমন মুখশ্রী তেমন রং, কালো চুল, কালো চোখ ও টানা ভ্রূ-রেখা।

হোটেলে ফিরে দেখি মিঃ মিত্র ব'সে আছেন আমাদের জন্য। কাল আমার স্বামী টমাস্ কুকের অফিসে মিঃ মিত্রকে চিঠি লিখে রেখে এসেছিলেন। ভদ্রলোক তেইশ বৎসর রোমে রয়েছেন। চমৎকার ইতালীয়ান ভাষায় কথা বলতে পারেন। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মিঃ মিত্রকে নিয়ে তিনজনে নিচে লাঞ্চ্ খেতে নেমে গেলাম। আজকের লাঞ্চে আমাদের সঙ্গে মিঃ মিত্র থাকায় খাওয়ার বড় সুবিধা হ'ল। দু'দিন পরে ব'লে ক'য়ে আমার জন্য চিংড়িমাছ, আলু কড়াইশুঁটি সিদ্ধ, ভেজিটেব্ল স্যুপ্ ইত্যাদি আনালেন। লাঞ্চের পর তিনি বিকালে আসবেন ব'লে চ'লে গেলেন, আমরা বিশ্রাম করতে উপরে উঠলাম।

বিকালে মিঃ মিত্রের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। অনেক ঘুরে কিছু কেনাকাটা হ'ল এবং পথে শেলি, কীট্সের মেমোরিয়্যাল দেখা গেল। কী সুন্দর ক'রেই না এরা দোকান সাজিয়েছে! আর্টিস্ট্ বটে! পাথরের ছোট ছোট জিনিস দেখে আমি তো কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। স্বামী কিনতে দিলেন না, প্লেনে মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবার বহু বিঘ্ন ও অসুবিধার জন্য। পথে একটা ইংলিশ কাফেতে মিঃ মিত্র আমাদের চা খাওয়ালেন। ক'দিন পরে ভাল চা খেয়ে বাঁচলাম। আমরা কিছু জানি না তো কোথায় কি আছে। আসার সময়ে একটা টম্‌টম্ ভাড়া ক'রে হোটেলে ফিরলাম।

ইতালীয়ানরা বড়ই ইংরাজবিদ্বেষী, কথাবার্তায় তা বেশ বোঝা যায়। এখানে আমাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এবং একে-ওকে ডেকে দেখায়। ভাবে বোধ হয় — এ আবার কী সাজ। কাল রাত্রে আমি অপেরাতে খুব জমকালো বেনারসী শাড়ি প'রে গিয়েছিলাম। সকলেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে এবং পরস্পরের মধ্যে আমার সম্বন্ধে বলাবলি করেছে। অপেরাটি প্রকাণ্ড। আগাগোড়া চমৎকার কাচের ঝাড় দিয়ে সাজানো। ছয়তলা বাড়ি। আমরা তিনতলায় একটা বক্সে বসেছিলাম। আমাদের পরিচিত সেই আমেরিকান ভদ্রলোক ও তাঁর মা এবং আমরা উভয়ে, এই চারজনে একটা বক্সে ছিলাম। অপেরার ভিতরদিকটি লাল ভেলভেট্ দিয়ে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত মোড়া। প্রত্যেকটি বক্স্ আর্চের মতো করা। তার বর্ডার সোনালী কারুকার্যময়, রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর দ্যুতিতে সমস্ত ঝল্‌মল্ ঝক্‌মক্ করছিল।

অভিনয় কী যে হ'ল যদিও আমরা একবর্ণও বুঝিনি, তবুও আমরা বিমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম দৃশ্যপটের অপরূপ বৈচিত্র্য ও বর্ণ-সমারোহ দেখে আর আলোকসম্পাতের আশ্চর্য লীলা-ঐশ্বর্য দেখে। দেখলাম — সূর্য একটু-একটু ক'রে ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হচ্ছেন। সমুদ্র অস্তরাগের রক্তিমবর্ণে রাঙা হ'য়ে গেল। ক্রমে সূর্য সম্পূর্ণ অস্তাচলে গেলেন, নেমে এলো কালো অন্ধকার ধীর পদসঞ্চারে। এ দৃশ্যগুলি সত্যই মনকে খুশী ক'রে তোলে।

এখানে মেয়েরা শুধু ঘর ঝাড়া-মোছা, বিছানা করা, কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা — এই সব করে। পুরুষেরা রাঁধে, পরিবেশন করে, ফরমাইস্ খাটে ইত্যাদি।

ভেনিসে

সোমবার, ১৬ মে ১৯৪৯। Hotel Splendido — ভেনিস ॥

কাল রাত্রি ন'টায় ট্রেনে উঠে আজ সকাল সাড়ে সাতটায় ভেনিসে পৌঁছেছি। স্টেশনে নেমে বাইরে বেরুতেই দেখি চারিদিকে সবই জল। ছোট ছোট মোটর বোট, নৌকার মত



ভেনিস — দূরে সেণ্ট্ মার্কস্ গির্জা দেখা যাচ্ছে

চেয়ার কৌচ দিয়ে সাজানো গণ্ডোলা এবং বড় বড় স্টিমারগুলি দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম স্টিমারগুলি এখানকার জনসাধারণ

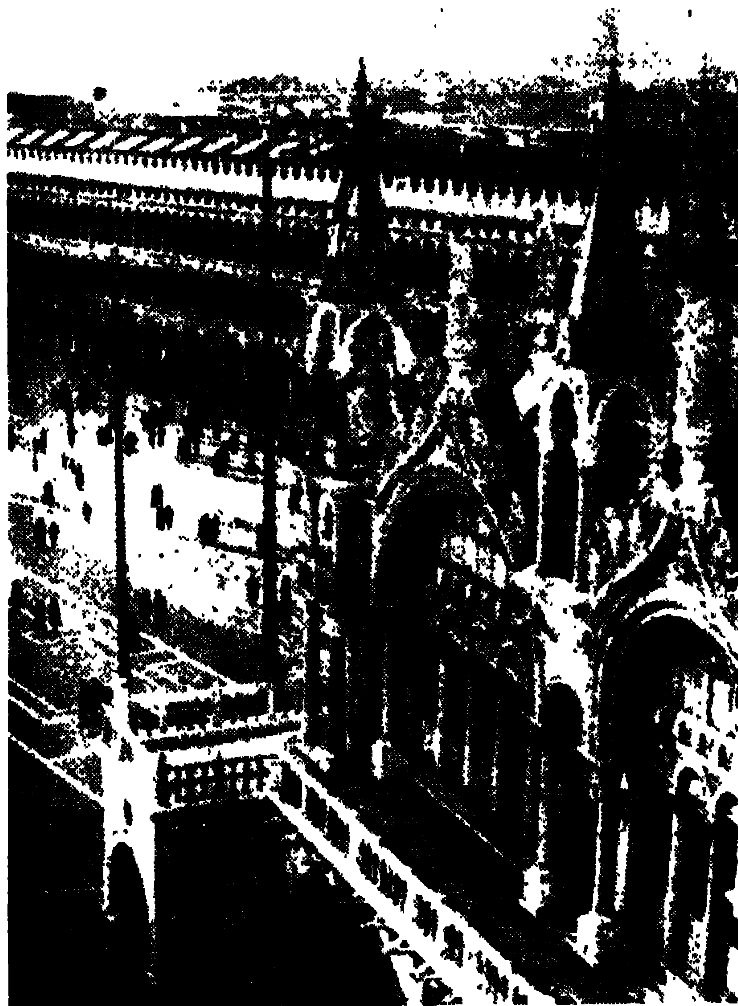
সর্বদা অল্প ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে স্টেশনের মত আছে, সেখান হতে যাত্রী নামিয়ে দেওয়া এবং তুলে নেওয়া হয়। গণ্ডোলা এবং বোট প্রাইভেট ভাড়া নিতে হয়। আমরা এক হাজার লিরা দিয়ে একখানি সুসজ্জিত গণ্ডোলা ভাড়া ক'রে চড়ে হোটেলে এসেছি। আসতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। জলের উপর চমৎকার শহর।



ভেনিসের জলময় অলিগলিতে গণ্ডোলা চলেছে

সত্যিই, ভেনিস না দেখলে বড়ই দুঃখের হোতো। ড্যুকাল-প্যালেসের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি জলের উপরে কি ক'রে

যে করেছে জানি না। মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, সিনেমা সবই আছে। পথে আসতে প্রকাণ্ড মাছের বাজার দেখলাম। সামুদ্রিক মাছ এখানে প্রচুর, শাকসব্জী এবং ফলও বিক্রি হচ্ছে।



ড্যুকাল প্যালেস — ভেনিস

এখানে যে হোটেলটিতে উঠেছি সেটি অতিসুন্দর শিল্প-সম্মত রুচিতে সুসজ্জিত। আমরা হোটেলে দু'খানি ঘর নিয়েছি। ঘরগুলি আকারে ছোট, কিন্তু রোমের হোটেলের চেয়েও সাজানো-গোছানো। স্নান-কক্ষটিও চমৎকার। এখানে

দেখার বিশেষ কিছুই নেই, কেবল জলের উপরে ঘুরে শহর দেখা ও দোকানে কেনাকাটা করা। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন'টায় বেরিয়ে প্রায় একটায় ফিরেছি। খুব ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনা ও বেড়ানো হয়েছে।

ভেনিস শহরের মধ্যখানে একটা প্রকাণ্ড স্কোয়ার আছে, সেটা একটা দেখবার মত জায়গা। সেই স্কোয়ারের চারিদিকে মস্ত বড় বড় দোকান—কাপড়, জুয়েলারি, ব্যাগ, এ দেশের যাবতীয় জিনিস ইত্যাদি। একধারে সমুদ্র, তার ধারে অসংখ্য বসবার জায়গা। বিকালে গরিব বড়লোক সবাই ওখানে বেড়াতে যায় বাচ্ছাদের নিয়ে। কেউ কেউ গণ্ডোলা ভাড়া ক'রে কিংবা স্টিমারে ক'রেও বেড়াতে যাচ্ছে। বহু স্টল্ বা কাফে আছে। আমরা বিকাল চারটায় বেরিয়ে পায়ে হেঁটে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকদূর বেড়িয়ে, তারপরে একটা টী-স্টলে ব'সে চা খেয়ে স্টিমারে চড়ে বেড়াতে গেলাম। আমরা স্টিমারে ক'রে আর একটা দ্বীপে নামলাম। শুনলাম, সেটা মুসোলিনী নূতন করেছেন—নাম 'লিডো'। ভেনিসের চেয়েও এই শহরটি আরও ছিম্‌ছাম্ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়িগুলি সবই আধুনিক স্থাপত্যকলা-পদ্ধতি অনুসারে সুনির্মিত। চারিদিকে অজস্র ফুল ফুটে বর্ণসমারোহে দৃষ্টিকে অভিভূত ক'রে দেয় এই ঋতুতে।

লিডোতে আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আবার স্টিমারে চ'ড়ে এপারে এলাম। অল্পক্ষণ স্কোয়ারে ব'সে থেকে আটটা বাজতেই হোটেলে ফিরেছি।

হোটেলটি অতি সুন্দর। প্রথমে গণ্ডোলা থেকে নেমে যখন হোটেলের সিঁড়িতে পদার্পণ করি, ভেবেছিলাম এ আবার

কী হোটেল। অন্ধকার মতন চারতলা বাড়ি। কিন্তু ভিতরে ঢুকে অবাক হতে হয় — এমন অপূর্বভাবে সাজিয়ে রেখেছে।



লিডো — ভেনিস (মুসোলিনীর তৈরি সাগর-সৈকতের শহর)

এরা সত্যিই সাজাতে জানে। ঘরের পর্দা, ঘরের ছবি, আসবাবপত্র, বিছানা, সব-কিছুই এমন রুচিসঙ্গত যে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়।

এখানকার স্কোয়ারে দেখেছিলাম অসংখ্য পায়রা বেড়াচ্ছে মানুষের পায়ে-পায়ে। ঐখানেই পায়রাদের দেবার জন্য ভুট্টার খৈয়ের মত একরকম শস্যদানা বিক্রি হচ্ছে, পথচারী ও ভ্রমণ-কারীরা সকলে সেইগুলি কিনে কিনে পায়রাদের দিচ্ছেন। সেই জন্যই বোধ হয় ওরা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে উড়ে যায় না। স্কোয়ারে আমাকে দেখে এখানেও সকলেই খুব কৌতূহলের সঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বলাবলি করছিল — 'এরা কোন্ দেশী লোক ?'

এখানে এত ঘোরাঘুরি ক'রে আমি ক্লান্ত হই খুবই, কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠি। বোধ হয় ঠাণ্ডা জায়গার গুণেই।

ভেনিসে আসার পথে ট্রেনে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে মন দুলে উঠছিল আমাদের শস্যশ্যামলা জন্মভূমি বাংলা-মাকে মনে প'ড়ে। বাংলাদেশের সঙ্গে এ দেশের সৌসাদৃশ্যে মন আনন্দে, বেদনায় ও বিস্ময়ে বারংবার অভিভূত হচ্ছিল। দু'পাশে ছোট ছোট পাহাড় ও শস্যক্ষেত্র সাঁওতাল পরগনার রেলপথগুলিকেই মনে করিয়ে দেয়! ছোট ছোট বাড়ি, রাঙা টালি ও খাপ্‌রা দিয়ে তৈরি বেশির ভাগ, খড়ের চালের কুটিরও আছে। সমস্তই খুব ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নূতনত্বের মধ্যে অজস্র আঙুরের চাষ। কৃষকেরা কোথাও ধান কেটে স্তূপীকৃত করছে সারিবদ্ধ স্তূপশ্রেণী সাজিয়ে, কেউ কেউ-বা গাড়িতে শস্য বোঝাই করছে। গরুগুলির চেহারা সুস্থ-সবল, নধর, পরিপুষ্ট। রেলপথে আসতে River Po নামে বিখ্যাত নদী পার হ'লাম অনেকক্ষণ ধ'রে। বহু ভাঙা বাড়ি, কারখানা দেখা গেল। শুনলাম, বোমাবর্ষণে এ সব জায়গা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন অনেক নতুন বাড়িঘর উঠেছে। যে-সেতুটির উপর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলছিল সেটি সাময়িক তৈরি ক'রে ব্যবহার চলছে, পাশেই বিরাট লৌহসেতুর নির্মাণকাজ চলেছে দেখলাম। সেটি তখনো সমাপ্ত হয়নি।

গাড়িতে আসার সময়ে আমাদের কাম্‌রায় আমরা আটজন যাত্রী ছিলাম। আমি, আমার স্বামী এবং আমাদের পথসঙ্গী বা গাইড্ মিঃ মিত্র ছাড়া বাকি পাঁচজন যাত্রী ইতালীয়ান। মিত্র মহাশয় তো বহুভাষাবিদ্। যেখানেই যান না কেন,

যে-কোন ভাষায় চমৎকার আলাপ জমিয়ে নিতে সুপটু। ট্রেনযাত্রীরা তাঁর সঙ্গে ইতালীয়ান ভাষায় আলাপ ক'রে আমাদের সম্বন্ধে জানার কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন। মিত্র মহাশয় সবাইকে বলতে লাগলেন — এরা ভারতবর্ষীয় মানুষ। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রে ইতালীতে এসেছে, ইত্যাদি। তারপর আমি যা' যা' বলতে লাগলাম, মিত্র মহাশয় দ্বিভাষীর কাজ ক'রে সেগুলি ইতালীয়ান ভাষায় তর্জমা ক'রে তাদের বোঝাতে লাগলেন। আমরা সধবা নারীরা কি করি এবং কিরকম পোষাক পরি ও বিশেষ সধবা-চিহ্ন ধারণ করি, আর বিধবা নারীদের কি করতে হয় এবং কিরকম বেশভূষা ও বিশেষ বিধবা-চিহ্ন ধারণ করতে হয়, কুমারী মেয়েরা কিরকম সাজসজ্জা ও চিহ্ন ধারণ করে — এই সকল বিষয় বাংলায় বললুম। মিত্র মহাশয় সেগুলি ইতালীয়ান ভাষায় তর্জমা ক'রে তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং মাথায় সিন্দূর ও হাতের লোহা দেখে খুব খুশি হলেন মনে হয়। কারণ, বারবার মেয়েরা আমাকে তাঁদের হাতের আঙুলের আংটি দেখিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলেন যে তাঁরাও বিবাহের চিহ্ন ধারণ করেছেন। তারপর আমার স্বামী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু ব'লে মিত্র মহাশয়কে বললেন, "ওঁদের এই সকল কথা বুঝিয়ে দিন। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, আমাদের সম্বন্ধে একটু জানা দরকার এঁদের সকলের।" মিত্র মহাশয় সেই সব কথা তাঁদের তর্জমা ক'রে বললেন। তাঁরা বেশ আশ্চর্য হ'লেন বোঝা গেল। বললেন, "ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আমরা একেবারে কিছুই জানি না।"

মঙ্গলবার, ১৭ মে ১৯৪৯। হোটেল য়ুনিভার্সো, রোম॥

আজ সকালে আমরা ভেনিসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকাল আটটার ট্রেনে ফ্লোরেন্স যাত্রা করি। বেলা একটায় ফ্লোরেন্স পৌঁছে লাঞ্চ খেয়ে শহর ঘুরতে বেরোই। ওখানকার যা' দুটি ডোম্ আছে তা' দেখে বেলা চারটা নাগাদ আবার স্টেশনে ফিরে আসি। ফ্লোরেন্স ছোট্ট জায়গা, দেখবার বিশেষ কিছুই নেই। স্টেশনে এসে খোঁজ পাওয়া গেল বেলা পাঁচটায় একটা ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন ছাড়বে, রোম যাবে সোজা, পথে কোনও স্টেশনে দাঁড়াবে না। কিন্তু সে-ট্রেনে সমস্ত কামরাই কেবলমাত্র ফার্স্ট ক্লাস্। শুনেই উনি সেই ট্রেনেই যাবেন স্থির ক'রে ফেললেন। এই ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনে গেলে আমরা রাত্রি সাড়ে আটটায় রোমে পৌঁছবো, কিন্তু পরের ট্রেনখানিতে গেলে রাত্রি সাড়ে এগারটায় পৌঁছতে হবে। তখনই আবার ছয় হাজার লিরা দিয়ে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস তিনখানি টিকিট ট্রান্সফার ক'রে আমরা ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনেই রওনা হয়ে ঠিক সাড়ে আটটায় রোমে পৌঁছলাম। হোটেলে পৌঁছেই হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে গিয়ে তিনজনে ডিনার খেয়ে নিলাম। মিত্র মহাশয় এইবার আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

রোম। বুধবার, ১৮ মে ১৯৪৯, বেলা সাড়ে দশটা॥

আজ সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ওঁর মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, আমার সায়া, রুমাল ইত্যাদি কেচে রৌদ্রে দিলাম। উনি স্নান করতে গেলেন। ঘরের সঙ্গে বাথ্‌রুম এবং গরম জলের ব্যবস্থা থাকায় কাচবার একটুও অসুবিধা নেই। রোমে এসে পর্যন্ত একদিনও বৃষ্টি পাইনি, খুব চমৎকার খট্‌খটে

রোদ। কাপড়চোপড় কেচে আমিও স্নান ক'রে নিলাম ভাল ক'রে। এই ক'দিন ঘোরাঘুরির জন্য তিন দিন আমার স্নানই হয়নি। আজকের দিনটা আমরা রোমে একটু বিশ্রাম নিয়ে ও গোছগাছ ক'রে কাল সকালে ৭টা ৪৫ মিনিটে T. W. A. অফিসে যাবো এবং সেখান থেকে ওদের বাসে বিমানঘাঁটিতে গিয়ে বিমান ধরবো।

এখানে ক'দিন থাকায় হোটেলের লোকেরা আমাদের খাওয়া-দাওয়া যখন বেশ একটু বুঝে নিয়েছে, ঠিক তখনই আমাদের চ'লে যাবার সময় হয়ে গেল। এই রকমই হবে বোধ হয় সর্বত্রই। অনেক ইতালীয়ান কথা মুখস্থ ক'রে নিয়ে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। এখানে থাকা, ঘোরাঘুরি এবং জিনিসপত্র কেনায় অনেক খরচ হয়ে গেল এই কয়দিনেই।

পথে বেরোলেই আমাকে দেখে অনেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসাবাদও করে। কেউ-বা বলে ইণ্ডিয়ানা, কেউ-বা বলে ইণ্ডিয়ানো, আবার কেউ কেউ চায়নাও বলে। এরা বোধ হয় শাড়িপরা ভারতীয় মেয়ে খুব কমই দেখে, কারণ ভেনিস ও ফ্লোরেন্সে গিয়েও ঠিক একই ব্যাপার। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিশুরা আমাকে ঘিরে ধরে। আমি তখন বেজায় বিব্রত হয়ে পড়ি, আমার স্বামী এবং মিত্র মহাশয় খুব হাসতে থাকেন এবং মজা উপভোগ করেন।

১৮ মে, ১৯৪৯। রাত্রি নয়টা॥

আজই রোমে শেষ রজনী। সত্যিই রোম দেখার-মত জায়গা; কিন্তু মানুষগুলি সুবিধার নয়, বিদেশীদের অত্যন্ত ঠকায়। অবশ্য এ-ব্যাপার আমাদের দেশেও আছে। আমি

হোটেলের পাশে প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট্ বাড়ির দিকে তাকিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি এ-দেশের মানুষদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বা গৃহস্থালী কর্মের পদ্ধতি। দেখলে বোঝা যায় এরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ, যারা প্রাত্যহিক শ্রমার্জিত অর্থে তু'বেলা আহারের সংস্থান করে। এরা ধনশালী নয়, কিন্তু কী সুপরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিশালী, লক্ষ্য করবার বিষয়। সকাল-বেলায় উঠেই বাড়ির গৃহিণী পরিচ্ছদের উপরে এক বহির্বাস (Apron) এঁটে বিছানাপত্র, ঘরের মেঝের গালিচা ইত্যাদি সমস্ত সুপরিপাটি ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিয়ে স্নান করতে চলে গেলেন। স্নানের পর রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ সমস্ত নিজেই করবেন। একটি প্রায় আশী-পঁচাশী বৎসর বয়সের বৃদ্ধা রোজ সকালবেলায় দেখি ঠুক্ ঠুক্ ক'রে প্রত্যেকটি টবের গাছে জলসিঞ্চন করছেন এবং শুকনো পাতা ডাল পোকা প্রভৃতি বেছে গাছগুলি পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখছেন। সামান্য একফালি ছাদ, যৎসামান্য তার আয়তন, তারই মধ্যে ছোট ছোট টব সাজিয়ে বাগান করা হয়েছে। এমন কি, বাড়ির প্রত্যেকটি জানালার কার্নিশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টবে চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে এরা। কাঠের বাক্সে, ভাঙা ডেক্‌চিতে মাটি ভ'রে ফুলগাছ তৈরি ক'রে রেখেছে।

আজ আমার স্বামী হোটেলের মালিকের কাছে প্রাপ্য মিটাতে গেলেন যখন, তিনি তখন আমার স্বামীকে বললেন,—“নিশ্চয়ই তোমরা মধুচন্দ্রমা (Honeymoon) যাপন করতে বেরিয়েছ আশা করি।” আমার স্বামী হেসেই অস্থির। তিনি জবাব দেন, —“আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ে আমরা দেশে রেখে এসেছি। আমার বড় ছেলেটির বয়স ষোলো বৎসর। সে

কলেজে পড়ে। আমাদের বিয়ে হয়েছে উনিশ বৎসর।" শুনে সাহেব চোখ বড় বড় ক'রে বিস্ময়ে বলেন,—"কিন্তু তোমার স্ত্রীর বয়স নিশ্চয় আটাশ-উনত্রিশের বেশি নয়!" আমাদের খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছে শুনে তখন বলেন,— "আমাদের দেশে তো এ রকম হয় না, তাই আমি আশ্চর্য হচ্ছি।"

বৃহস্পতিবার, ১৯ মে ১৯৪৯। বিমানপথে — রোম থেকে জেনিভা॥

সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে T. W. A. অফিসে এসে তাদের বাসে ক'রে বিমানঘাঁটিতে এলাম। পূর্বপরিচিত সুইস্ মেয়েটি এবং তার বাবা ও মা আজ জেনিভা চলেছেন। ওঁরা হোটেল থেকে আমাদেরই সঙ্গে এসেছিলেন। ছোট্ট সুইস্ মেয়েটির বাবা ডাঃ বেলজারের সঙ্গে আমার স্বামী খুব গল্প করছেন। আমি সেই ছোট মেয়েটির সঙ্গে ও তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। ওরাও আমারই মত অল্পস্বল্প ইংরাজী বলে, তাই সুবিধা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল শুল্ক-হাঙ্গামা, পুলিশ-হাঙ্গামা মেটাতে। বিমান ছাড়ার পনেরো মিনিট আগে আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বিমানে তুলেছে। আমরা এবং সেই সুইস্-পরিবার ভালো জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। স্টুয়ার্ড এসে চুইং-গাম্ ও বালিশ দিয়ে গেল। 'বেল্ট্ বাঁধো — ধূমপান নিষেধ' — আলো জ্ব'লে উঠলো। ভয়াবহ গর্জন ক'রে একটুক্ষণ মাটিতে ঘুরে বিমান আকাশে উড়লো। তারপরই এক সাহেব এসে জ্ঞাপন করলেন — আমরা দশ হাজার ফীট্ উচু দিয়ে যাবো এবং তিন ঘণ্টা দশ মিনিট সময় লাগবে জেনিভা পৌছতে। তারপর প্রত্যেকের কাছে এসে

(হঠাৎ যদি কোনও বিপদ হয়) লাইফ্‌বেল্ট্‌ প'রে কি ক'রে নামতে হয় দেখিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেকের চেয়ারে সংলগ্ন লাইফ্‌বেল্ট্‌ রয়েছে দেখিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন। কায়রো থেকে ইটালী আসার পথেও এই রকম দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ বিমান উপরে ওঠার সময় air cross করতে খুবই দুলছিল। আমার ভীষণ মাথা ঘুরছিল, চোখ বুজিয়ে চুপচাপ শুয়েছিলাম। বেশি উপরে ওঠার পর আর কোনও দুলুনি ছিল না বা কষ্টও হচ্ছিল না।

১১টা ১০ মিনিট থেকে বিমানে যাত্রীদের লাঞ্চ্‌ দিতে লাগলো। যেমন সুন্দর ব্যবস্থা, খাবারও তেমনি চমৎকার। হোটেলে এই ক'দিন যা' তা' খেয়ে খেয়ে আজ এদের খাবার খুবই ভালো লাগলো।

সাদা প্লাস্টিকের ট্রেতে খোপ্‌-খোপ্‌ করা। প্রত্যেক বাটির সাইজ্‌ অনুসারে ছুরি কাঁটা চামচ পর্যন্ত। আমরা বীফ্‌ খাই না বলায় আমাদের রুটি, মাখন, কেক, আলু কড়াইশুঁটি গাজর বীন ইত্যাদি সিদ্ধ, স্যুপ, চাট্‌নি, একটি ক'রে আপেল, চকোলেট, আইস্‌ক্রিম্‌ দিয়ে গেল। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলে—ওয়াইন্‌, কফি, অরেঞ্জ-জুস্‌ আছে, কে কি খাবে? আমরা অরেঞ্জ-জুস্‌ খেলাম। বেশ তৃপ্তি ক'রে খেয়ে শরীর সুস্থ হ'ল।

বাথ্‌রুমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিখুঁত সাজানো। ছোট ছোট সাবান, ন্যাপ্‌কিন্‌ তোয়ালে, লিকুইড্‌ ক্রিম্‌, সেফ্‌টিপিন পর্যন্ত। বড় আয়না এবং বসার জন্য কৌচও আছে।

আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা উঠেছেন চারটি সন্তান এবং একটি 'মেইড্‌' নিয়ে। একটি দশ-এগারো বছরের

মেয়ে, একটি সাত-আট বছরের মেয়ে, একটি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে এবং একটি মাস দুইয়ের কচি শিশু। শিশুটিকে নিয়ে 'মেইড্' হিমসিম খাচ্ছে। সে বেজায় কান্নাকাটি করছে। স্টুয়ার্ড্ এসে একটা ধারে একটি দোল্‌নার মত জিনিস টাঙিয়ে দিয়েছে, তাতে শুইয়ে শিশুটিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। তার মা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে গিয়ে গরম জল এনে ফুড্ তৈরি ক'রে খাওয়ালো বাচ্চাটিকে। এই রকম সুব্যবস্থা পথে-ঘাটে পাওয়া যায় ব'লেই এরা অত কচি শিশু নিয়েও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে পারে। জানে, পথে সমস্ত রকম সাহায্য ও সুবিধা পাবে। স্টুয়ার্ড্ এসে ছেলেদের হাতে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন দেখলাম। আমরা তো আমাদের দেশে এ সকল সুবিধা পাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

একটু আগে মার্সেল্ ছাড়ালো। সুন্দর শহর, দেখা গেল। আবার সব মেঘে ঢেকে গেছে। বিমান এখন বেজায় দুলছে। বাইরের আবহাওয়া খুব কন্‌কনে ঠাণ্ডা, কিন্তু বিমানের ভিতরে বসে বৈদ্যুতিক হিটারের জন্য কিছু বুঝতে পারছি না। একটু পরেই জেনিভা।

জেনিভায়

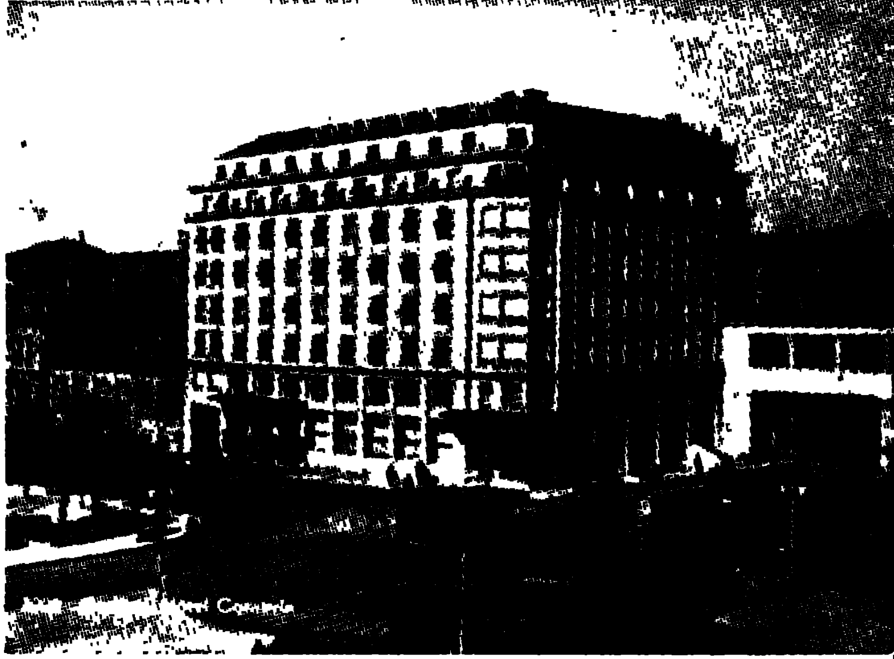
শুক্রবার, ২০ মে ১৯৪৯। হোটেল কর্নাভিন॥

কাল আমরা প্রায় বেলা দেড়টায় জেনিভায় নেমেছি। মেঘ ও বৃষ্টির জন্য প্লেন্ নামতে মিনিট কুড়ি দেরি করেছিল। আবহাওয়ার তীব্রতা-নিয়ন্ত্রিত বিমানগর্ভের আরামপ্রদ মধুর উষ্ণতা হতে মাটির বুকে নেমে দাঁড়ানোর সাথে সাথে শীতে কাঁপতে লাগলুম। তবু সেই সুইস্ ভদ্রলোকটি ডাঃ বেলজার বারবার সাবধান করায় আগেই গরম কোট ও ছাতা বার করা হয়েছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও আঁধার আকাশ দেখে মনেও যেন বিমর্ষতা ঘনিয়ে এলো।

এখানকার শুল্ক-পরীক্ষা ও ছাড়পত্র-পরীক্ষা মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে মিটে গেল। বিদেশী ভ্রমণকারী দেখে তারা কেউ আমাদের বাক্সপত্র কিছুই পরীক্ষা করলো না। অথচ আমাদের সঙ্গী সেই সুইস্ ভদ্রলোকটি, যিনি এই দেশেরই মানুষ, তাঁর আটটি বাক্সের প্রত্যেকটি খুলে পরীক্ষা হ'তে থাকলো।

আমরা T. W. A.র বাসে ক'রে ওদের অফিসে এলাম। পথের দৃশ্য চমৎকার। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট বাড়ি ও চারিদিকে ফুল, যেন অন্য রাজ্যে এলাম। T. W. A. অফিস থেকে হোটেল জেনে নিয়ে Cornavinএ এসে পৌঁছুলাম। হোটেলের ঘরখানি চমৎকার। চৌমাথা রাস্তার ঠিক কোনার উপরে ঘরখানি অবস্থিত। সেই জন্য তিন দিকের দূরদিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং তিন দিকের রাজপথ ঘর থেকে সুন্দর দেখা যায়। অন্যান্য হোটেলের তুলনায় এটি আরও বড় এবং অনেক নূতনত্বপূর্ণ ব'লে মনে হচ্ছে। ঘরের সব

জানালা বড় বড় কাচের এবং তার উপরে লেসের সাদা পর্দা টানা। ভিতর দিকে ফুলের কাজ-করা পুরু ভেল্‌ভেটের সবুজ



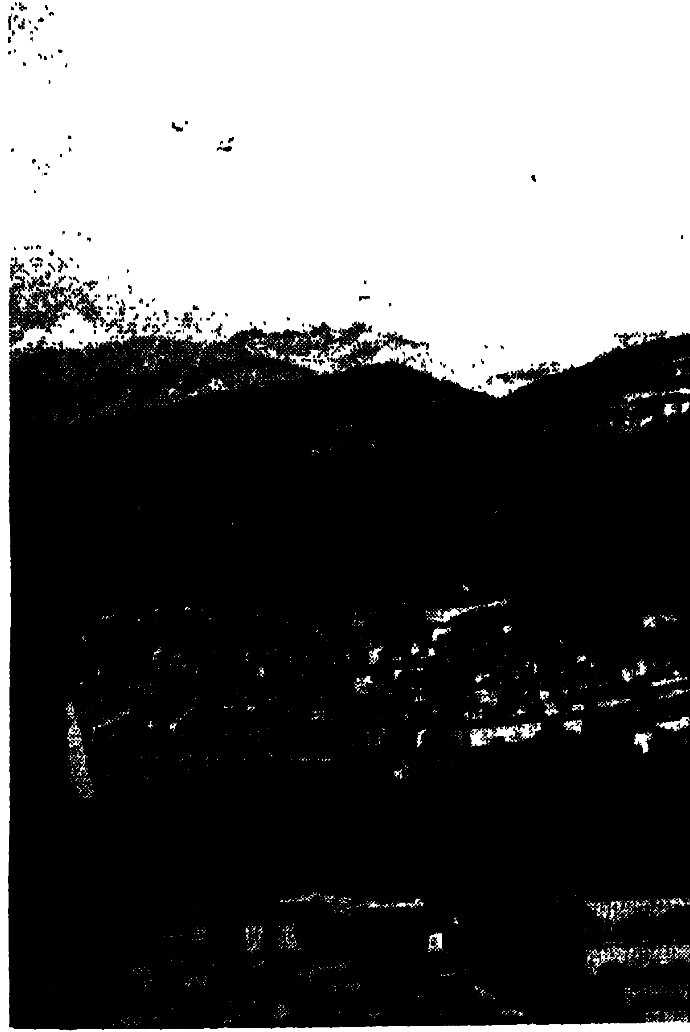
হোটেল কর্নাভিন — জেনিভা

পর্দা, — ঠাণ্ডা প্রতিরোধের জন্য। ঘরের মধ্যে 'হিটার্' আছে। কায়রো, রোম এবং ভেনিসের হোটেলের ঘরেও হিটার্ ছিল। শীতপ্রধান দেশ বলে সর্বত্র এই ব্যবস্থা।

আমরা চা খেতে বাইরে বেরুলাম। কাছাকাছি চা খেয়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলাম। খুব চমৎকার বাড়িগুলি। অনেক রকম সামগ্রীর বড় বড় দোকান, কিন্তু ঘড়ির দোকানই বেশি। কত রকমের ঘড়িই রয়েছে! অনেক মজার মজার ক্লক্ আছে। কোনোটায় জিরাফ্ যুদ্ধ করছে, কোনোটায় মেয়ে নাচছে, কোনোটায়-বা বুড়ো লোক মাথা নাড়ছে, ইত্যাদি।

ঘণ্টাদেড়েক বেড়িয়ে, 'অ্যামেরিকান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানী'তে গিয়ে আমার নামের চেক্ ভাঙিয়ে তারপরে হোটেলে ফিরলাম।

স্বামী আমাকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন মিসেস্ পি. সি. মহলানবিশের খোঁজে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে

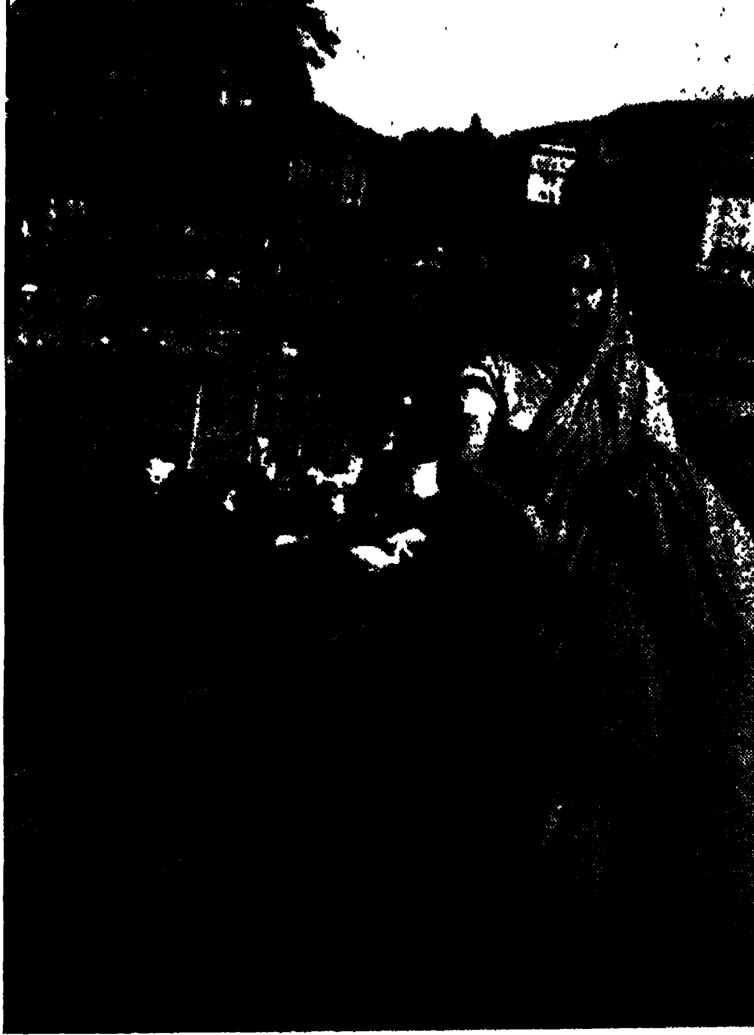


জেনিভা লেক ও ফোয়ারা, দূরে বরফাচ্ছন্ন মন্ত্‌ ব্লাঁক্ দেখা যাচ্ছে

বললেন, "ওঁরা প্যারিসে চ'লে গিয়েছেন, খবর পেলাম।" পূর্ব-পরিচিত সুইস্ ভদ্রলোকটি ব'লে দিয়েছিলেন কোন্ হোটেলে খেলে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা পৌনে আটটায় বেরুলাম সেই কফি-হাউসের উদ্দেশে নৈশভোজনের জন্য। কফি-হাউস্‌টি আমাদের হোটেল থেকে মিনিট সাত-আটের

রাস্তা। ওখানে গিয়ে আমরা যখন খেতে বসলাম তখন ঘড়িতে ৮টা ২০ মিনিট; সবেমাত্র সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। রোমে ৮টায় সন্ধ্যা হ'ত, জেনিভায় ৮টা ২০ মিনিটে সন্ধ্যা হয়।

ইতালীয়ানদের চেয়ে সুইস্‌দের রান্না অনেক ভালো। মটন্-কারী, মাছের ফ্রাই, আলু কড়াইশুঁটি বীন সিদ্ধ, আলুভাজা,



জেনিভা লেকের ধারে

রুটি ইত্যাদি দিয়েছিল। সবগুলিই সুখাদ্য। শেষে ফল এবং কেক্ খেয়ে আমরা উঠলাম। এদের আহার্যতালিকা (Menu)

দেখে খুশী হলাম। ইণ্ডিয়ান, মাদ্রাজী সব রকম ডিশ্ করে এরা। আগামী কালের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারে আমরা ইণ্ডিয়ান-ডিশ্ অর্ডার দিয়ে এসেছি। খেয়ে উঠে বেড়াতে গেলাম। কাছেই একটি মস্ত হ্রদ আছে। নাম জেনিভা লেক্। লেক্‌টি চমৎকার। সেটাতে একটু ঘুরে পালিয়ে এলাম। হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা, মাথায় গরম স্কার্ফ বেঁধেও খুব শীত করছিল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিন্তু বেশ গরম বোধ হতে লাগলো। দেখি, লেপ বালিস সমস্তই পালকের তৈরি। শেষে লেপটি সরিয়ে রেখে শুধু কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে হ'ল।

আজ সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের পরই বেরিয়েছিলাম। ফিরেছি বিকাল সাতটায়। বেলা দশটার সময় হোটেলের ম্যানেজার-নির্দেশিত টুরিস্ট্ কোম্পানীর অফিসে গিয়ে সারা দিন ভ্রমণ করার টিকিট কেনা হ'ল। টুরিস্ট্ কোম্পানীতে যাওয়ার পথে দু'জন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোককে দেখে বাঙালী ব'লে মনে হওয়ায় আমার স্বামী গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন। এঁরা বাঙালী নন্, দু'জনেই সিন্ধি। একজন খুব বিখ্যাত হার্ট্-স্পেশ্যালিস্ট্ ডাক্তার, নাম — ডাঃ কে. এম্. ভান্‌শালি। বোম্বেতে ভদ্রলোক প্র্যাক্‌টিস্ করেন। সুইজার-ল্যাণ্ডে তিনি ইতিপূর্বে দু'-তিনবার এসেছেন। অন্য ভদ্রলোকের নাম কে[illegible] জামেরিয়া। ইনি একজন বড় জুয়েলার। করাচী[illegible] [illegible] [illegible]দায় ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সৌভাগ্যে [illegible] হয়ে এখন বোম্বেতে এসে বাস করছেন। দু'জনে এঁরা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা কাল ১৯শে মে এখানে এসেছি শুনে বললেন, তাঁরাও কাল এখানে

প্যারিস্ থেকে এসে পৌঁছেছেন। টুরিস্ট্ কোম্পানী এখানকার দ্রষ্টব্যস্থানগুলি যাত্রীদের সমস্ত হেপাজৎ নিয়ে দেখায় শুনে ওঁরাও গেলেন আমাদের সঙ্গে। ডাঃ ভান্‌শালি ভ্রমণের টিকিট কিনলেন না, জামেরিয়া এবং আমরা টিকিট কিনলাম। টুরিস্ট্ কোম্পানী ব'লে দিলে, ঠিক আড়াইটার সময় এখান থেকে বাস্ ছাড়বে, তার আগে এখানে উপস্থিত হয়ে সবাইকে এখান থেকে বাসে উঠতে হবে।

আমরা টুরিস্ট্ কোম্পানী থেকে বেরিয়ে লেকের একপাশে অবস্থিত বাগানে গেলাম এবং ঘুরে ঘুরে কয়েকটা ফোটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল। কী চমৎকার বাগান! এমন ফুলের রাজ্য কোথাও দেখিনি। কতরকমের ফুল যে কতভাবে তৈরি করেছে দেখলে



রুশো আইল্যাণ্ড — জেনিভা

মুগ্ধ হতে হয়। এখানে প্রায় বারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে আমরা একটি ফোটোগ্রাফের দোকানে এসে আমাদের ফোটোগুলি

প্রিণ্ট্ করতে দিয়ে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস্ কোম্পানীতে গেলাম দেশের চিঠিপত্রের জন্য। কোনও চিঠি আসেনি। প্রায় বেলা একটা বাজে দেখে আমরা হোটেল কর্নাভিনের কাছাকাছি 'লা-বার্-জুরা' নামে কফি-হাউস্‌টিতে লাঞ্চ্ খেতে গেলাম। গত রাত্রে ইণ্ডিয়ান-ডিশ্ অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, আজ তাই খেলাম : ভাত, মটন্‌কারী, সবরকম আনাজসিদ্ধ, তিনরকম চাট্‌নি (আম, টোমাটো এবং কিস্‌মিস্ ও নারকেলমিশ্রিত একরকম), মিষ্টি কেক্ এবং সুপক্ক ফল। খাওয়াদাওয়া সমাপ্ত ক'রে আমরা প্রায় ১টা ৪০ মিনিটে বেরুলাম। জেনিভায় এসে খাওয়াটি বেশ ভাল পাচ্ছি। এধার-ওধার ঘুরে দোকান দেখে দেখে বেড়িয়ে তারপর প্রায় ২টা ১০ মিনিট হ'লে আমরা টুরিস্ট্ কোম্পানীতে গেলাম। দু'টি বাসই চমৎকার। নতুন স্প্রিং আঁটা এবং স্ক্রীন্ দেওয়া। আমরা আড়াইটার পরে রওনা হলাম।

রোমে যেমন দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখে শেষ করা যায় না,— এখানে দেখার কিছুই নেই। মিউজিয়ম, কাউন্সিল হাউস, সোভিয়েট্ নেতা লেনিন যেখানে বন্দী ছিলেন, সেণ্ট্ পিটার্স গির্জা, 'রিফর্মেশান মন্যুমেণ্ট্' ইত্যাদি। তবে পথের দৃশ্য খুবই সুন্দর। মাঝে মাঝে নেমে অনেকেই ছবি তুলে নিচ্ছিলেন। বেলা যখন চারটে বাজে, ইউনিভার্সিটির কাছে এসে আমার স্বামী একটা জরুরী প্রয়োজনে বাস থেকে নেমে হোটেল কর্নাভিনে চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন, যথাসময়ে টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাস-ষ্টেশনে এসে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। অনেক লেক ও পাহাড় ঘুরে বাস বেলা পাঁচটার পর যখন নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলো,

দেখা গেল স্বামী তখনও এসে পৌঁছননি। মিঃ জামেরিয়া বললেন,—"চলুন, আমি আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে



রিফর্মেশান মন্যুমেণ্ট্—জেনিভা

আসি।" আমি বললাম,—"না, আমার স্বামী এসে এখানে যদি আমাকে দেখতে না পান, হয়তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে আপনি টুরিস্ট্ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে বলুন, এঁরা আমাদের হোটেলে ফোন ক'রে খবর নিন্, উনি সেখানে আছেন কিনা।"

যাই হোক্ ফোন করতে আর হ'ল না, স্বামী এসে হাজির। জামেরিয়ার সঙ্গে আমরা দু'জনে তাঁর হোটেলে গেলাম। একটু অপেক্ষা করার পর ডাঃ ভান্‌শালি এলেন। ডাক্তার লোকটি বড়ই ভাল। আমাদের দেশের ধাত্রীবিদ্যাবিদ্ বিখ্যাত ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে খুবই চেনেন। ইনি মহাত্মাজীকে চিকিৎসা করেছেন এবং আমাদের দেশের আরও অনেক বিখ্যাত ও বড় বড় লোকের চিকিৎসা করেন শুনলাম। সুইজারল্যাণ্ডে এসেছেন এঁর এক পাঞ্জাবী রোগীকে নিয়ে। তাঁকে এখানকার স্যানিটোরিয়ামে রেখে সব-কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আবার দেশে ফিরে যাবেন। সুইজারল্যাণ্ডে যাতায়াতের বিমান খরচ এবং থাকার খরচ ছাড়া তাঁর ফী পাবেন দশ হাজার টাকা। ডাক্তার বললেন, উনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা গিয়েছেন গত বৎসরেই। আমাদের তাঁর বোম্বের বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে সাতটার সময় ফিরে চা খেয়েছি।

আজও সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি গেল। এবেলা বৃষ্টি নেই, তবু কিন্তু অন্ধকার। এখানে এসে দেখছি, মেয়েরাই রাঁধে এবং পরিবেশন করে। ইতালীয়ানদের মত এরা সুন্দর নয়, গালগুলি ফুলো-ফুলো, চোখ ছোটো-ছোটো এ-দেশের মেয়ে পুরুষের। মেয়েদের স্বভাব বেশ নম্র। মোটের উপর এরা লোক ভালো। একটা লোকও তো এ পর্যন্ত ঠকায়নি। এখানে কিন্তু আমাকে দেখে এরা একটুও বিস্মিত হয় না। শাড়িপরা ভারতীয় নারী যে এ-দেশের মানুষের অ-দেখা নয়, বুঝতে পারা যায়। আজ একটি শাড়িপরিহিতা মেয়েকে পথে দেখেছি। আমাদের সঙ্গে বাসে দ্রষ্টব্যস্থল দেখবার জন্য একটি

মাদ্রাজী পরিবার গিয়েছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা প্রায় জন আট। একজন শিখ ভদ্রলোকও ছিলেন। আমাদের হোটেলেই একটি ভারতীয় ছেলে এসেছে এ-দেশে ভ্রমণ করতে। ছেলেটি পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী। সঙ্গে আছে নববিবাহিতা তরুণী বধূ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুব অল্পবয়সী। একখানি 'ফোর্ড্ কার' কিনে সমস্ত কন্টিনেন্ট্ মোটরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সঙ্গে কাল এসেই আলাপ করেছিল এবং কালই ওরা প্যারিসে চ'লে গেল।

শনিবার, ২১ মে ১৯৪৯। জেনিভা॥

আজ সকালে উঠেই দেখি খুব রোদ উঠেছে। চারি-দিকের আকাশ পরিষ্কার। আমি আজ রোদ দেখে বেশ ক'রে স্নান করলাম। স্নান ক'রে শরীর অনেক ঝরঝরে লঘু বোধ হ'ল। আমাদের নিত্যস্নান অভ্যাস। যত ঠাণ্ডাই হোক্ না, দুই-তিন দিন স্নান না করলে নিজেকে অপরিচ্ছন্ন অনুভব করি। জানালার ধারে ব'সে রাস্তা ট্রাম্ বাস্ লোক-চলাচল দেখছি। দূরদিগন্তে নয়নাভিরাম পর্বতমালা ও পার্বত্য বনরাজি দৃষ্টিকে অভিভূত ক'রে দিচ্ছে। ধরিত্রী যে কত মনোহারিণী, কত বেশি বর্ণৈশ্বর্যময়ী, এ দেশে না এলে সম্যক্ ধারণা হ'ত না আমার।

এখানকার ট্রামে একখানি ক'রে বগী। দেখতেও তেমন সুবিধার নয়। বাস্‌গুলি চমৎকার দেখতে, ইলেক্‌ট্রিকে চলে। কায়রো, রোম ও ভেনিসে প্রতি হোটেলে লিফ্‌ট আছে কিন্তু এখানে অটোমেটিক্ লিফ্‌ট, নিজেরাই লিফ্‌টে উঠে বোতাম টিপতেই আপনিই চলে। যার যে-তলায় ঘর, সেই নম্বর

টিপলেই হবে। আমার তো কেবল মনে হয়, কোথায় চ'লে যাবো রে বাপু! এদের কেমন নিয়ম, যতক্ষণ আমরা ঘরে থাকবো কেউ আসবে না ঘর সাফ্ করতে। ঠিক নজর আছে, যেই আমরা বেরুবো, এসে সব ফিট্‌ফাট্ ক'রে রাখবে। এত জিনিস ছড়ানো থাকে, এ পর্যন্ত কোন একটিও চুরি যায়নি। আমরা রোম থেকে ভেনিস যাবার সময় একটি চাবি ফেলে গিয়েছিলাম, তিন দিন পরে এসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বার ক'রে দিলেন। মেইড্ ঘরে পেয়ে ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে গেছে।

আজ আমরা বাসে ক'রে অনেকদূর বেড়িয়ে এলাম। 'লীগ অব্ নেশন্স্ হাউস্' পর্যন্ত গিয়ে নেমে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে



জাতিসঙ্ঘের প্রাসাদ — জেনিভা

আবার একটা বাস্ ধ'রে এসে হোটেলে নামলাম। ওদিকটা খুব ফাঁকা ও মস্ত বড় বড় বাগান ও বাড়ি আছে। লেকের

ধার দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে ব'সে বিশ্রাম করেছিলাম। এখানে ঠিক সাড়ে আটটায় সন্ধ্যা হয়। আমরা সাড়ে আটটায় 'লা-বার্-জুরা'তে গিয়ে ডিনার খেলাম। 'লা-বার্-জুরা' হোটেলটি দু'টি বোনে মিলে চালায়। দশ-পনেরোজন মেয়েকে পরিবেশনকারিণীরূপে দেখতে পাই। মেয়েগুলি কি অসম্ভব খাটে, না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। বেলা বারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত লাঞ্চের ভীষণ ভিড়, তারপরে লোক কমে যায়। আবার রাত আটটা থেকে দশটা খুব ভিড়, যেন চরকির মত ঘোরে এবং যে যা' চায় হাসিমুখে পরিবেশন করে। আমাদের বাড়িতে একদিন বেশি অতিথি-সমাগম এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার হ'লে একটু বেশি পরিশ্রম করার দরুন পরদিন আর উঠতেই পারি না। এরা সবাই-ই বেশ রোজগার করে ও স্বচ্ছন্দভাবে থাকে। তবে এদের সাজসজ্জার খরচটাই প্রধান।

এ-দেশের বিভিন্ন স্থানে খাওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। ইতালীতে একটি ক'রে খাদ্যের পদ শেষ হ'লে তার পরের পদটি পরিবেশন করে। সুইজারল্যাণ্ডে আমাদের ফরমাইস মত খাদ্যের সমস্ত পদগুলি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে যায়, আমরা ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী পরিমাণমত তুলে নিয়ে যা'তে খেতে পারি। এতে আমাদের পক্ষে খাওয়ার সুবিধাই হয়, কারণ আমরা এটা-ওটা একসঙ্গে মিশিয়ে খেতেই প্রায় ভালবাসি।

রবিবার, ২২ মে ১৯৪৯। জেনিভা॥

আজ সকালে স্বামী ডাঃ ভান্‌শালির কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর পায়ের আঙুলে ব্যথার জন্য। ডাঃ ভান্‌শালি বলেছেন

ঠাণ্ডার জন্যই ঐ ব্যথা হয়েছে। একটা ট্যাব্‌লেট ওষুধ কিনে এনে খাওয়ার জন্য লিখে দিয়েছেন এবং ওষুধটি তিন দিন খেতে হবে ব'লে দিয়েছেন। উনি ওষুধটি ব্যবহার করছেন।

আজ আমরা খুব বেড়িয়েছি। সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ খেতে গিয়ে দেখি আজ ট্রামে খুব ভিড়। তারপর সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, আজ রবিবার, 'অল্‌-ডে' টিকিট বিক্রি হয় এবং সারা দিন ও রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সেই টিকিটে ঘোরা যায়। আমরা লাঞ্চ্‌ খেয়ে হোটেলে এসে একতলায় অফিসে যে ভদ্রলোক বসেন তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বেশ ইংরাজী ভাষা বোঝেন এবং বলেন। তিনি বললেন—"সামনেই যে ট্রাম্‌-টার্মিনাস আছে, সেখান থেকে টিকিট কিনবেন, এক-একজনের দুই ফ্রাঙ্ক লাগে।" কোথা থেকে কোথায় যাব তাও একটা কাগজে লিখে বুঝিয়ে দিলেন। চার ফ্রাঙ্ক দিয়ে দু'খানি 'অল-ডে' টিকিট কিনে সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল যে ৯ নম্বর ট্রামই সব চেয়ে দূরে যায়, জেনিভা ছাড়িয়ে 'হেরমেস্‌' নামে এক গ্রামে। ৯ নম্বর ট্রাম আসতেই আমরা উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রাম ভ'রে উঠলো লোকে। আজ রবিবার, সকলেরই হাতে কিছু-না-কিছু জিনিস রয়েছে। এরা গ্রামে নিজেদের বাড়ি অথবা আত্মীয়স্বজনের কাছে যাচ্ছে বোধ হয়। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো আমাদের হেরমেস্‌ পৌঁছতে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে যখন ট্রাম্‌ চলছিল খুব ভালো লাগছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টালির বাড়ি, সামনে একটু ক'রে ফুলের বাগান,—যেন ছবির মতই। কোথাও বাগানে প্রকাণ্ড ছাতার তলায় টেবিল চেয়ারে ব'সে অনেকে চা খাচ্ছে, কোথাও-বা

শিশুরা খেলছে, কোথাও মাটি কোপাচ্ছে। মাঝে মাঝে ট্রাম্ থামছে এবং লোক নামছে। কাছেই যাদের বাড়ি তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রিয়জনেরা এসেছে ট্রামের স্টপেজে। আমার অত্যন্ত ভাল লাগছিল সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীনীড়গুলি দেখতে। ইচ্ছা হচ্ছিলো, নেমে গিয়ে ভিতরে দেখে আসি। মাঝে মাঝে রেস্টুরেণ্ট ও কফি-হাউস্ আছে। আজ রবিবার, গ্রামেও খুব ভিড় লেগেছে। এক জায়গায় একটু বড়গোছের রেস্টুরেণ্টে বেশি ভিড়। কন্সার্ট্ বাজছে ও নাচ চলছে দেখলাম। শেষ স্টপেজ্ হেরমেসে এসে ট্রাম থামলো। অনেকেই ট্রাম থেকে নেমে চা খেতে গেল, আমরা ভয়ে নামলাম না, যদি ট্রাম চলে যায়! কেউ কথাও বোঝেনা যে জিজ্ঞাসা করবো। যাই হোক দশ-পনেরো মিনিট পরে আবার অনেকেই উঠলো। ট্রাম ঘুরে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে ফিরলো। পাঁচটার পরে আমরা আবার কর্নাভিন্ প্লেসে ফিরে এলাম। হোটেলে এসে চা খেয়ে আবার ছ'টায় বেরিয়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুরে 'লা-বার্-জুরা'তে, ডিনার খেয়ে দশটায় ঘরে ফিরলাম।

বিকেল ছ'টার সময় বেরিয়ে ৬নং ট্রামে উঠে শহরের আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে এলাম। এদিকটাও পল্লীগ্রামেরই মত। আমার স্বামী বললেন, 'চার ফ্রাঙ্ক দিয়ে সমস্ত শহরটা চিনে নিয়েছি। যাই হোক সেদিন বারো ফ্রাঙ্ক খরচ ক'রে টুরিস্ট্ কোম্পানীরা যা' ঘুরিয়েছিল, আজ আমরা তার থেকে অনেক বেশি ঘুরেছি।'

এখানে রবিবার যেন এদের একটা উৎসব। দলে দলে সকলেই বেরিয়েছে আউটিংএ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি

এদের মধ্যে। ছোট ছোট মেয়েরা সব এক রকমের ইউনিফর্ম পরা, হাতে স্যুট্‌কেস্‌, কারু-বা পিঠে কম্বল বাঁধা, জিনিসপত্র নিয়ে সব কোথায় যে বেড়াতে যাচ্ছে জানি না। ছাত্ররা কুড়ি-পঁচিশখানা সাইকেল চালিয়ে দূরে কোথাও যাচ্ছে। কত স্বামী-স্ত্রী শিশুদের নিয়ে দল বেঁধে চলেছে। আমি সকাল থেকে ঘরে বসে বসে পথের নানান্‌ রকম দৃশ্য দেখছিলাম।

সোমবার, ২৩ মে ১৯৪৯। হোটেল কর্নাভিন্‌, জেনিভা॥

এখানে দু'দিন রোদ ওঠার পর আজ আবার সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এ কয়দিনে আমার স্বামী তো সারা জেনিভা চিনে ফেললেন। এখানে আমাদের ভাষা বোঝে এমন লোক কিন্তু কমই আছে। ট্রাম্‌ ও বাস্‌ কণ্ডাক্টারগুলি একটুও ইংরাজী জানে না। আমাদের হোটেলের কাছেই 'জেনিভা লেক'। এ দেশের লোকে বলে — 'ল্যাক্‌-লেমান'। আমরা প্রায়ই ঐ লেকে গিয়ে বসি। বাগানে কী ফুলই ফুটেছে! এখানে ফুল খুব সস্তা। দোকানে দেখি ফুল সাজানো আছে, তার সঙ্গে দামও লেখা আছে।

এখানে সবই ভালো, কেবল এদের নারী ও পুরুষের এই অবাধ মেলামেশাটা সংযত-সুন্দর মানবজীবনে যতখানি সীমা-রেখায় থাকা উচিত, তার পরিধি ডিঙিয়ে উদ্দাম স্রোতে বয়ে' চলেছে ব'লেই আমাদের কাছে মনে হয়। আমরা দৈহিক শুচিতা এবং দৈহিক আচার-আচরণের মর্যাদা-অমর্যাদা যতখানি সীমায় দেখি, অর্থাৎ আমাদের নৈতিকতার মানদণ্ড যতখানি, এদের জীবন তার থেকে এত বেশি দূর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে — যা

আমরা কল্যাণকর ব'লে ভরসা করতে পারি না। প্রথম-যৌবনে সকল জীবের জীবনেই প্রকৃতির আহ্বান উদ্দাম হয়ে আসে। মানুষ, সাধারণ জীব হতে স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ সেই-খানেই, যেখানে সে, প্রকৃতিকে নিজের অধীন ক'রে প্রবৃত্তিকে সংযমের রাশে টেনে জীবনকে কল্যাণের পথে অগ্রসর ক'রে চলেছে।

কাল রবিবার ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজ ও হোস্টেল বোর্ডিং থেকে ছাড়া পেয়ে সকলেই দেখি যে যার বান্ধবী এবং বন্ধু নিয়ে মশ্‌গুল্। লেকে দিনের আলোয় প্রকাশ্যভাবেই যা ব্যাপার সমস্ত চলেছে, তা বলবার মত নয়। বাইরের লোকের দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও নেই। এদেশের লোকেরা তো দেখি এ-সব দৃশ্যে অভ্যস্ত, সুতরাং তারা এদিকে দৃক্‌পাতও করে না, অথচ আমাদের তো একেবারে চক্ষুস্থির!

আমাদের দেশের অল্পবয়সী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা এই সব দেশে পাঠাই এবং পাঠাতে হবেও। কিন্তু এই রকম পরিবেশে উল্টা উৎপত্তির যথেষ্টই সম্ভাবনা। অল্পবয়সী ছেলেদের এই সংসর্গ এবং এই ধরনের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সত্যিই বড় কঠিন। খুব অল্প ছেলেই বোধ হয় এ-সব দেশে এসে মাথা ঠিক রাখতে পারে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের অন্যান্য বহু গুণ আছে, যা' আমাদের মধ্যে নেই, অথচ নৈতিকচরিত্রের ত্রুটি বোধ হয় বেশির ভাগ মেয়েরই আছে। দুর্বোধ্য এদের এই সামাজিক রহস্য!

আমরা যে হোটেলটিতে আছি, এটি খুব প্রকাণ্ড ও চমৎকার হোটেল। আমরা পাঁচ তলার উপরে ৫০৭নং ঘরে রয়েছি। এর উপরেও আরও দু'তলা আছে। শুধু থাকা এবং

ব্রেকফাস্টের জন্য দৈনিক ত্রিশ ফ্রাঙ্ক হিসাবে চার্জ্ করে। অন্যান্য খাওয়ার জন্য আলাদা খরচ। আমরা লাঞ্চ ও ডিনার অন্যত্র খাই। বিকেলের চা কোনও দিন বাইরে, কোনও দিন হোটেলে এসেও খাই। তার জন্য হোটেলকে আলাদা চার্জ্ দিতে হয়। সকালে ব্রেকফাস্ট দেয় দু'জনের মত: চার পেয়ালা চা, এক জাগ্ দুধ, রুটি, মাখন, জেলি ও জ্যাম্। আমরা চীজ নিই না, সেজন্য মাখনটা প্রচুর দেয়।

ডায়েরি লিখতে লিখতে বেশ রোদ উঠে পড়েছে দেখে তাড়াতাড়ি মাথা ধুয়ে নিতে গিয়েছিলাম। এখন রোদে ব'সে চুল শুকাচ্ছি এবং ডায়েরি লিখছি। রোদ ওঠায় পাহাড়গুলো চক্চক্ করছে রূপোর মত। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, এবার বেরিয়ে একমাত্র ছেলেমেয়েদের জন্য মন-কেমন করা ছাড়া সংসারের অন্য কোনও চিন্তা একবারও কৈ মনে আসছে না! অথচ এই সংসার নিয়েই তো আমরা দিনরাত মেতে থাকি। এখানে চিন্তার মধ্যে নিজেদের শরীর সুস্থ রাখা ছাড়া আর কোনও ভাবনা নেই। বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছি ব'লে মন এত ছড়িয়ে আছে যে অন্য চিন্তার আর অবসর নেই।

জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি, কী পরিচ্ছন্ন রাস্তা, কোথাও একটুকরো কাগজ, দেশলাইকাঠি কিছুই প'ড়ে নেই। রাস্তায় খানিক দূর অন্তর লাইট্পোস্টের সঙ্গে একটি ক'রে লোহার বাস্কেট্ আটকানো আছে, বাজে কাগজ, কাঠি, নোংরা যা' ফেলবার, প্রত্যেকেই তার মধ্যে ফেলে রাস্তা হাঁটছে। পথে কেউ সামান্যমাত্রও আবর্জনা ফেলে না। নাগরিক-কর্তব্যবোধে শৈশবকাল থেকেই শিক্ষা পাওয়ার দরুন ধনী-দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ শহর পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বে স্বতঃ-

শিক্ষিত। রাস্তার মধ্যে মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেমে গেছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে নিচে বাথরূম পাওয়া যায়। পথচারী নাগরিকদের জন্যই এই বাথরূমগুলি। যাঁরা ব্যবহার করেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ব্যবহার ক'রে যান। আমাদের দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই এ-দেশের কাছে নাগরিক-কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার আছে।

মঙ্গলবার, ২৪ মে ১৯৭৯। জেনিভা॥

সুইজারল্যাণ্ডের সবটা মোটামুটি বেড়াবার পরিকল্পনা তৈরি ক'রে ফেলেছেন আমার স্বামী, সেই সুইস ভদ্রলোক ডক্টর বেলজারের সাহায্যে। কাল তুপুরে তু'ঘণ্টা ব'সে ম্যাপ দেখে প্ল্যান্ প্রস্তুত হয়েছে এবং স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ভাড়া এবং ট্রেনের সময় প্রভৃতি জেনে এসেছেন। কলকাতার চিঠি বা টেলিগ্রামে ছেলেদের কুশল সংবাদের অপেক্ষা করছি। আজ ওদের সংবাদ পেলে কাল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আমরা জেনিভা থেকে বেরিয়ে যাবো।

আমার স্বামীর চশমাটি ভেঙে গিয়েছে। কাল কোনও রকমে সেটি জোড়াতালি দিয়ে এনেছেন দেড় ফ্রাঙ্ক দিয়ে। প্যারিস কিংবা লণ্ডনে গিয়ে চশমাটি বদলাবেন, কারণ এখানে সুইস্ ফ্রাঙ্ক আমাদের কম আছে।

আজ তুপুরে লাঞ্চ খেতে বসেছি 'লা-বার্-জুরা'তে,— সেখানে খুব অল্পবয়সী একজন মার্কিন ভদ্রলোক এসে আমাদের প্রশ্ন করলেন,—"আপনারা নিশ্চয়ই ভারতীয় ?" আমরা 'হ্যাঁ' বলতে তিনি বললেন—তিনি মেক্সিকো দেশের লোক। তাঁর

খুব মুদ্রা জমানোর ঝোঁক; যদি আমাদের কাছে কোনও ভারতীয় মুদ্রা থাকে, তিনি ক্রয় করতে চান। আমার স্বামী উত্তর দিলেন, —"আমি হোটেলে ফিরে গিয়ে দেখবো এবং যদি থাকে নিশ্চয়ই আপনাকে দেবো।" তিনি বললেন, রাত্রে ডিনারের সময় 'লা-বার্-জুরা'তে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত্রিবেলায় ডিনারের সময় ঠিক সেই ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। আমার স্বামীর কাছে আনি, দুয়ানি, সিকি যা' ছিল দিলেন। ভদ্রলোক সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে এনেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা ভারতীয় মুদ্রার দাম দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার স্বামী দাম নিতে রাজি হলেন না। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন। ওঁরা বার্ন, জুরিখ, লুসার্ন, মন্ট্রো সমস্ত জায়গা ঘুরে এসেছেন। আমরা কাল যাচ্ছি শুনে কোন্ কোন্ জায়গা ভালো সব ব'লে দিলেন। ওঁদের স্বদেশ মেক্সিকোতে যেন যাই, অনেক ক'রে বললেন। ভারী ভালো লোক এই মেক্সিকান-দম্পতি। নিউইয়র্কে কোথায় কোথায় খাওয়ার ব্যবস্থা করলে সুবিধা হবে তাও ব'লে দিলেন।

আজও সারাদিন ছেলেদের খবর না আসায় উদ্বিগ্ন ছিলাম। রাত্রে আমার বড়ছেলের টেলিগ্রাম এল, ওরা সকলে বেশ ভালো আছে। যাই হোক্ আমি উৎসাহের সঙ্গে এইবার যাত্রার জন্য গোছগাছ করতে লাগলাম। আমাদের বড় স্যুট্‌কেসটি (রোম থেকে ভেনিস্ ও ফ্লোরেন্স যাত্রার মত) এখানে এই হোটেলেই থাকবে। আমরা চার পাঁচ দিনের উপযোগী সামান্য জিনিসপত্র T. W. A.র উপহার দেওয়া দু'টি ক্যান্‌ভাসের হাতব্যাগে ভ'রে নিয়ে চলে যাবো ঘুরতে।

আমরা রোমে যে ফোটোগুলি তুলেছিলাম সেগুলি এখানে ডেভালাপ্ করতে দিয়েছিলাম। সমস্ত ছবিই কালো হয়ে গেছে, একটিও ওঠেনি, স্বামী এসে খবর দিলেন। অত সুন্দর সুন্দর ছবি নেওয়া হ'ল, একটাও ওঠেনি শুনে আমার বেজায় মনখারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা যাবে।



মস্ত্ ব্লাঁক ব্রীজের উপর — জেনিভা

আমরা স্টেশনে গিয়েছিলাম টিকিট কিনে রাখতে কালকের জন্য। স্টেশনমাস্টার ইংরাজী বলতে এবং বুঝতে পারেন। তিনি আমাদের অনেক কাগজ, ছবি এবং সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাপ

দিয়ে তার মধ্যে লাল পেন্সিল্ দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এবং ব'লে দিলেন। বড় সুন্দর ব্যবহার এঁদের। আমরা সাধারণ ভ্রমণকারী — আমাদের প্রতিও কতটা যত্ন নিয়ে শ্রম ও সময় দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কষ্টস্বীকার ক'রে। ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় আটটা পর্যন্ত আমরা হেঁটে হেঁটে দোকান দেখে বেড়ালাম। কী সুন্দর ক'রে প্রত্যেক দোকান সাজানো! যে-দোকানই হোক, কিছু-না-কিছু ফুল সাজানো আছেই।

কাল সকাল ন'টার ট্রেনে জেনিভা ছাড়বো। আমরা জাংফ্রাউ যাবো। সেটা ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার ফীট উঁচু পাহাড়। আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার পরেই নাকি অদ্ভুত দৃশ্য, সবাই বলছে। কাল আমরা লুসার্ন ও মন্ট্রো যাবো। সেখানে এক দিন থেকে ইন্টারল্যাকান্ ও জাংফ্রাউ যাবো। ওখানে এক দিন থেকে আর এক জায়গায়। এমনি ক'রে সব ঘুরে জেনিভায় ফিরে আসতে ছয় সাত দিন লেগে যাবে।

মন্ট্রো (Montreux)

বুধবার, ২৫ মে ১৯৪৯ ॥

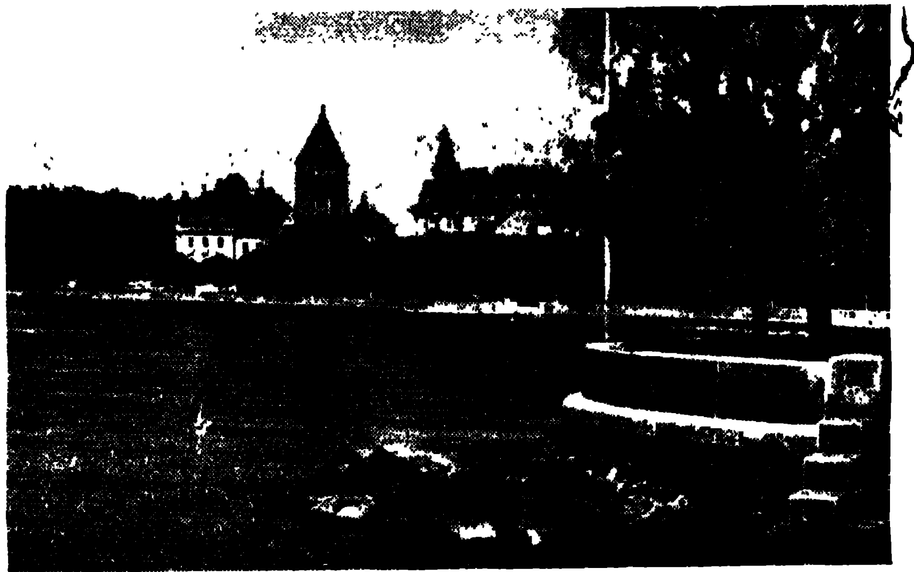
আজ সকাল ৯টা ৫ মিনিটে জেনিভা থেকে যাত্রা ক'রে ৯টা ৪৪ মিনিটে লুসানিতে (Lausanne) পৌঁছলাম। লুসানিতে দেখার মত জায়গা একমাত্র লুসানি-হ্রদ। স্টেশনে নেমে কোন্ দিকে যাবো কিছুই আমরা জানি না। অনেক জিজ্ঞাসা-বাদের পর একজন ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের ভাষা বুঝতে পেরে হদিস ব'লে দিলেন।



লুসানি-হ্রদ

এখানে যেখানেই যাই রেলস্টেশনে জিনিসপত্র জমা রাখার একটা ডিপার্ট্‌মেণ্টে কিছু দক্ষিণা দিয়ে জিনিসপত্র জমা রেখে যেতে পারা যায়। ওরা জিনিস জমা রেখে যে টিকিট দেয়, পরে সেটা দেখালেই গচ্ছিত জিনিস ফেরৎ দেয়। আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে ছোট দু'টি ব্যাগ মাত্র। তাই

জমা রেখে আমরা বেড়াতে বেরুলাম। এক আমেরিকান সাহেব আমাদের পথ বাত্‌লে দিলেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই ট্রাম-লাইন এবং বাস্‌-স্টেশন পাওয়া যায়। আমরা সেই সাহেবটির নির্দেশমত সেখানে গিয়ে 'উসির টিকিট' উচ্চারণ করামাত্র তা'রা দু'জনের জন্য দুখানি টিকিট দিয়ে তার দাম তেত্রিশ সেণ্ট্‌ নিলে। সেখানে আরও সব যাত্রী অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ বাদেই একখানি বাস্‌ এসে দাঁড়ালো। আমরা তাইতে উঠে 'উসি'তে গিয়ে একেবারে লেকের তীরেই নামলাম। সেই জায়গাটিরই নাম বোধহয়



উসি লেকের ধারে

উসি। লেকটি চমৎকার। এপার-ওপার দেখা যায় না, দিগন্তপ্রসারী নীল জলরাশি। পরপারে ঘন পর্বতের শুভ্র তুষার-শিখরশ্রেণী।

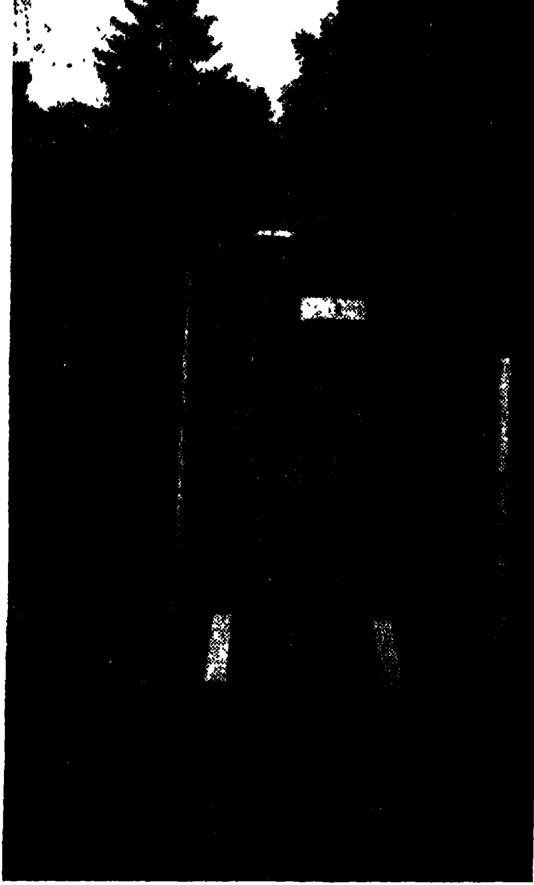
লেকের ধারের বাগানটি ফুলের স্তবকে এবং বর্ণবৈচিত্র্যে নয়নাভিরাম। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর মর্মরমূর্তি।

এখানকার কোনও শহরই সৌন্দর্যে কারুর চেয়ে কম মনে হয় না।

বেলা এগারটা-দশ মিনিট আন্দাজ সময়ে আমার স্বামী বললেন, "চলো, আস্তে আস্তে হেঁটে স্টেশনে ফিরে যাই।" পথ তো মোটে দশ মিনিটের সকলেই বলে দিলে, কিন্তু কী খাড়াই-রাস্তা রে বাবা! একেবারে দার্জিলিং-এর রাস্তার মত! কোনও রকমে যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন আমার অবস্থা একেবারেই কাহিল। তখনও ট্রেনের ২২ মিনিট দেরি দেখে, একটা কাফেতে ঢুকে চা এবং কেক খেলাম। দাম মোটে দু' ফ্রাঙ্ক নিলে। তারপর স্টেশনে এসে কার্ড্ দিয়ে ব্যাগ দুটি নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম আমরা। ১২টা ১৫ মিনিটে ট্রেন ছাড়লো এবং মন্ট্রোয় এসে পৌঁছলো ১২টা ৪৫ মিনিটে। অর্থাৎ, ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্ট্রোয় এসে 'Hotel De Londres'-এ উঠেছি। হোটেলটি যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু লেকের ধারেই এর অবস্থিতি হওয়ায় পারিপার্শ্বিক দৃশ্য খুব ভালই।

বেলা দু'টোর সময় বেরিয়ে টুরিস্ট্ কোম্পানী থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সমস্ত জেনে নিয়ে আমরা ট্রামে ক'রে চ'লে গিয়েছিলাম শিলোন্ ক্যাস্‌ল্ দেখতে। সেটা দেখে নিয়ে ওখান থেকে আবার ট্রামে ক'রে অন্য জায়গায় এসে গ্লিঁয় এবং কো দেখবো ব'লে একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে এসে ট্রেনের টিকিট কাটা হ'ল। সেখান থেকে ফ্যানিক্যুলার-ট্রেনে ক'রে ছয় হাজার ফীট্ উপরে উঠেছিলাম। ট্রেনটা ঠিক খাড়া হয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকে। সে এক অননুভূতপূর্ব নতুন উপলব্ধি! এই রকম ট্রেন নাকি সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া আর কোথাও নেই। উঠতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে, ট্রেনটি যতই উর্ধ্বে উঠতে

থাকে নিচেকার দৃশ্য ততই অপূর্ব চমৎকার দেখাতে থাকে। গাছপালা, লেক, ঘরবাড়ি সমস্তই যেন বাস্তব চলচ্চিত্রের মতই বোধ হতে থাকে। উপরে উঠে দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হোটেল, নিখুঁত সুরচিত বাগান, বসবার জন্য সুন্দর সুন্দর সীট্। দিব্যি শহর রচনা ক'রে রেখেছে মানুষ এই দুরারোহ পর্বতশিখরের উপরে। উপর থেকে লুসানি-লেক ও মন্ত্রো-র দৃশ্য অতিসুন্দর।



ফ্যনিক্যুলার ট্রেন

প্রায় ঘণ্টাখানেক উপরে থেকে আবার ঐ ফ্যনিক্যুলার-ট্রেনেই আমরা নামলাম; তারপরে হেঁটে অনেকদূর এসে একটা টী-রূমে চা কেক খেয়ে আবাসস্থল হোটেলে ফিরে এলাম। ছবির পোস্টকার্ড ছাড়া আর কিছুই কিনলাম না, সঙ্গে বোঝা বাড়লে বিমানভ্রমণের অসুবিধা হবে ব'লে।

এখানে যে-দুর্গটি আমরা আজ দেখে এলাম সেটি যথেষ্ট প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক দুর্গ। পাঁচশো বৎসর আগে এখানে স্যাভয়রা বাস করতো। এই শিলোন দুর্গের মধ্যে তখনকার

ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি সামগ্রী কিছু কিছু আছে। এক ফ্রাঙ্ক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হয়। মন্ট্রো চমৎকার শহর। লুসানি জেনিভার তুলনায় ছোট বটে, কিন্তু



শিলোন দুর্গ

লেক এখানে আরও সুন্দর এবং বড়। এখানে লাঞ্চ যা' দিয়েছিল, একেবারেই অখাদ্য। জেনিভাতে এর থেকে অনেক ভাল খাচ্ছিলাম। হোটেলের মেইড্ একটি বর্ণও ইংরাজী বুঝছে না। আমার স্বামী জ্বালাতন হয়ে বাংলাতে ওদের প্রতি যা-খুশি মন্তব্য করছেন, মেইড হেসে হেসে মরছে।

রাত্রে স্বামী ডিনার খাওয়ার পরে আবার একটু ঘুরতে বেরুলেন। আমার আর ঘুরবার মত অবস্থা ছিল না। ঘরে বসেই লেক ও পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

বৃহস্পতিবার, ২৬ মে ১৯৪৯। হোটেল জুরা — ইন্টারল্যাকান্॥

আজ আমরা সকালবেলায় ৮টা ৪৫ মিনিটের ট্রেনে যাত্রা ক'রে সাড়ে দশটার সময় ভ্যান্‌জিলাম আসি। সেখানে

ট্রেন বদল ক'রে এগারটার সময় রওনা হ'য়ে বেলা সাড়ে বারোটাতে ইণ্টারল্যাকান্ পৌঁছাই।

এখানে ট্রেন আমাদের দেশের দার্জিলিং-এর ট্রেনের মতই ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠে। পথের দৃশ্য অতি নয়নাভিরাম। পাশ দিয়ে বরাবর চলেছে লেক এবং পর্বতশ্রেণী। খুব ভাল লাগছিল আমাদের।

ট্রেনে দু'জন সাহেব এবং দু'জন মেম একটি দল হয়ে আসছিলেন আমাদেরই সহযাত্রী হয়ে। একজন সাহেব আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন — "আপনারা কোন্ দেশ থেকে আসছেন? দেখে মনে হয়, আপনারা সম্ভবতঃ ভারতীয়।"

স্বামী উত্তরে তাঁর অনুমান ঠিক ব'লে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, তাঁরা কোন্ দেশ থেকে আসছেন এবং কোথাকার মানুষ। সাহেবটি একটু হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললেন — "আমরা কোন্ দেশ থেকে আসছি এবং কোন্ দেশীয় লোক শুনলে সম্ভবতঃ তোমরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হতে পারবে না। সেজন্য আমরা বলতে একটু সঙ্কোচ অনুভব করছি।"

আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন — "ওহো, আমি বুঝেছি, আপনারা নিশ্চয়ই সাউথআফ্রিকা থেকে আসছেন?"

তাঁরা 'হাঁ' বললেন। যাই হোক্, অল্পসময়ের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁদের বেশ ভাব জমে উঠলো। তাঁরাও ইণ্টার্-ল্যাকানের যাত্রী এবং আগামী কাল জাংফ্রাউ শিখরে উঠবেন। আমরা খুশীই হলাম, একসঙ্গে সকলে মিলে ওঠা যাবে মনে ক'রে।

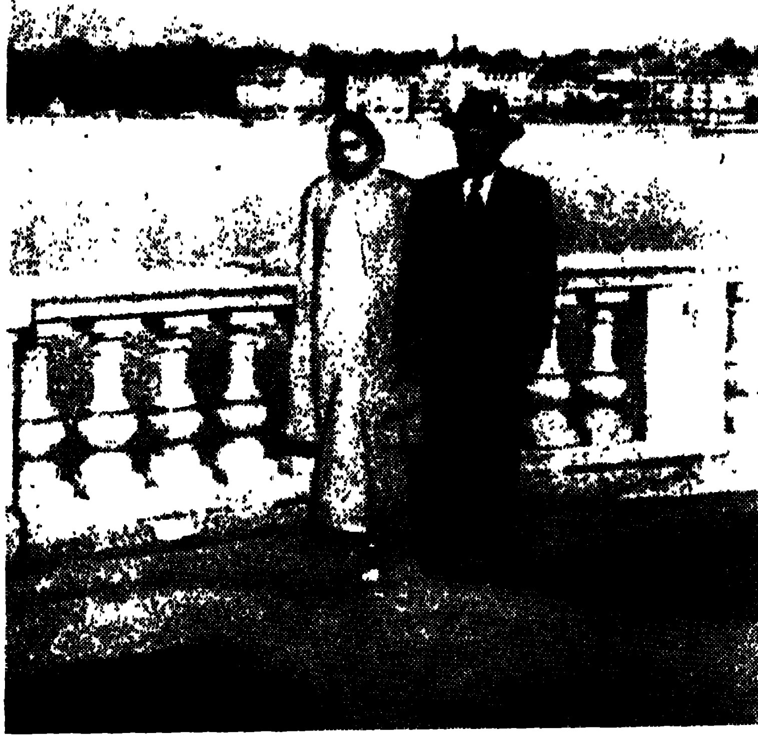
তারপর ঘটলো এক দুর্ঘটনা। সেই দলটি পথে একটি স্টেশনে নেমে বোধ হয় কিছু খেতে গিয়েছিলেন এমন সময়ে

ট্রেনটি দিল ছেড়ে। তাঁরা ছুটতে ছুটতে প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে চলন্ত ট্রেনের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে হায়-হায় করছেন, আমরা গাড়ি থেকে দেখতে পেলাম। তাঁদের সমস্ত মালপত্র আমার স্বামী আর একজন সহযাত্রী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে গার্ডের জিম্মায় জমা ক'রে দিয়ে এলেন। জিনিসপত্র খোয়াবার ভয় এদেশে নেই। হাজার হাজার টাকার জিনিস প'ড়ে থাকলেও এরা নেয় না। আজই সকালে মন্ত্রোয় 'হোটেল্ ডি লনড্রিস্' থেকে আসবার সময় একটি ঘটনা ঘটেছে যার উল্লেখ এখানে অবান্তর হবে না। আমরা ব্যাগ গুছিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে যখন বিল মিটিয়ে দিচ্ছি, তখন উপরকার মেইড্ এসে আমার স্বামীর হাতে তাঁর মনিব্যাগটি দিয়ে গেল। তা'র মধ্যে প্রায় তিন-চারশো সুইস্ ফ্রাঙ্ক ছিল। ইচ্ছা করলে সে অনায়াসেই মনিব্যাগটি আত্মসাৎ করতে পারতো। মাত্র একরাত্রির জন্য উঠেছিলাম তাদের হোটেলে। আমার স্বামী মেয়েটিকে কিছু বখ্‌শিশ করাতে যথেষ্ট খুশী হয়ে সে নিজের কাজে চ'লে গেল।

এখানে আসবার সময়ে ভ্যান্‌জিলাম্ ছাড়বার পর থেকে আগাগোড়া সমস্ত পথ শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী দেখতে দেখতে এলাম। এখন আমরা পাহাড়ের ঠিক নিচের শহরটিতে রয়েছি। এই জায়গাটিরই নাম ইণ্টারল্যাকান্ অর্থাৎ এখানে ছু'টি হ্রদ সংযুক্ত হয়েছে।

যে-হোটেলটিতে আমরা উঠেছি সেটি খুব সুন্দর। সম্মুখেই দেখছি আমাদের মহান্ হিমালয়ের ধবলগিরি শৃঙ্গের মতই শ্বেত বরফে আবৃত জাংফ্রাউ-পিক্। ইণ্টারল্যাকান্ থেকে ১২,০০০ হাজার ফীট ঊর্ধ্বে জাংফ্রাউ।

কাল সারাদিন লুসানি এবং মন্ট্রোয় অত ঘুরে পায়ে দারুন ব্যথা হয়েছে। কোনরকমে আস্তে আস্তে হাঁটছি।



মন্ট্রো লেকের ধারে

কাল অত বেশি ঘোরা আমার পক্ষে বেশ মাত্রাধিক হয়ে গেছে। আজ স্বামী একলাই সব ঘুরে এলেন। পায়ে ব্যথার জন্য আমি সম্পূর্ণ বিশ্রামে আছি। কাল ভোরেই আবার জাংফ্রাউ যাত্রা করতে হবে।

আমার স্বামীর সঙ্গে সেই ট্রেনের সহযাত্রী সাউথআফ্রিকা-

বাসী সাহেবদের দেখা হয়েছে। তাঁরা পরের ট্রেনে এসেছেন এবং পাশের হোটেলে আছেন। মালপত্রগুলি গার্ডের কাছে জমা ক'রে দিয়েছেন ব'লে আমার স্বামীকে তাঁরা যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরাও আগামী কাল আমাদের সঙ্গেই জাংফ্রাউতে উঠবেন বলেছেন।

আমার স্বামী বিকেলে চা খেয়ে আবার ঘুরতে বেরিয়েছেন। আমি হাতে দস্তানা, পায়ে গরম মোজা, মাথায় স্কার্ফ এবং ওভারকোট প'রে বারান্দায় বসে চেয়ে দেখছি ইণ্টারল্যাকানের তুষার-দৃশ্য কী অপরূপ! পৃথিবীর মধ্যে এই সব কত সুন্দর ও আশ্চর্য জিনিস, যত দেখি, ততই ছেলেমেয়েদের জন্য এবং আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য মন-কেমন করে। মনে হয়, আহা, এমন মনোরম দৃশ্য কেউই দেখতে পেলে না!

আমার স্বামী শহর ঘুরে দেখে এসে বলছিলেন — শহরটি ছোট্ট, কিন্তু দেখবার মত। আমি আর দেখলাম না।

শুক্রবার, ২৭ মে ১৯৪৯। হোটেল সিলার — লুসার্ন॥

ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা পৌনে আটটার ট্রেন ধরলাম। এক ঘণ্টা এগার মিনিট বাদে আমরা ল্যটার ব্রুনেন্ নামে একটি স্টেশনে গাড়ি বদল করতে নামলাম। সেখান থেকে ৯টা ৫ মিনিটে ট্রেন ধ'রে ক্লাইনে-সাইড্‌এগ্‌এ ১০টা ১৮ মিনিটে এসে নেমে পড়লাম। ল্যটার ব্রুনেন থেকেই ট্রেন খুব উঁচুতে উঠছিল। পাহাড় ও লেক ঘুরে ঘুরে ট্রেনলাইন গিয়েছে, খুব ভালই লাগছিল তখন।

ক্লাইনে-সাইড্‌এগ্ পৌঁছে আমরা ক্ষুদ্র বগী ট্রেনে উঠলাম এবং দু'পাশে নিরবচ্ছিন্ন তুষার-দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম।

মিনিট পনেরো কুড়ি বাদে পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে ট্রেন প্রবেশ করলো এবং কামরার বৈদ্যুতিক বাতিগুলি জ্ব'লে উঠলো। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট পার্বত্য সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ট্রেন ঋজু ঊর্ধ্বগতিতে উপরে উঠবার পর আমরা জাংফ্রাউশিখরে পৌঁছলাম বেলা প্রায় পৌনে বারোটায়। ট্রেনের কামরায় হিটার্ ছিল এবং সমস্ত কাচের শার্সি বন্ধ ছিল, সেজন্য শীত খুব বেশি অনুভূত হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে ট্রেন যখন থামছিল, তখন হাড়ের ভিতর পর্যন্ত শিরশির ক'রে কেঁপে উঠছিল, প্রচুর গরম পোষাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকা সত্ত্বেও। জাংফ্রাউতে ওঠার একটা আনন্দও আছে। চারিপাশে শুধু বরফের সাদা পাহাড়, মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা পাহাড়ী গাছ। অনেক জায়গায় গাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য থামছিল, অনেক যাত্রী তখন নেমে ছবি নিচ্ছিলো। যাদের আবার মুভি-ক্যামেরা, তারা ট্রেনে বসেই অনবরত ছবি তুলছিল। প্রায় প্রতি যাত্রীর হাতেই একটি ক'রে ক্যামেরা, কারুর কারুর হাতে আবার দু'টি ক্যামেরাও ছিল। আমার স্বামীর ছবিব শখ বিশেষ নেই। আমি ছবি তোলার জন্য জেদ করাতে বলতে লাগলেন — "থামো না, উপরে উঠে তুললেই হবে। দেখলে তো, ইতালীতে অতোগুলো ছবি তুললাম, সবই নষ্ট হয়ে গেল। আমার ও-সব আসে না জানোই তো।"

জাংফ্রাউ চূড়ায় উঠে ট্রেন থেকে নেমে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটি পাথরের দুর্গের মধ্যে সকলে প্রবেশ করলাম। সেখানে পৌঁছে সকলে ধাতস্থ হ'লেন, কারণ ঘরখানি হিটার-সংযুক্ত। ঘরের তিনদিকের দেওয়াল কাচের তৈরি এবং বড় বড় দরজা-গুলিও কাচের। ঘরের মধ্যে ব'সে চারিদিক দিয়ে দেখা যায়

শাদা বরফের রাজ্য। এমন কি, ঘরের কাচের গায়েও তুষারকণা জমে রয়েছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরতলায় সুসজ্জিত বৃহৎ 'ডাইনিং-হল্' বা ভোজনাগার এবং 'বার্' বা পানশালা। ভোজনাগারটিতে



জাংফ্রাউ হোটেল (বারো হাজার ফীট উঁচুতে)
কাচের জানালা দিয়ে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে

প্রায় একশো লোক একসঙ্গে ব'সে খেতে পারে। আমরা ডিম, আলুভাজা, কড়াইশুঁটিসিদ্ধ এবং চা ও রুটি বেশ ক'রে পেট ভ'রে খেয়ে সুস্থ হয়ে নিচের ঘরে নেমে এলাম। খাওয়ার চার্জ এখানে নিচেকার শহরের তুলনায় বেশি। নিচে সেই কাচের হল্‌টির একধারে ছোট্ট একটি স্টলে জাংফ্রাউ-এর নানারকম ছবি-পোস্টকার্ড এবং টুকিটাকি দ্রব্য একটি পাহাড়ী মেয়ে ব'সে বিক্রি করছে। আমরা কিছু রকমারি ছবির পোস্ট-কার্ড কিনে ফেললাম। ঐখানেই টেবিলে ব'সে সেই ছবির পোস্টকার্ডে ছেলেমেয়েদের চিঠি লেখা হ'ল। সম্মুখের

জানালাটিতে ছোট্ট ডাকঘর। সেখানেই টিকিট লাগিয়ে চিঠি পোস্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। তারপর স্টলে গিয়ে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'জুতা-সেফ্‌টিপিন্‌' দর ক'রে দেড় ফ্রাঙ্ক দাম দিয়ে কিনে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

ঐ কাচের হলের মধ্যে বাথরুমেরও সুব্যবস্থা আছে। পুরুষ এবং মেয়েদের জন্য পৃথক বাথরুম। মেয়েদের নির্দিষ্ট দিক্‌টিতে দেখলাম পাশাপাশি চারটি বাথরুম রয়েছে। কুড়ি সেণ্ট্‌ ক'রে ফেলে দিলেই এক-একটির দরজা আপনিই খুলে যায়।

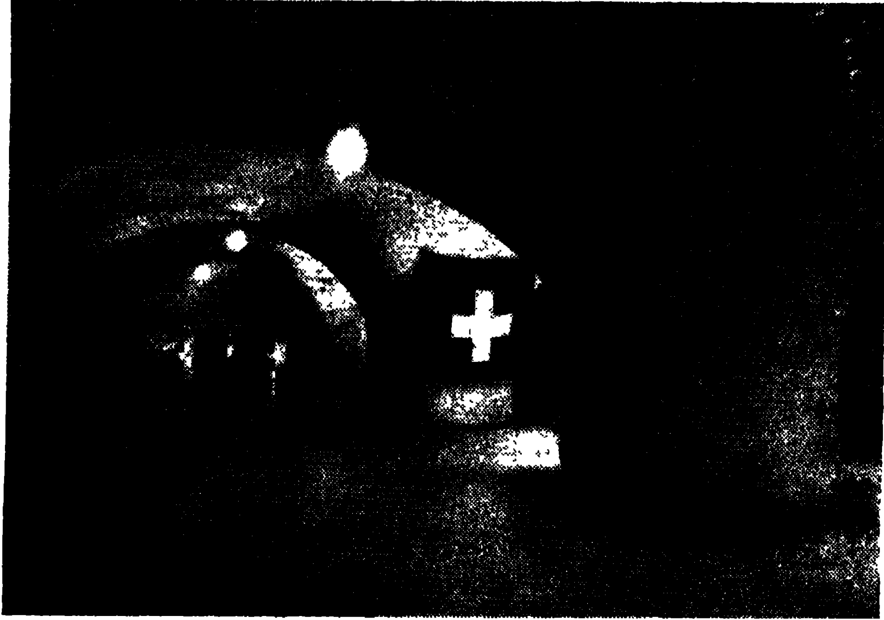
স্বামী প্রস্তাব করলেন — 'লিফ্‌টে ক'রে উপরে গিয়ে সবাই অব্‌জারভেটরি ও আইস্‌প্যালেসে উঠছে। চলো, আমরাও



জাংফ্রাউ পাহাড়ের উপর 'অবজার্ভেটরি' ও আবহাওয়া-অফিস

যাই।' আমার আর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কারণ, আমি ওখানেই ঠাণ্ডায় আইস্‌ক্রীম্‌ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। আবার তারও উপরের তলায় আইস্‌প্যালেসে যাওয়ার মত

সৎসাহস ছিল না। কিন্তু স্বামীর যাওয়ার আগ্রহ দেখে এগিয়ে চললাম। লিফ্‌টে উঠে উপরে একটি বরফের সুড়ঙ্গে এক ফ্রাঙ্ক ক'রে দিয়ে প্রবেশ করা হ'ল। স্কেটিং করার জন্য সেখানে সবাই জুতো ভাড়া নিচ্ছে। কিন্তু আমি একটুখানি এগিয়ে গিয়েই বুকে ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো আমার যেন নিশ্বাস আট্‌কে আসছে। বললাম, "আমি পারবো না যেতে, বড় কষ্ট হচ্ছে।" স্বামী আমাকে নিয়ে আবার লিফ্‌ট্‌ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ওঁরা সবাই চ'লে গেলেন, আমি লিফ্‌টে ক'রে আবার সেই হিটারে গরম-করা কাচের ঘরে ফিরে এসে বাঁচলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ওঁরা সকলে নেমে এলেন নিচে। স্বামী বললেন,—



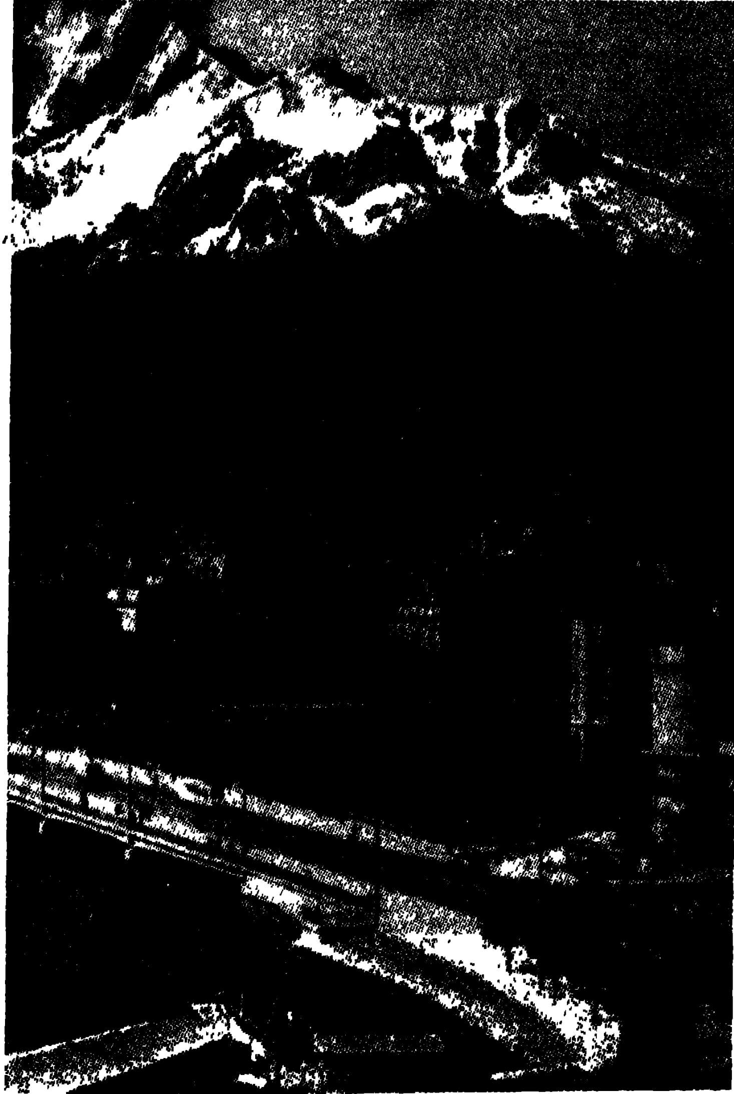
জাংফ্রাউ পাহাড়ের উপর 'আইস প্যালেস্‌'

সেই বরফের সুড়ঙ্গটির মধ্যে মিনিট দুই তিন হাঁটার পর একটি বরফের ঘরে পৌঁছে দেখা গেল সেখানে সকলে স্কেটিং করছে ;

সেখানে একটা বরফে তৈরি মোটরকার আছে। বরফের টেবিল চেয়ার, বরফের ফুলদান, বরফের ল্যাম্প্ — তাতে বাতি জ্বলছে। বরফের পিয়ানো ইত্যাদি, সবই বরফের আসবাব সেখানে। বরফের 'বল' নিয়ে খেলা করছে বালক-বালিকারা। বরফের উপর 'স্কী' করছে প্রমোদপিপাসু তরুণ-তরুণীরা। স্কেটিং-বুট প'রে দলে দলে নৃত্যও চলেছে সেই বরফের 'তুষার-হলে'। এখানে কুকুরে-টানা গাড়ি বরফের উপর দিয়ে মানুষ ও মাল বহন ক'রে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে আবার ঘোড়দৌড়ের মত 'রেস' হয়। যাই হোক্, আমার আর সাহস নেই দেখতে যাবার! হৈ হৈ ক'রে বেলা ২টা পর্যন্ত কাটিয়ে আমরা গেটের বাইরে এসে ট্রেনে উঠতে আরম্ভ করলাম একে একে। ঠিক সওয়া দু'টার সময় ট্রেন ছাড়লো। পথে আগের মত তিনবার গাড়ি বদল ক'রে ৫টা ৫৮ মিনিটে অর্থাৎ, প্রায় ছ'টায় আমরা ইণ্টারল্যাকানে পৌঁছে গেলাম। ৭টা ৫ মিনিটে লুসার্ন যাবার ট্রেন রয়েছে দেখে ছুটতে ছুটতে হোটেলে গিয়ে নিজেদের সামান্য যা জিনিসপত্র ছিল সব নিয়ে স্টেশনে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল। চা খাওয়া হ'ল না। এমন দেশ, এখানে স্টেশনে কোনও খাবার, চা বা ফলমূল কিছুই পাওয়া যায় না। ইতালীতে সব জায়গায় স্টেশনে বই, পুতুল, ফলমূল প্রভৃতি বিক্রি হতে দেখেছি। লুসার্নের ট্রেন ছাড়লো ঠিক ৭টা ৫ মিনিটে। লুসার্ন (Lucerne) স্টেশনে এসে পৌঁছলাম ৮টা ৫০ মিনিটে। এত জায়গায় রেলপথে ভ্রমণ করেছি কিন্তু কোনওখানে ট্রেন স্টার্ট এবং পৌঁছানর নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিটও নড়চড় হয় না। আসার সময় পথে কয়েকটি আমেরিকান সাহেব মেমের সঙ্গে

আলাপ হয়েছিল। তাঁরা আমাদের দেশ সম্বন্ধে কত কি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিচ্ছিলেন এবং খুব আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষের বিষয়ে বিবিধ সংবাদ শুনছিলেন।

আমরা কালকের দিনটা লুসার্নে থেকে সব দেখে নেবো। পরশু বিকেলের ট্রেনে জুরিখ চ'লে যাব, স্থির আছে। এক দিন



লুসার্ন

ক'রে এক-এক জায়গায় রাত কাটানো। ঘরের ভাড়া অনেক নিচ্ছে। আমার স্বামী আবার ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম

ছাড়া নেবেন না। তাঁর অসুবিধা হয়। সাধারণ-স্নানকক্ষ ব্যবহার করলে ঘরের ভাড়া প্রায় আট দশ ফ্রাঙ্ক কম হয়। কিন্তু সকালে উঠে বাথরুমে গাঢ় প্রবেশাৎ প্রাতঃকৃত্যে তাঁর সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। সেজন্য নিজস্ব স্নানকক্ষ ও শৌচাগার ছাড়া তাঁর কোনও ঘরই পছন্দ হয় না।

লুসার্নে দেখার বিষয় কিছু নির্দিষ্ট নেই। লেক-পাহাড় প্রভৃতি দৃশ্য উপভোগ এবং শহর দেখা।

আমি এখানে এসে পর্যন্ত কাঁধে এবং মাথার কাপড়ে সব সময়ে পিন্ আট্‌কে রাখি। তাতে কাপড় বেশ আঁটসাট থাকে। অনবরত নামা-ওঠা দৌড়ঝাঁপ তো চলেছেই। তা ছাড়া এরা আমার সাজ খুব পছন্দ করে ও চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। দেশে যা' কখনো করি না এখানে সেই টিপ প'রে বেড়াই। যদি দরকারে লাগে ভেবে পুরানো কতকগুলো সেলুলয়েডের টিপ এনেছিলাম। তাই দেখে এরা খুব মুগ্ধ। অনেকেই বলছে, 'ইণ্ডিয়ান্ মেয়েদের সাজটি বড় সুন্দর।' এখানে এসে রীতিমত বউ সেজে বেড়াচ্ছি। সর্বদা মাথায় ঘোমটা, কপালে টিপ, যা কলকাতায় কখনও করি না। আমাদের সম্বন্ধে খুব বেশি না জানলেও এদের খুবই ভাল ধারণা আছে বোঝা যায়। এ'ছাড়া, আমার স্বামী ওদের কাছে ভারতীয়দের তুলনা নেই ব'লে খুবই লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেন সব সময়ে।

এদেরও বহু গুণ আছে; কিন্তু কতকগুলো আমাদের চোখে খুবই খারাপ লাগে। প্রথম—পানাসক্তি। দ্বিতীয়—নরনারীর অবাধ মেলামেশা এবং নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অবশ্য আমাদের চোখে বা মাপকাঠিতে। তৃতীয়— সাজসজ্জার বাহুল্য। গুণের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয়,— সততা, শ্রমদক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা,

সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি। সুরাপান এদের অন্নজলের মতো জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনেরই অনুরূপভাবে প্রচলিত। খাওয়ার টেবিলে ব'সে প্রথমে পান-ব্যবস্থার তালিকাটি দেখে কোন্ পানীয়টি পান করবে পছন্দ ক'রে নিয়ে তারপরে খাদ্য-তালিকার প্রতি মনোযোগ দেবে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে এবং নৈশভোজনের সময় এরা সুরাপান করেই, বৈকালিক চা-পানের সময়েও অনেককে পান করতে দেখেছি। ঠাণ্ডা দেশ, সেজন্য সামান্য একটু-আধটু সুরাপান বোধ হয় এদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এরা যখন পান করে দেখি, সামান্য একটু-আধটু নয় — একেবারে বোতল। অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়েদের অবাধ মিশ্রণ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবেই সমাজে চলেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নগরের বাইরে গিয়ে বা খোলাপার্কে বা অন্য কোথাও নিজেদের যেমন খুশী তেমনিভাবে স্ফূর্তি করছে। অতি বৃদ্ধা নারী, জরায় স্থবিরা হয়ে এসেছেন, তাঁরাও অতি নিপুণভাবে সাজসজ্জা ক'রে, নিখুঁতভাবে রং মেখে, টাইট্-বডিস্ প'রে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে চলেছেন। সাজসজ্জা করাটা এদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

দেশের কথা মনে পড়ে। ছেলেমেয়েরা কি করছে জানি না। বড় মন-খারাপ লাগে মাঝে মাঝে। ইণ্টারল্যাকানের হোটেলে একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়ে ছিল, নাম তার হেলেন্। তার মা ভিয়েনার মেয়ে, শিশুকে আত্মীয়ার কাছে রেখে কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন। বয়স তার ঠিক আমার সবছোটো মেয়েটির সমান। তাকে নিয়ে আমি খুব আদর করছিলাম, আর আমার খুকুর জন্য তখন বড় মন-কেমন করছিল।

শনিবার, ২৮ মে ১৯৪৯। লুসার্ন॥

আজ আমরা সাড়ে দশটার সময় বেরিয়ে ট্রামে ক'রে প্রথমে গেলাম Panoromaতে। প্রবেশ করার টিকিট ছ'জনের তিন ফ্রাঙ্ক। ফটক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অবাক হয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড ছাদের মত, তাতে কি ক'রে গোলাকৃতি সব শেড্ করেছে। সেই ছাদ ঘিরে বিরাট সব ছবিতে আগাগোড়া সুইস্-ইতিহাস অঙ্কিত। একজন গাইড ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ছবিগুলি সব প্রমাণ আকারের এবং দূর থেকে এমনভাবে তাদের উপরে আলোকসম্পাতের সুব্যবস্থা করা আছে, যার ফলে ছবিগুলি দর্শকদের চোখে জীবন্ত ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে। ফরাসীরা সুইস্‌দের কেমনভাবে এসে আক্রমণ করেছিল এবং পরে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, ইত্যাদি নানা ঘটনা। অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখবার মত। ২৪,০০০ ফীট্ ক্যান্‌ভাসের উপর সমগ্র ইতিহাস অঙ্কিত।

ওখান থেকে বেরিয়ে মিউজিয়মে গেলাম। নানান জীবজন্তু, অদ্ভুত অদ্ভুত পাখি, ছেলেমেয়েরা দেখলে খুবই খুশী হ'ত। তারপরে গাইড মাটির নিচে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেটা গোলকধাঁধার মত এবং আগাগোড়া আয়নার দেওয়াল। অনেকটা আগ্রার শীশ্‌মহলের ধরনের। আমাকে নিয়ে বাগানের মত আঁকা বেদীর উপরে বসালে। চারিদিকে হাজার হাজার আমার মূর্তি দেখা যেতে লাগলো। আরও ছ'টি মেম ছিল, সবাই হেসে লুটোপুটি। আমি ভাবলুম আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিন্নু অভু খুকু এটার মধ্যে এলে আর বেরুতেই চাইতো না। আমরা অবিশ্রাম হাসছি এমন সময়ে গাইড দূরে গিয়ে আমাকে ডাকছে। আমি যেই যেতে গেলাম

আয়নায় মাথা ঠুকে গেল। আয়নার মধ্য দিয়ে কোন্‌টা সত্যিকারের পথ, কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। ভারী মজা হচ্ছিলো। ঐ সব দেখে প্রায় সাড়ে বারোটার পর হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে আমি বললাম — 'ছু'টি ঘণ্টা বিশ্রাম না ক'রে আমি আর বেরোবো না।' স্বামী আবার বেরিয়ে গেলেন শহর ঘুরতে। বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই ভদ্রলোকের। আমি ঘুমিয়েছিলাম ঘণ্টাখানেক। বিকালে আবার স্বামীর সঙ্গে বেরুলাম। এবেলা দেখতে গেলাম Lion Monument. পুরানো আমলের রাজাদের ব্যাপার। কোন্‌ ঘরে তারা বসতো, খেতো ইত্যাদি। তবে গ্লোরিয়াস্‌ ব'লে যেটা দেখালে, সেটা সত্যিই অদ্ভুত। হাজার হাজার বৎসর ধ'রে তীব্রবেগে ঝর্ণার জল এসে কিরকম ভাবে পাথরে গর্ত ক'রে চলেছে ও সুন্দরভাবে তার গঠন হয়েছে সেটা দেখার মত। ঐটা দেখে আমরা একটা টি-রুমে গিয়ে চা খেলাম। কন্টিনেণ্টে এসে পর্যন্ত চা পেয়েছি সর্বত্রই। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে দেয় এরা। যেমন আজ কাচের গ্লাসে কাগজের প্যাকেট্‌ ক'রে চা (এক পেয়ালার আন্দাজ মত) সুতোবাঁধাশুদ্ধ গরম জলে ডোবানো অবস্থায় দিয়ে গেল। দুধ চিনি আলাদা দিয়েছিল। চায়ের বর্ণ ইচ্ছামত গাঢ় হতে সুতো ধরে প্যাকেট্‌টি তুলে বাইরে রেখে দুধ ও চিনি মিশিয়ে নিয়ে খেলাম। চা খেয়ে ঘুরে ঘুরে দোকান দেখলাম। সুন্দর কাঠের কারুকার্য এখানে। দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। আমি ত্রিশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে একটি 'মিউজিক্‌-বক্স্‌' কিনে ও কিছু কেক চকোলেট কিনে লেকের ধারে গেলাম একটু বসতে।

এখানেও আমাকে দেখে লোকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে —

তোমরা কোথা থেকে আসছো ? কেউ কেউ সঙ্গীসাথীদের ডেকে দ্রষ্টব্যবস্তুর মত আমাদের দেখায়। জেনিভা বড় শহর। সেখানে ভারতীয়দের যাতায়াত থাকায় সেখানকার লোকে আশ্চর্য হয় না। কিন্তু এই সব ছোট জায়গায় বোধ হয় ভারতীয় মেয়েরা আসে খুব কমই, তাই লোকে শাড়িপরা মেয়ে দেখে এমন অবাক হয়ে তাকায়।

রবিবার, ২৯ মে ১৯৪৯। জুরিখ॥

আজ আমরা জুরিখে এসেছি বেলা দু'টোয়। আজ রবিবার থাকায় দলে দলে পুরুষ নারী মোটর লঞ্চ, নৌকা ও আর-একরকম ছোট মোটরবোট — দুজন মানুষ বসার মত, সেটা প্যাড্‌ল্‌ ক'রে চালাতে হয়, — সেই সমস্ত নিয়ে সকলে মিলে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'লিডো' নামে একটি জায়গায় সকলে সমুদ্র-স্নান (Sea-Bath) করছে মেয়ে-পুরুষে মিলে। তারা আবার নিজেরাই নৌকা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরুষরা শুধু খাটো জাঙ্গিয়া-পরা ; মেয়েদেরও ঐ রকম খাটো জাঙ্গিয়া ও বুকটুকু মাত্র সরু বডিসে ঢাকা, ব্যস্‌। আর কোনও আব্রুর বালাই নেই কারুর। খুব গান করছে, হল্লা করছে। আমাদের চোখে ভাল লাগে না এ-সব।

আমরা লুসার্নে আজ সকালে একটি মোটর লঞ্চ ভাড়া ক'রে লেকে বেড়িয়েছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল তখন। অনেকদূর নিয়ে গিয়েছিল, তিনটি গ্রাম ঘুরিয়ে আবার লুসার্নে ফিরিয়ে আনলে বেলা সাড়ে এগারটায়। হোটেলে এসে ছোট ব্যাগে জিনিসপত্র ভ'রে বেলা বারোটায় লাঞ্চ খেতে গেলাম। নিচে নেমে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার ! অনেক সুইস্‌-খেলোয়াড়

এসেছেন, তাঁদের পরিবেশন করতে অল্প কয়েকজন পরিবেশন-কারিণী হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে। আজ সুইজারল্যাণ্ড বনাম



জুরিখ

ইংলণ্ডের ফুটবল খেলা আছে। গত রাত্রি থেকেই এদের হোটেলে বেজায় ভিড়। আজ সকালে খেলোয়াড়রা ও

সেক্রেটারি প্রভৃতি সকলে এসেছে। একই রকমের ইউনিফর্ম-পরা অল্পবয়সী ছেলেগুলিকে দেখে খুব ভাল লাগছিল।

জেনিভাতে যাও-বা ইংরাজী কথা লোকে বুঝতে পারতো, এ-সব জায়গার লোকেরা আদৌ ইংরাজী বোঝে না। এরা ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয়ান ভাষায় কথা বলে। হোটেলের ম্যানেজার ও বাট্‌লার সামান্য ইংরাজী বোঝে, সুতরাং যা-কিছু বক্তব্য এবং জ্ঞাতব্য তার জন্য এদের দু'জনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আমার স্বামী দুষ্টামি ক'রে খুব প্রশান্ত অমায়িক মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে ওদের 'রূপী বাঁদর' 'জাম্বুবান' 'লালমুখো হনুমান' ইত্যাদি বলছেন আর ওরা মহাআপ্যায়িত হয়ে খুশীর হাসি হাসছে। ভাবছে, বিদেশী ভদ্রলোক না-জানি কতই মধুর আপ্যায়ন করছেন বা! সেদিন মন্ত্রোয় একটি মজার ব্যাপার হয়েছিল এই ভাষাবিভ্রাট নিয়ে। হোটেলের ম্যানেজার-ভদ্রলোক অতিকষ্টে বহু চেষ্টায় সামান্য ইংরাজী কথা বলছিলেন। তাঁকে আমার স্বামী নানা আয়াসে কোনও মতেই বোঝাতে পারছেন না আমরা বীফ্ হ্যাম্ বিয়ার — এ-সমস্ত কিছুই খাই না। আমাদের শূকরমাংস এবং গোমাংস না দিয়ে মুর্গীর মাংস বা ভেড়ার মাংস দিলে আমরা খেতে পারি। অতিকষ্টে ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন আমরা মুর্গীর মাংস চাই, কিন্তু ভেড়ার মাংস আর কিছুতেই বোঝানো যায় না। ভাবপ্রকাশের ইঙ্গিত নিয়ে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শেষে ম্যানেজার ব'লে উঠলেন — 'ওহো বুঝেছি, ভ্যা ভ্যা ক'রে ডাকে, সেই জন্তুর কথা বলছ কি?' উনিও তাড়াতাড়ি বলেন — 'হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই তাই।' দুই ভাষাবিদের ভ্যা-ভ্যা আর হ্যাঁ-হ্যাঁ ক'রে উৎসাহে খুশী হয়ে ওঠা দেখে এদিকে আমার

তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার উপক্রম। এইভাবে এঁদের সঙ্গে বাত-চিত্ চালানো হচ্ছে আমাদের।

জুরিখে সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল — এখানে দেখার কিছুই নেই, এটা একটি ব্যবসায়-কেন্দ্র। তবু যা' আছে দেখার জন্য ট্রামে উঠে বেল্‌ভিউতে গেলাম। লেকের ধারে সুন্দর ফুলবাগান। সব জায়গাতেই তো এখানে এই লেক এবং ফুলবাগান। এ আর কি দেখবো! এক ভদ্রলোক ব'লে দিলেন, 'ফ্লুয়েণ্ট্ যাও, ভালো লাগবে।' আমরা ট্রামে ক'রে সেখানে গেলাম। জায়গাটি পাহাড়ের উপরে। পর্বতশিখরে ভূমি সমতল ক'রে নিয়ে তার উপরে সুন্দর উদ্যান রচনা করেছে। সেখানে ব'সে সমস্ত শহরের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। উপরে ওঠবার জন্য মিনিট তিন-চার হাঁটতে হয়।

জুরিখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি আর শহর, সর্বদাই সরগরম ভাব। আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। কালই দুপুরের ট্রেনে আমরা বার্ন রওনা হ'য়ে যাব ভাবছি।

সোমবার, ৩০ মে ১৯৪৯। জেনিভা ॥

আজ সন্ধ্যায় জেনিভা এসে পৌঁছেছি। জুরিখ থেকে বার্ন শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা ঘুরে আবার বিকেলের গাড়ি ধ'রে জেনিভা এসে পৌঁছলাম। বার্ন বেশ বড় শহর। ওখানে গভর্নমেণ্ট হাউস ও মনুমেণ্ট দেখে এবং কিছুক্ষণ শহর ঘুরেই আমরা জেনিভার জন্য ট্রেন ধরেছি। স্বামী বলছিলেন, আজ রাত্রিটা বার্নে থেকে কাল জেনিভা আসতে। কিন্তু, আমার আর মোটেই ভাল লাগছিল না, তাই আজই চ'লে এলাম। এখানে এসে ছেলেমেয়েদের এবং

শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের অনেক চিঠিপত্র একসঙ্গে পেলাম। ছেলেমেয়েরা তাদের ফোটো তুলে পাঠিয়েছে। চিঠিগুলি পেয়ে আমার তো বেজায় স্ফূর্তি তখন।

আজ রাত্রে এত বৃষ্টি সুরু হয়েছে যে আমরা ডিনার খেতে বাইরে বেরুতে পারলাম না। হোটেলেই চা রুটি ডিম জেলি







জেনিভা (রাত্রে)

আনিয়ে ঘরেই তৃপ্তি ক'রে খেলাম। খুব ঠাণ্ডা প'ড়ে গেছে ব'লে চা-টিও বেশ আরামপ্রদ মনে হ'ল। আমরা যে এই ক'দিন টো-টো ক'রে ঘুরেছি, ভগবানের কৃপায় একটুও বৃষ্টি পাইনি, তাই অসুবিধায় পড়িনি। দু'দিন এখানে বিশ্রাম নেবো। তারপর প্যারিসে নেমেই ঘুরতে হবে শুক্রবার থেকে।

প্যারিসে

শুক্রবার, ৩ জুন ১৯৪৯। হোটেল 'রয়্যাল মঁস্যু'॥

আজ বেলা প্রায় একটা চল্লিশ মিনিটে আমরা যখন প্যারিসের বিমানগ্রহে নামলাম তখন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি ঝরছিল। পাস্‌পোর্ট্, কাস্টম্‌স্ প্রভৃতির বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে আমরা T. W. A.র বাসে এসে অধিষ্ঠিত হ'লাম। বিমানযাত্রীবাহী বাস্ ছুটে চললো আপন গন্তব্য অফিস অভিমুখে। প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে গেল পৌঁছুতে। বাস্‌টি এসে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। যাত্রীদের সঙ্গে আমরা নেমে সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম উপরে T. W. A.র মস্ত বড় অফিসে। সেখানে গিয়ে যাত্রীরা যে-যার মালপত্র বেছে নিতে লাগলেন। আমরা কি করবো ইতস্ততঃ করছি, এমন সময়ে একটি কিশোরবয়স্ক ভারতীয় এগিয়ে এসে আমার স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, — "আপনিই কি বিভূতিভূষণ ঘোষ?"

ইনি সাগ্রহে জবাব দিলেন, — "হ্যাঁ। আপনিই কি আমাদের নিতে এসেছেন?"

ছেলেটি বললেন, — "আমার নাম সমীর গাঙ্গুলী। আমি আপনাদের নিতে এসেছি।"

আমরা জেনিভা থেকে খবর দিয়েছিলাম সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোককে। ভারতবর্ষ থেকে তাঁর শ্বশুরও তাঁকে আমাদের প্যারিসে আসার বিষয় জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন — বিদেশে যেন স্বজাতীয় হিসাবে আমাদের একটু দেখাশোনা ও সাহায্য করেন। সেনগুপ্ত মহাশয়ের জন্যই আমরা প্রত্যাশা ক'রে ছিলাম।

সমীর গাঙ্গুলী বললেন, — "আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলুন, আপনাদের 'হোটেল মঁস্যূ'তে পৌঁছে দিয়ে যাবো।"

ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ মানুষ আমরা, ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ একজন বাঙালিকে এই সময় পেয়ে খুবই স্বস্তিবোধ করলাম।

যাঁকে আমরা চিঠি লিখে এবং আগে হ'তে খবর পাঠিয়ে এসেছিলাম তিনি আমাদের নিতে আসেন নি অথবা কোনও লোকও পাঠান নি, এঁরা আমার স্বামীর বন্ধু সুধীর চ্যাটার্জ্জির ছোটভাই গোপালের শ্বশুর-পরিবারের লোক, আমার স্বামীর বন্ধুর চিঠিতে আমাদের প্যারিসে আসার খবর পেয়ে বিমান-গ্রহে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। একেই বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

মোটরে উঠতে গিয়ে দেখি গাড়ির মধ্যে একটি ছোট ছেলে এবং একটি ছোট্ট মেয়ে ব'সে রয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি আমার দেশে-রেখে-আসা মেয়েটিরই সমবয়সী হবে। আমি মেয়েটিকে কোলে টেনে নিয়ে আদর ক'রে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটি বললে — "আমার নাম জয়শ্রী।"

আমার স্বামী গাড়িতে উঠে ব'সে বললেন, — "মিস্টার ব্যানার্জ্জী আমাদের নিতে গাড়ি পাঠিয়েছেন এবং লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি তো ওঁকে কোনও সংবাদই দিই নি। সম্ভবতঃ গোপাল সংবাদ দিয়ে থাকবে।"

হোটেল মঁস্যূতে পৌঁছে দেখলাম সেটি প্রকাণ্ড হোটেল। আমি সমীরবাবুর কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ নিলাম। মিস্টার বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী (যিনি আমাদের নিতে পাঠিয়েছেন) এখানে মাত্র মাস দেড়েক হ'ল সপরিবারে এসে রয়েছেন কর্ম

উপলক্ষ্যে। ভারত গভর্নমেণ্টের তরফে সমস্ত ইউরোপে তাঁর কার্যপরিধি এবং তিনি একজন উচ্চকর্মচারী। সমীর গাঙ্গুলী মিস্টার ব্যানার্জীর সম্বন্ধী। ইনি নিউইয়র্কে চোখের চিকিৎসার জন্য ছয় সাত মাস ছিলেন, মাসখানেক হ'ল প্যারিসে দিদির কাছে এসেছেন। তাঁর দিদি অর্থাৎ মিসেস্ ব্যানার্জী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন এখন। সেজন্য ওঁদের পরিবারে এখন বিশেষ অসুবিধা যাচ্ছে, ইত্যাদি। আমাদের ঘর ঠিক হওয়ার পর 'সন্ধ্যার সময় টেলিফোন করবো' ব'লে গাঙ্গুলী বিদায় নিলেন। আমরা কাপড়চোপড় বদ্‌লে চা খেয়ে পায়ে হেঁটে একটু বেড়াতে বেরুলাম। বিমানগ্রহ হ'তে শহরে আসার পথে প্যারিস যা' দেখেছি এবং হেঁটে বেড়িয়েও এখন যা' দেখে এলাম তাতে প্যারিস মোটেই ভালো লাগলো না আমার। চারিদিকে কেবল বিরাট পাথরের বাড়ি, তাও সব পুরানো ধরনের। পথে হেঁটে দেখে এলাম রাস্তা এক এক জায়গায় এতই ভাঙাচোরা যে আমাদের কলকাতা শহরও হার মানে। প্যারিস-এর ভুবনবিখ্যাতা সুন্দরীরাও এমন কিছুই মনে রেখাপাত করলো না।

ফিরে এসে একটু পরেই সেজেগুজে নিচে ডাইনিং-হলে খেতে গেলাম। হেড্ বাট্‌লার ইংরাজী জানায় সে এসে কথা ব'লে প্রয়োজনাদি জেনে নিলে। মোটামুটি যা' পাওয়া গেল নিলাম। উনি পাঁউরুটি এবং আমি ভাত খেলাম।

শনিবার, ৪ জুন ১৯৪৯। প্যারিস

সকালে উঠে দেখি খুব রোদ উঠেছে। বিছানায় শুয়ে খোলা-জানালাপথে চেয়ে চেয়ে দেখছি চারিদিকে কেবল

বিরাট বিরাট অট্টালিকা। যেন কলকাতা শহর। পার্থক্যের মধ্যে কলকাতার চেয়ে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্যারিসে হোটেল-চার্জ অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি। এখানে সাড়ে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক শুধুমাত্র ঘরভাড়াই। ব্রেক-ফাস্টের চার্জ আবার আলাদা। হোটেলটি প্রকাণ্ড বড়। অন্যান্য সব বড় বড় হোটেলে এ-পর্যন্ত যেমন থেকে আসছি সেই রকমই।

এখানকার হোটেলের লিফ্‌ট্‌ সুইজারল্যাণ্ডের মত স্বতঃক্রিয় (অটোমেটিক্‌) নয়, কলকাতার লিফ্‌টের মতই লিফ্‌ট্‌ম্যান দ্বারা চালিত হয়।

আজ বেলা একটার পর আমার স্বামী মিস্টার ব্যানার্জীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। ব্যানার্জী মানুষটি খুব ভদ্র ও ভালো লোক। বয়স বেশি নয়। অনেকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে ব'লে গেলেন "কাল আমি গাড়ি পাঠাবো, আপনারা আমার বাড়ি যাবেন এবং গাড়ি নিয়ে খানিকটা প্যারিস ঘুরে বেড়িয়েও আসবেন।" আমি বললাম, — "মিসেস্‌ ব্যানার্জীকে হাসপাতালে একবার দেখতে যাবো ভাবছিলাম, ভালই হ'ল, আপনার গাড়িতেই যাওয়া যাবে।"

আজ আমরা ঘরেই লাঞ্চ পৌঁছে দিতে ব'লে দিয়েছিলাম। রাইস্‌ এবং কারী দিয়ে গেল। কারী মন্দ রান্না করেনি, ভাত কিন্তু একেবারেই চাউল অবস্থাতে অপরিবর্তিত আছে, অন্নে রূপান্তরিত হয়নি। যাই হোক্‌ কোনওক্রমে এক চামচ ভাত মুখে ঠেকিয়ে রুটি ও ঝোল খেয়ে নেওয়া হ'ল। এখানকার রুটি আবার বেজায় শক্ত। দাঁত ভেঙে যাওয়ার উপক্রম আর কি! এদেশে দেখছি সব জায়গাতেই রুটি

এরা সকল সময়েই কাঁচা খায়। বিশেষ ক'রে টোস্ট্ ক'রে দেওয়ার অর্ডার দিলে তবেই চৌকা রুটি টোস্ট্ হয়ে আসে; নচেৎ সর্বত্রই দেখি নানান্ আকৃতির রুটি।

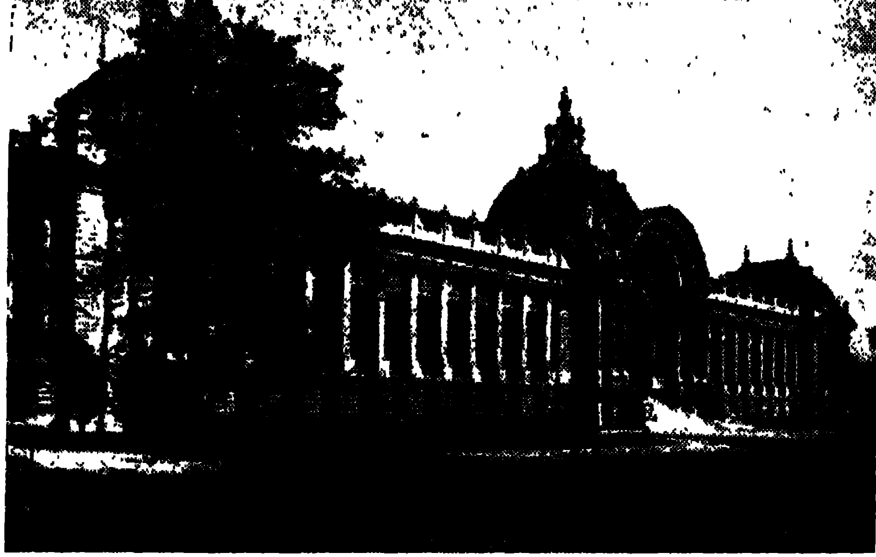
বেলা আড়াইটার সময়ে আমরা টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাসে উঠলাম। দেখতে দেখতে চললাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গের মত প্রাসাদশ্রেণী। রোমের চেয়েও পুরানো বাড়ি এবং প্রকাণ্ড আকৃতির মনে হ'ল। এখানে রাজপথগুলির দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষবীথি। এই বৃক্ষসারি কোনও কোনও পথে দুই তিন সারি ক'রেও সুসজ্জিত। কিছুদূর অন্তর এক-একটি



নোটর্‌ডাম চার্চ — প্যারিস

সুন্দর পার্ক মাঝে মাঝে অবস্থিত। দেখলে অনুমিত হয়, একসময়ে সত্যিই খুব সুন্দর ছিল এই শহর। এখন কিন্তু ভগ্নদশা। রাস্তাঘাট, পথে বসবার অসংখ্য আসন সমস্তই

ভাঙাচোরা, অযত্নরক্ষিত। টুরিস্ট্ কোম্পানীর গাইড দেখাতে দেখাতে চললো ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, ফ্রান্সের স্টেট্ ব্যাঙ্ক (এখানে সব সোনা আছে), জেনারেল পোস্টঅফিস, বড় বড় চার্চ, বাজার, ল্যুভর্ মিউজিয়ম, ইউনিভার্সিটি, হাইকোর্ট, পুলিশ



ল্যুভর্ মিউজিয়ম — প্যারিস

হেডকোয়ার্টার, লাক্সাম্বার্গ গার্ডেন্, সেনেট্, অব্জারভেটরি, প্যান্থিয়ন, নোটরডাম্ ক্যাথিড্রেল্ ইত্যাদি। আট জায়গায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দেখালো। মিউজিয়ম ঐটুকু সময়ের মধ্যে দেখা যায় না, আমরা অন্য একদিন নিজেরা সুবিধামত দেখবো।

রোমকরা যখন ফরাসীদের পরাজিত ক'রে প্যারিস দখল করেছিল তখনকার কয়েকটা অত্যন্ত পুরানো ভাঙা বাড়ি দেখালে আমাদের। প্যারিস মস্ত বড় শহর। এর একটা পুরানো অংশ আজ দেখা হ'ল, আধুনিক অংশটি অন্যদিন দেখতে যাওয়া হবে, টুরিস্ট্ কোম্পানীর সঙ্গে সময় নির্দিষ্ট করা আছে।

হোটেলে ফিরলাম ছ'টার পরে। চা খেয়ে নিয়ে আমি তো লম্বা হ'য়ে বিছানায় বিশ্রাম নিতে শুয়েছিলাম, স্বামী কিন্তু আবার বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোথায় পথ হারিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে তারপর হোটেলে ফিরে এসেছেন।

প্যারিসে সমস্ত রেলপথ ভূগর্ভে, মাটির নিচে। রাস্তার উপরে চলে শুধু বাস্, মোটর। সেজন্য এখানে এসে অবধি ট্রাম দেখতে পাইনি। এখানে আগে ট্রাম ছিল, এখন উঠে গেছে। ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড্ সর্বত্রই ভূগর্ভে প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু ট্রাম মাটির উপরেই চলে। এখানকার ভূগর্ভচারী ট্রেনকে 'মেট্রো' বলে। ঐ 'মেট্রো'তে চ'ড়ে প্যারিসের সর্বত্রই ঘোরা যায় ট্রামেরই মতন, ভাড়াও খুব অল্পই লাগে। আমরা মোটে বুঝিই না কোথা দিয়ে কোথা গিয়ে উঠতে হয়। দেখতে পাই রাস্তার মাঝে মাঝে লোহার রেলিং ঘেরা এবং তার মধ্য দিয়ে মাটির নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে, উপরে লেখা আছে Metro.

রবিবার, ৫ জুন ১৯৪৯। প্যারিস॥

আজ সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা ভালো। প্রাতরাশ সেরে বেলা দশটা নাগাদ দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশের উদ্দেশে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনে নিয়ে একটা বাসে উঠে পড়লাম। এখানকার যেটি সবচেয়ে সুবৃহৎ রাজপথ 'সাঁজে-লিজে' সেখানে বাসে চ'ড়ে আমাদের নামিয়ে দিলো অপেরার কাছে। রাস্তার পাশে চমৎকার সুসজ্জিত দোকান-শ্রেণী। আজ রবিবার ব'লে অধিকাংশ দোকানই বন্ধ। দোকানের বাইরে শো'-কেসে সাজানো জিনিসপত্র দেখে এবং

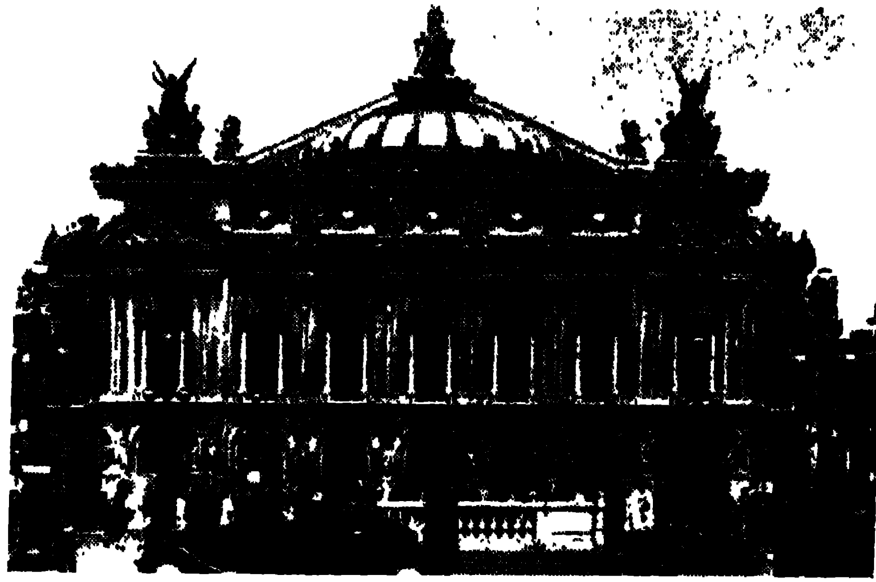
বিরাট অপেরাটি ঘুরে ঘুরে দেখে আবার বাসে চ'ড়ে ফেরা হ'ল 'আর্ক-ডি-ট্রায়াম্ফ্'-এর কাছে। ওখান থেকে আমাদের বাসস্থল 'রয়্যাল মঁস্যূ' হোটেল খুব কাছে, এক মিনিটের পথ।



সাঁজে-লিজে — প্যারিস

বিকেলের প্রোগ্রামে আজ আমরা বেরুলাম বেলা তিনটেয় মিস্টার ব্যানার্জীর পাঠানো তাঁর নিজের গাড়িতে। প্রথমে গিয়ে নামলাম তাঁর বাড়িতে। সেখান থেকে তাঁর শ্যালক ও শ্যালিকা সমীর এবং দুর্গা আর মিস্টার ব্যানার্জীর ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে আমরা ল্যুভর্ মিউজিয়মে প্রথমে গেলাম। কারণ ওটা পাঁচটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে মোনালিসাঁ, নেপোলিয়ঁর মুকুট, তরবারি, রত্নরাজি ইত্যাদি যেগুলি অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত সামগ্রী তা দেখা গেল। তারপর ঘুরে ঘুরে নানারকমের চিত্র এবং মর্মরমূর্তি দেখলাম। ল্যুভর্ থেকে বেরিয়ে আমরা পথে বোয়া-দে-বুলোঁ দেখলাম। এটি একটি

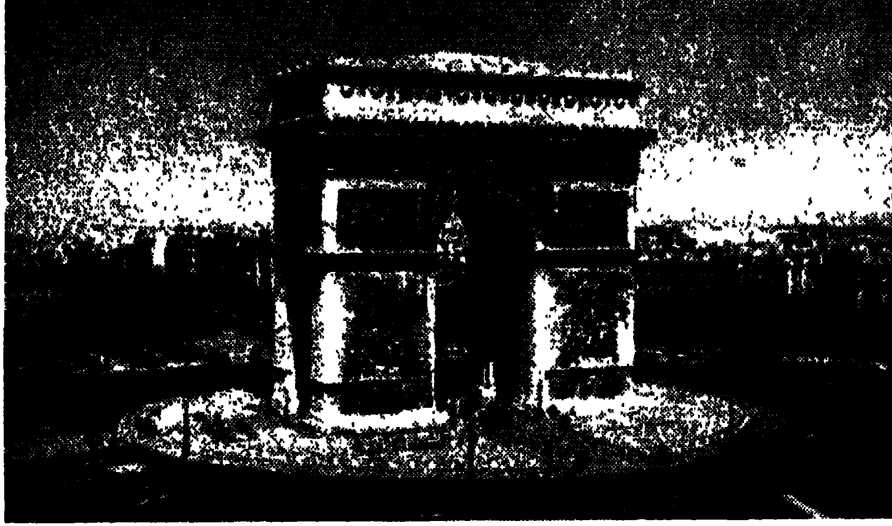
সাত মাইল সমচতুষ্কোণ অরণ্য। শহরের মাঝখানে গাছপালা হ্রদ ঝিল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি করেছে। এই জায়গাটি চমৎকার। মনে হয় যেন কোনও গ্রামে এসে পড়েছি। বোয়া-দে-বুলোঁর মধ্যে রেসকোর্স্ আছে, পোলো গ্রাউণ্ড আছে, মাঝে মাঝে রেস্টুরেণ্ট আছে, মাঝে মাঝে পথচারীদের বিশ্রামের জন্য বসার আসনের ব্যবস্থাও আছে। ওখান থেকে গেলাম



গ্র্যাণ্ড অপেরা — প্যারিস

হাসপাতালে অসুস্থা মিসেস্ ব্যানার্জীকে দেখতে। ভদ্রমহিলা এখনও খুবই অসুস্থ এবং দুর্বল রয়েছেন দেখলাম। তবে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন মনে হ'ল। মিস্টার ব্যানার্জীর ছেলেটি বেশ চট্পটে ও বুদ্ধিমান। এর মধ্যেই একটু একটু ফ্রেঞ্চ শিখেছে। নাম তাপস। তাপস গাড়ি থেকে নেমে লা-গ্লাসি এবং পাতিসারি কিনে আনলো। পাতিসারি একরকম কেক, ভিতরে ক্রীম্ দেওয়া, আর লা-গ্লাসি জিনিসটি বিস্কুটের ঠুঙ্গির মধ্যে ভ্যানিলার

আইস্‌ক্রীম্। সকলে মিলে বেশ খাওয়া গেল গাড়ির মধ্যে ব'সে।



আর্ক-ডি-ট্রায়াম্ফ্ — প্যারিস

মিসেস্ ব্যানার্জীকে দেখতে যে হাসপাতালে গেলাম, শুনলাম ঐ হাসপাতালেই আজ সকালে ভূপালের নবাবের গল্‌স্টোন্ অস্ত্রোপচার হয়েছে।

সোমবার, ৬ জুন ১৯৪৯। প্যারিস ॥

আজ বেলা দশটায় টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাসে প্যারিসের আধুনিক অংশ দেখতে বেরিয়েছিলাম। প্রথমেই দেখালো ম্যাদেলাইন চার্চ, তারপরে অ্যালিজ প্যালেস্, প্রেসিডেন্ট অব্ ফ্রান্স প্যালেস্, ট্রোকেডেরো গার্ডেন্ (এখানে বাস্ থেকে নামিয়ে দেখালো), নেপোলিয়ঁর সমাধি (এখানে নামা), নেপোলিয়ঁর ছেলের এবং ভাইয়ের সমাধি (নেমে দেখা), মিনিস্টার অব্ ফরেন্ অ্যাফেয়ার্স্ প্যালেস্, প্লেস্ ডি লা কংকর্ড, প্লেস্ ভেঁডোঁ, ইফেল্ টাওয়ার (নেমে দেখা), অপেরা হাউস্

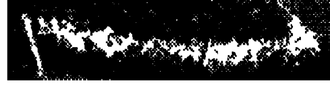
ইত্যাদি। প্রায় বেলা একটার পর আমাদের নামিয়ে দিলে। বেশবাস বদ্‌লে পরিচ্ছন্ন হয়ে লাঞ্চ সারতেই বেলা ছু'টো বেজে গেল। আমি কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। চারটে নাগাদ উঠে আবার সাজসজ্জা ক'রে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম পদব্রজে।









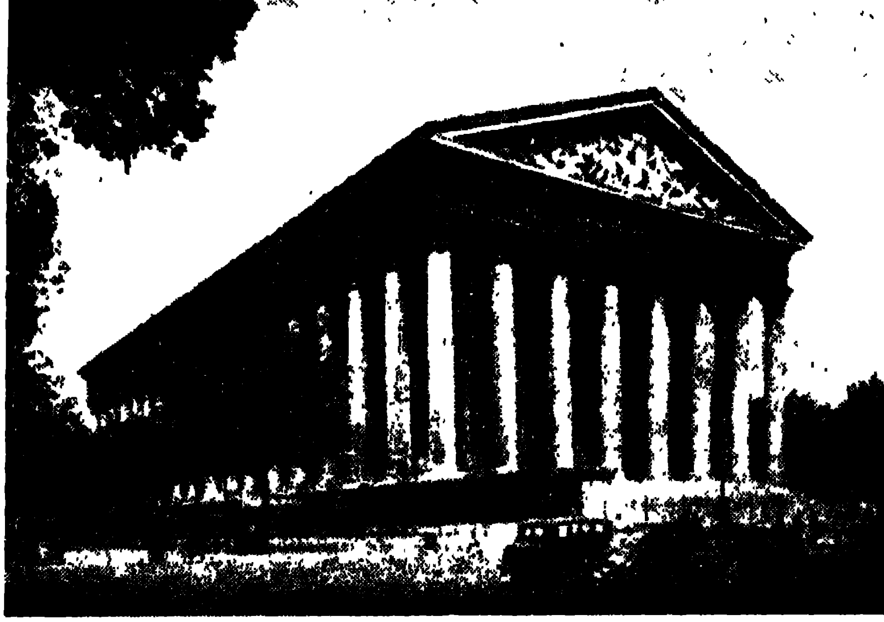




বোয়া-দে-বুলোঁ — প্যারিস

আজও দেখি রাস্তায় একটিও দোকান খোলা নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, আজ এদের কি-একটা পর্বদিন, সেইজন্য ছুটিতে সব-কিছু বন্ধ। আমাদের হোটেলের সামনের রাস্তাটির নাম অ্যাভেন্যু হঁস্। 'আর্ক-ডি-ট্রায়াম্ফ'এর মোড় থেকে মোট

বারোটি রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। এই সব রাস্তার প্রত্যেকটি বেশ প্রশস্ত। প্রত্যেক রাস্তার নামই অ্যাভেন্যু-সংযুক্ত। যথা, অ্যাভেন্যু ফো, অ্যাভেন্যু ট্রিটল্ ইত্যাদি। রাস্তাগুলি সার্থকনামা বটে, — কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন



ম্যাদেলাইন চার্চ — প্যারিস

নয়। প্রত্যেক রাস্তার বৃক্ষবীথিকা অতি চমৎকার। তবে রাস্তাগুলি মেরামতের অভাবে মাঝে মাঝে বড়ই দুরবস্থাপন্ন। এখানকার অফিস, বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি প্রায়ই ভূগর্ভে। আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি, রাস্তার পাশে হয়তো নিচের দিকে কোনও বাড়ির জানালা খোলা আছে, দেখা গেল সুন্দর সাজানো একখানি শোবার ঘর, কিংবা বসার ঘর, অথবা অনেক লোক মিলে অফিসের টেবিলে ব'সে একমনে টাইপ করছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি অ্যাভেন্যু ইঁস পার্কের

মধ্যে গিয়ে বসলাম। পার্কটি কৃত্রিম পাহাড়ে, ফোয়ারায় এবং প্রচুর মরশুমী ফুলে সাজানো। কিন্তু হ'লে কি হবে, সেখানে যেন রথ-দোলের মেলা ব'সে গেছে, এমনই ভিড়। অধিকাংশ স্থলেই বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে মা-বাপেরা সব এসে পার্কে বায়ুসেবন করছেন। শিশুরা খুব স্ফূর্তিতে খেলাধুলো করছে, আর কতো যে পেরাম্বুলেটার্ গাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাইকেল

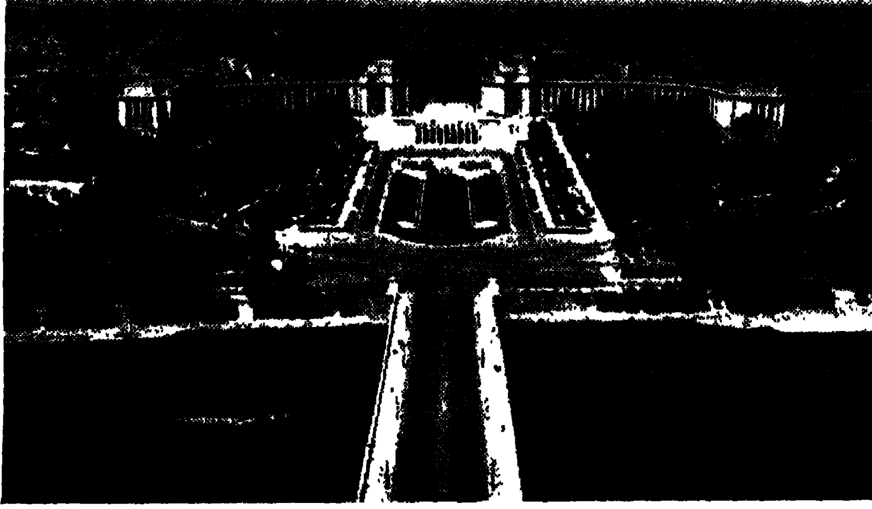


প্লেস্ ডি লা কংকর্দ — প্যারিস

জড়ো হয়েছে তার আর গোনাগুন্তি নেই। নিতান্ত কচি শিশু যারা, এখনও বসতে পারে না, তারা সবাই প্রামের মধ্যে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলছে বা ঘুমোচ্ছে আর মায়েরা পাশে ব'সে বুন্‌ছেন, সেলাই করছেন, বই পড়ছেন বা কারুর সঙ্গে গল্প করছেন। চারিদিকে এতই শিশুর মেলা, মনে হয়, যেন কোন বেবী-শো'তে এসেছি বুঝি-বা। এদেশের মানুষ ছুটির দিন

হ'লে কেউ ঘরে থাকে না, সারাদিন এখানে-ওখানে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় সবাই মিলে।

পার্কটি কম বড় নয়, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যেতে পা ব্যথা হ'য়ে গেল। শেষে রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে কোনও



ট্রোকেডেরো বাগান — প্যারিস

ভালো রেস্টুরেণ্ট আর পাওয়া যায় না। প্রায় ছ'টা বাজে দেখে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পড়া গেল। প্রথমে তো তারা কিছুতে কথাই বোঝে না, শেষে অনেক কষ্টে বুঝাবার পর চা এল বটে কিন্তু চাকা ক'রে লেবুর টুক্‌রো দিয়ে। সেটা ফেরৎ দিয়ে ব'লে-ক'য়ে দুধ-চায়ের ব্যবস্থা হ'ল। চার পেয়ালা চা ও দু'খানি কেকের দাম পড়লো চারশো ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ টাকার কাছাকাছি। এদেশে কথা কইলে, হাঁচলে, কাশ্‌লেও বোধ হয় ফ্রাঙ্ক বা'র ক'রে দিলে ভাল হয়। সাদা-সিধা নির্মল জলও ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনে খেতে হচ্ছে। কারণ, এখানকার কলের জল নাকি ভালো নয়, তাই অনেকেই

বোতলের পরিস্রুত জল খায় কিনে। আমরাও সেই প্লেন্ জল কিনে খাচ্ছি। ফরাসী-মদ এখানে খুবই সুলভ, যেদিকে তাকাও দেখতে পাবে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই মহানন্দে 'পান' করছেন। জলের মতই পানীয় এদেশের নানা বিচিত্র সুরা।

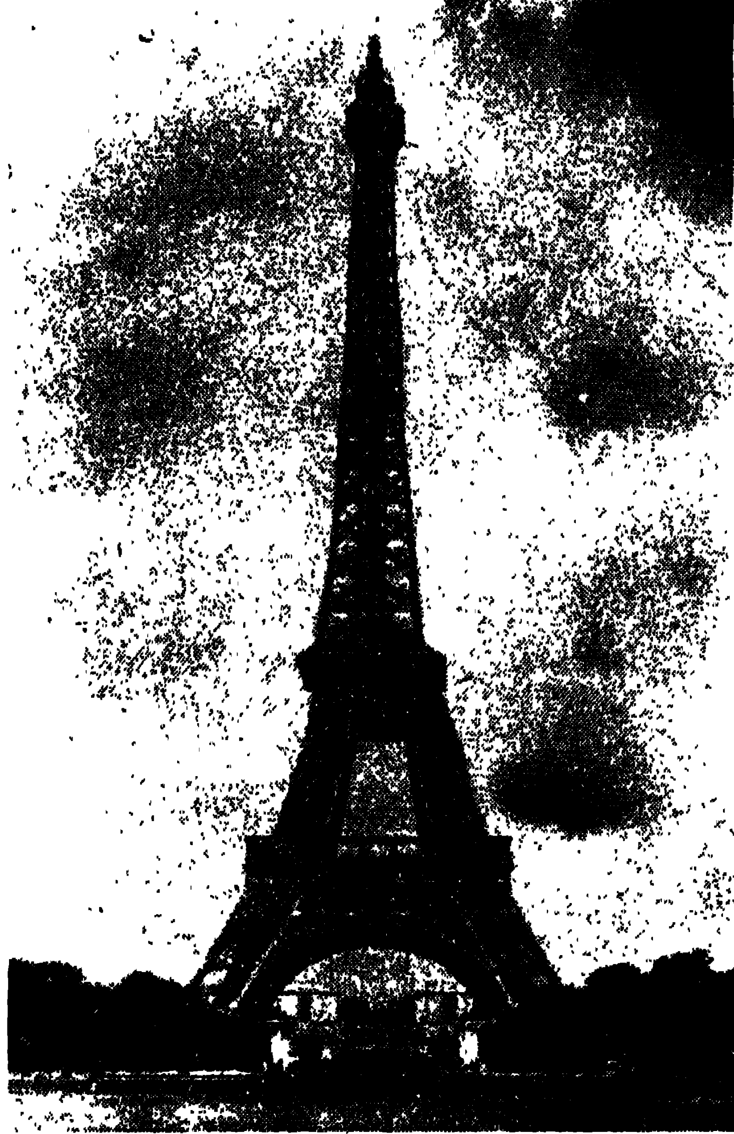


নেপোলিয়ঁর সমাধি — প্যারিস

চা পানের পর আমরা আরও কিছুক্ষণ বেড়িয়ে কাটালাম। হোটেলে ফিরলাম সাড়ে সাতটায়। সাড়ে আটটার সময় ডিনার খেয়ে আজকের দিনের পালা সাঙ্গ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লাম, অথচ এখানে ন'টার পরে সন্ধ্যা হবে। আমার স্বামী আজ ন'টার ট্রিপে টিকিট কেটে এখানকার নৈশ আমোদ-প্রমোদ দেখতে গেছেন, ফিরতে কত দেরি হবে জানি না। আমি যাইনি।

এখানেও ইটালীর মতই পুরুষরাই পরিবেশন-করা, ফাই-ফরমাস্ খাটা ইত্যাদি কাজ করে, স্ত্রীলোকেরা ঘরত্নয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ করে। সুইজারল্যাণ্ডের তুলনায়

এখানে শীত খুবই কম। একটি গরম ভেস্টের উপরে সিল্ক প'রে থাকলেই যথেষ্ট এদেশীয় মেয়েরা সব কটন্‌সিল্কের পোষাক পরে।



ইফেল্‌ টাওয়ার — প্যারিস

এদেশের মেয়ে-পুরুষ যে-যতক্ষণ নিজের কাজে রইল, ততক্ষণ সেই কাজের উপযোগী পরিচ্ছদ প'রে থাকে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই এক-একজন যত সাজা সম্ভব, ততখানি

নিখুঁত পারিপাট্যে সেজে নানা বিচিত্র পোষাক প'রে বেরিয়ে পড়লো। তখন কে মেড্, কে রাজকন্যা বা কে ওয়েটার্ আর কে লক্ষপতি চেনা দায়!



অ্যাভেন্যু ফো-তে লেখিকা

মঙ্গলবার, ৭ জুন ১৯৪৯। প্যারিস॥

কাল রাত্রে স্বামী নাইট্-ট্রিপ থেকে দু'টোয় ফেরার পরে আমি ঘুমিয়েছিলাম, তাই আজ উঠতে অনেক বেলা হয়েছে। স্বামীর মাথায় ঢুকেছে, এখানকার লেডিজ্-কোটের কাট্

সবচেয়ে ভালো, অতএব এখানে একটা কিনে ফেলতেই হবে। মিস্টার ব্যানার্জীও বলেছেন ইউরোপে যা'-কিছু ফ্যাসান সবেরই প্যারিস থেকে সূত্রপাত এবং 'যত বড় বড় লোক সকলেই নাকি প্যারিস-কাটার্‌কে ধন্য ধন্য করে। এর উপরে আর কথাই নেই! এখানে কোট্ না কিনে কি যাওয়া যায় কখনো?

বেলা এগারটা থেকে একটা পর্যন্ত পুরো দু'টি ঘণ্টা ঘোরা হ'ল তিন-চারটি দোকানে। এত রকম ডিজাইন ও সুন্দর সুন্দর রং আছে যে দেখেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। নাড়াচাড়া ক'রে ক'রে 'বাঁশবনে ডোম কানা' অবস্থা আর কি! শেষকালে বেলা একটা বেজে গেছে দেখে কিছু সুগন্ধিদ্রব্য কিনে বাড়ি ফেরা গেল। হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরেই আবার বেলা আড়াইটায় বেরিয়ে পড়েছি। স্বামীর ঝোঁক আজই কোট্ কিনে ফেলতে হবে। এবার মিস্টার ব্যানার্জী-নির্দেশিত এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'গ্যালারি লাফায়েৎ'এ যাওয়া হ'ল। কোথায় লাগে আমাদের কলকাতার 'হোয়াইট্‌ওয়ে' বা 'আর্মি-নেভি'। পাঁচতলা বাড়ি, বারোটা লিফ্‌ট রয়েছে, এক-একটি বিভাগে ঢুকছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। কী ভীষণ ভিড় নিচের তলায়! ব্যাপার কি? খবর নিয়ে জানা গেল নিচের তলায় কয়েকটি বিভাগে 'সেল' হচ্ছে। আমরাও প্রবেশ ক'রে একটি সিল্কের সেমিজ ও আণ্ডারওয়্যার্ কিনে অনেক জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে লিফ্‌টে উঠে উপরে লেডিজ্-গরমকোট্ বিভাগে গিয়ে পৌঁছলাম্। ওখানে গিয়েও পূর্ববৎ অবস্থা, ঘণ্টাদেড়েক ঘাঁটা-ঘাটির পর একটি হাল্‌কা সবুজ রংয়ের কোট্ সাড়ে সতেরো হাজার ফ্রাঙ্ক দাম দিয়ে কিনে নিচে নেমে এলাম। নিচে নেমে আমি তো দোকানের একটা দিক দিয়ে যাচ্ছি আর রকমারি

জিনিস দেখে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছি। কতো আর দেখে শেষ করা যায়! উনি বকে' বকে' আমাকে গ্যালারি লাফায়েৎ থেকে যখন বের করলেন, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আমরা বাস্-টার্মিনাসে এসে দাঁড়ালাম। বাস্ এল, কতক লোক তুলে নিলে, বাকি সব রইলো দাঁড়িয়ে। আমাদের তুলে নিলে না। ব্যাপার বোঝা গেল না। আমরা বিদেশী মানুষ দেখে একটি ছেলে এগিয়ে এসে লেটারবক্সের মত একটা বাক্সের হাতল ঘোরাতেই দুখানি টিকিট্ বেরিয়ে এল। তাতে শুধু নম্বর দেওয়া আছে। পরের বাস্‌টিতে টিকিটের নম্বর মিলিয়ে আমাদের তুলে নিলে। তার অর্থ বোঝা গেল, যাত্রীরা যে-যেমন আসবে, পরের পর নম্বর মিলিয়ে বাসে তুলে নেবে। প্রত্যেক বাসে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে এমনি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নেওয়া হবে, তার একটিও বেশি লোক তুলবে না। এই রকম বাস্-যাত্রীর সংখ্যাজ্ঞাপক টিকিট-ব্যবস্থার জন্য প্রতি বাস্-টার্মিনাসে লেটারবক্সের মত টিকিট-বক্সের ব্যবস্থা আছে।

এখানে ৯টা ১০ মিনিট হবার পর সন্ধ্যা হয়, কিন্তু আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই এদেশের নৈশভোজনের পালা চুকে যায়। ডিনারের পরে কেউ কেউ বেরুলেন নৈশভ্রমণে বা নাচে, পার্টিতে, অপেরায়, কেউ-বা ঘরেই শুয়ে পড়লেন। কাল রাত্রে স্বামী রাতের প্যারি দেখতে যাওয়ার জন্য আমায় অনেক বলেছিলেন। আমি কিছুতেই রাজি না হওয়ায় শেষটায় একরকম রাগ ক'রেই উনি একা বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন — নাইট্ ট্রিপে সমস্ত যাত্রী নিয়ে গিয়ে ওরা অনেকগুলি নাইট-ক্লাবে কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে দেখায়। বললেন, 'দু'জায়গা বেশ ভদ্রগোছের দেখলাম, আর এক জায়গায় একটু

বেশিরকম হল্লা হচ্ছে, সেটা গরিবদের বস্তি ব'লে মনে হয়।'

ইউরোপের মধ্যে প্যারিস বিলাসিতার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে পৌঁছেছে। যত পয়সাওয়ালা ধনীরা এখানেই আসে আমোদ করতে। সর্বত্র এত জুয়ার আড্ডা বারো মাস প্রকাশ্য-ভাবে আর কোথাও বোধহয় নেই।

বুধবার, ৮ জুন ১৯৮৯। প্যারিস॥

এ চার দিন মোটে বৃষ্টি হয়নি। আজ সকাল থেকে টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। আজ আর আমি এবেলা বেরুই নি। একে-বারে লাঞ্চ খেয়ে বেরুবো। উনি ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে গেছেন। এখানে দেখার ও বেড়ানোর অনেক-কিছু আছে কিন্তু এদের ভাষা না-জানার দরুন বড়ই মুস্কিল হয় এবং সেই জন্যই ভালো লাগছে না এখানে থাকতে। এদেশের গ্যালারি লাফায়েৎ ও অন্যান্য দোকান যা দেখছি তাই তো আমাদের পক্ষে বিস্ময়ের, আমেরিকায় গিয়ে কি দেখবো জানি না। সে তো শুনতে পাচ্ছি তাজ্জব ব্যাপারের দেশ। সমীরবাবু ছয় মাস আমেরিকায় ছিলেন, তিনি তো আমেরিকা আমেরিকা ক'রে পাগল। তিনি বলেন, 'এসব দেশে দেখার কিছুই নেই। প্যারিস থেকে লণ্ডনে গিয়ে যেমন মনে হবে সেখানে বিশেষ কিছুই নেই, তেমনি আমেরিকা দেখার পরে কোনও জায়গাই আর আপনাদের ভালো লাগবে না। এমন দেশ, যা' খুঁজবেন তাই পাবেন।'

বেলা একটায় লাঞ্চের পর বেরুলাম দু'জনে কিছু পারফিউম্ কিনতে। আমেরিকান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানীর অফিসে চিঠি-

পত্রের খোঁজ ক'রে গ্যালারি লাফায়েৎএ প্রবেশ করলাম। প্রসাধন-বিভাগে গিয়ে কী যে দেখবো এবং কী যে নেবো ভেবে পাই না। অনেক কষ্টে কিছু সেণ্ট্ কিনলাম পছন্দ ক'রে। দাম বললে যখন, দেখা গেল ছয় হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই ফ্রাঙ্ক। ওখান থেকে বেরিয়ে আর একটা মেক্-আপ্এর বিভাগে ঢুকলাম। সেখানে যতরকম কৃত্রিম সাজসজ্জার ব্যবস্থা রয়েছে। মাথার চুল কত রকম রং দিয়ে নিজের ইচ্ছামত রং ক'রে নেওয়া যায়, ভ্রূ এবং চোখ কতভাবে বদলানো যায়, নানারকমের ভ্রূ-রোম, চোখের পল্লব বা পক্ষ্মরাজি রয়েছে। আমি এসব বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে অল্পস্বল্প ইংরাজীতে আমাকে সব বুঝিয়ে দিলো।

বাজার ক'রে বাসে চ'ড়ে হোটেলে ফিরলাম প্রায় ছ'টায়। আজ সন্ধ্যা আটটার শো'তে 'ফলিজ্ বার্জে' যাবো। এখানকার অপেরা নাকি দেখার মতন ব্যাপার শুনেছি। ডিনার দিলে সাড়ে সাতটার পরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি ধ'রে ওখানে যখন পৌঁছলাম আমরা, তখন ৮টা ১৫ মিনিট হয়েছে। প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ি, থিয়েটারের মত সাজানো। আমরা উপরের ফ্রণ্ট্ সীটে বসলাম। গিয়ে দেখি আরম্ভ হয়েছে নাচগান। সাজসজ্জার চাকচিক্য দেখে চোখ ঝল্সে যায়। যখন নট-নটীরা ভেল্ভেটের পোষাক প'রে আসছে, আগাগোড়া পঞ্চাশ জনই নানা রকমের রং ও কারুকার্যের একই রকম প'রে আসছে। কখনও সাটিনের উপর সল্মার কাজ-করা পোষাক, সকলেই তাই পরেছে। কখনও-বা কাঁচের পরিচ্ছদ সকলেই পরেছে। বিষয়টা যা বোঝা গেল, এটা একবার নাচগান, আবার একবার-বা একটা কমিক্, কখনও-বা ছোটখাটো নক্সা,

এই রকম হ'তে থাকলো। স্টেজ-সাজানো এত সুন্দর যে আমরা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। একটার পর একটা দৃশ্য আসছে, স্টেজ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত হওয়ার পর ইণ্টারভ্যাল কুড়ি মিনিট। জল-পিপাসা পাওয়ায় দু'জনে নিচে নামলাম। জল কোথাও নেই। এখানে পিপাসার্তের জন্য রকমারি আসবের সুব্যবস্থা আছে। নারী-পুরুষ সকলেই পান করছে। এক জায়গায় অরেঞ্জ-জ্যুস্ ছিল, তাই খেলাম দু'জনে।

আবার আরম্ভ হ'ল নাচ-গান-অভিনয়। ওদের ভাষা কিছু না-বোঝার জন্য বিশেষ ভালো লাগছিল না। তবে অবাক হ'য়ে সাজ ও রঙ্গমঞ্চের বাহার দেখছিলাম। মাঝে মাঝে অভিনয়াদির মধ্যে ওদের এদেশীয় রসিকতা চলছিল যা দেখে গা' জ্ব'লে যায়। অন্যের না হোক, অন্ততঃ আমার তো বিরক্তিকর ঠেকছিল। মাঝে মাঝে আবার এমন সাজসজ্জায় নর্তকীরা দেখা দিচ্ছিলেন যা' শালীনতার সীমা বহুদূর লঙ্ঘন ক'রে গেছে। সেজন্য আমাদের দৃষ্টিতে কটুদৃশ্য ব'লে প্রতিভাত হয়। মনে হয় যেন চোখ মুদে থাকলেই ভালো হয়। যাই হোক রাত বারোটায় অভিনয় সাঙ্গ হ'ল। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এলাম। যাবার সময়ে যা' ভাড়া লেগেছিল ট্যাক্সির, আসার সময় দেখা গেল তার দ্বিগুণ ভাড়া উঠেছে মিটারে। কি ক'রে কোথা দিয়ে বেশি ঘুরিয়ে আনলো জানি না।

বৃহস্পতিবার, ৯ জুন ১৯৪৯। প্যারিস ॥

কাল আমরা লণ্ডন রওনা হব। আমরা, কাপড় ধোয়ানো, চশমা করানো ইত্যাদি অনেক কাজই লণ্ডনে গিয়ে হবে ব'লে

তুলে রেখেছি। এখানে মহামুস্কিল। আমরা বলতে পারি না ওদের ভাষা, ওরাও বুঝতে পারে না আমাদের ভাষা। এখানে খাবার অর্ডার দেবার সময় হিম্‌সিম্‌ খেতে হয়।



মঁত্‌মার্ত্রের মন্যুমেণ্ট্‌ স্যু সেকুরেক্যোর

টুরিস্ট্‌ কোম্পানীর অফিসে গিয়ে সেখান থেকে বেলা আড়াইটাতে আজ বেরিয়েছিলাম টুরিস্ট-বাসে, সমস্ত ঘুরে

দেখে ওদের অফিসে প্রত্যাবর্তন করেছি সাড়ে ছ'টায়। সেখান থেকে হোটেলে ফিরতে প্রায় সাতটা হয়েছিল।

আজ ওরা রাস্তায় যেতে যেতে প্রথমে দেখালো মন্যুমেণ্ট দ্যু সেক্রেক্যোর, টোকেভিলে, তারপরই ভার্সাইয়ের রাস্তা আরম্ভ হয়ে গেল। একধার দিয়ে সীন নদী বরাবর চলেছে, অন্যধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি। নদীর ধারে বরাবর সমান মাপের বড় বড় গাছ। নদীর ধারে একজায়গায় মস্ত অটো-মোবাইল ফ্যাক্টরী (সেট্রোন মোটর-কারের) আছে। কিছুক্ষণ বাদে ভার্সাই প্যালেসে এসে পৌঁছলাম। বিরাট প্রাসাদ এবং



ভার্সাই প্যালেসে আমরা

বাগান। বাগানটি চমৎকার, নানান্ ছাঁদে কেয়ারি-করা অতি সুন্দর সাজানো সুদৃশ্য কৃত্রিম ফোয়ারা ইত্যাদি। আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে গাইড টিকিট কিনতে গেল, ইতিমধ্যে এক ফোটোগ্রাফার এসে সমস্ত দর্শকদের নিয়ে

একখানি গ্রুপ ফোটো তুলে নিলে। ভার্সাই দেখে ফেরার সময় প্রিণ্ট ক'রে এই ফোটো দিয়ে দেবে। যার নিতে ইচ্ছা হবে একশ' ফ্রাঙ্ক দিয়ে ছবি নেবে। ফোটো তুলে আমরা যখন প্যালেসে প্রবেশ করলাম তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। সে আর দেখে শেষ হবার নয়। তিন হাজার ঘর আছে প্যালেসে। পনেরো ষোলোখানি ঘর যেগুলি এখনো দর্শকদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে, তাই ঘুরে দেখতেই প্রাণান্ত। চমৎকার সব সোনার গিল্টি ও সোনার পাতের কারুকার্য। দেখে অবাক হতে হয়। লুই চতুর্দশ, লুই পঞ্চদশ ও লুই ষষ্ঠ-র আমলের ব্যবহৃত বহু সোনার গিল্টির সোনার পাতের চেয়ার, টেবিল, খাট, ঝাড়-লণ্ঠন, পাথরের স্ট্যাচু রয়েছে। দেখে শেষ করা যায় না। তখনকার সময়ের সুন্দর-কাজ-করা গালিচাগুলিও সযত্নরক্ষিত হয়ে আছে।

দু'টি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনায় এই প্রাসাদটি বিখ্যাত হয়ে আছে। জার্মানী প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মিত্রপক্ষের সঙ্গে যে চুক্তি করতে বাধ্য হয়, ঐ চুক্তিপত্রলিখন এই প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে-ঘর এবং যে-টেবিলে চুক্তিপত্র সহি হয় সেইটি দেখানো হ'য়ে থাকে দর্শক-সাধারণকে। ভারতের পক্ষ হ'তে এই সন্ধিপত্রে লর্ড সিংহ সহি করেন। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হয়েছিল।

ভার্সাই হচ্ছে এদেশের উচ্চারণ, আমরা ইংরাজী বানানে ভার্সেল বলি। এখানেও শাড়ি-পরা নারী দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে অনেকেই। ভার্সেলের বাগানেও অনেকগুলি সাহেব মেম এসে আমাদের ছেঁকে ধ'রে দাঁড়ালো, কোন্ দেশের লোক, কোথা থেকে আসছো, ইত্যাদি নানা কৌতূহলী প্রশ্ন

করতে লাগলো। এখানে অধিকাংশ মেমের মুখে পাত্‌লা নেটের লঘু অবগুণ্ঠন বা পর্দা টুপির সঙ্গে আটকানো থাকে। জেনিভাতেও ঐ রকম দেখতাম। তখন বুঝিনি, এখন এখানে শুনলাম ওটা নাকি অভিজাতবংশীয়া ফরাসী মহিলাদের আভিজাত্যের নিদর্শন। অবশ্য হালফ্যাসানে এখন অনেকেই এই 'ভেল্' ব্যবহার করেন না। ভার্সেল প্যালেসে অনেক ঘরের বহু ছবি, আসবাব, মর্মরমূর্তি চুরি গেছে। গাইড বলতে লাগলো — "ঐগুলো সব উড়ে গেছে। কিন্তু কারা যে উড়িয়েছে নাম করবো না।"

শুক্রবার, ১০ জুন ১৯৪৫। প্যারিস ॥

প্যারিসে সাত দিন কেটে গেল। আজ আবার দৃশ্যপট পরিবর্তনের পালা — লণ্ডন। কাল রাতেই স্বামী হোটেলে ব'লে রেখেছিলেন যেন সকাল সাড়ে ছ'টায় আমাদের শোবার ঘরে ফোনে রিং ক'রে আমাদের জাগিয়ে দেওয়া হয়। চট্‌পট্ চা খেয়ে ট্যাক্সি ক'রে ঠিক আটটার সময় আমরা বৃটিশ-ইয়োরোপীয়ান-এয়ারওয়েরে অফিসে পৌঁছলাম। মালপত্র লিখে এবং ওজন ক'রে আমাদের ভূগর্ভে নেমে যেতে বললে। সেখানে গিয়ে দেখি মস্ত বড় সুসজ্জিত বসবার হল্, একধারে রেস্টুরেণ্ট্, বার্ ইত্যাদি। মিনিট পনেরো বসার পর ডাক পড়লো এবং বাসে ক'রে আমরা রওনা হ'লাম বিমানগ্রহে। এয়ারোড্রোমটি প্যারিস শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে, আমাদের কলকাতা থেকে দমদমের মত। প্যারিস ছাড়ালেই কিন্তু বড়ই নোংরা রাস্তা ও ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি দেখা যায়। রাস্তায় তরিতরকারি, জামা-কাপড়, মায় বাল্‌তি ইত্যাদিও বিক্রয় হচ্ছে, কলকাতার

শিয়ালদহ বাজারের মত। প্রথম দিন প্যারিসে প্রবেশের মুখে এইগুলো দেখে খুব খারাপ লেগেছিল। যাই হোক, ন'টার সময় পৌঁছে আমরা পাস্‌পোর্ট, কাস্টম্‌স্ ও পুলিশের পরীক্ষা সেরে সাড়ে ন'টায় B. E. A.র বিমানপোতে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম। এখানকার পাস্‌পোর্ট, কাস্টম্‌স্ ও পুলিশ অতিশয় ভদ্র, বিশেষ-কিছুই গোলমাল করলে না, শুধু সই করিয়ে নিয়েই ছেড়ে দিলে।

বিমান ছাড়লে স্টুয়ার্ড এসে একটি ক'রে প্যাকেট দিয়ে গেল। তার মধ্যে চারটি লজেন্স্, একদফা চিউইংগাম, কানে আঁটবার তূলা সব গোছানো আছে। দশটার সময় আবার স্টুয়ার্ড এসে প্রশ্ন করলো, চা, কফি বা অন্য কোনও পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা। যাত্রীদের যার যা' পছন্দ, ব'লে দিলেন। আমরা দু'জনে চা নিলাম। চায়ের সঙ্গে সবাইকে রোল্-স্যাণ্ডুইচ্ দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল স্যাণ্ডুইচ্ শূকরমাংস দিয়ে তৈরি। স্টুয়ার্ডকে শূকরমাংস খাই না ব'লে দেওয়ায় চায়ের সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্রাকৃতির দু'টি বাক্স দিয়ে গেল। খুলে দেখা গেল তার মধ্যে চারখানি হাণ্ট্‌লিপামার্ বিস্কুট ও একটি ক'রে বড় চকোলেট্ আছে।

এখানকার বিমানে উঠে পর্যন্ত আমরা খুব খুশী। আশে-পাশে সকলেই ইংরাজী বলছে, স্টুয়ার্ডও পরিষ্কার ইংরাজী বলে। এতক্ষণে অনেকটা যেন স্বচ্ছন্দ অবস্থার মধ্যে ফিরে এসেছি ব'লে বোধ হতে লাগলো।

লণ্ডনে

শুক্রবার, ১০ জুন ১৯৪৯ ॥

আজ বেলা এগারটায় আমরা লণ্ডনে পৌঁছেছি। এরা কাস্টমস্ পুলিশের কিছুই হাঙ্গামা করেনি। শুধু পাসপোর্টটা দেখে নিয়ে ছেড়ে দিলে।

আমরা উঠেছি যে-হোটেলটিতে ('Airway's Mansion', Pall Mall) সেটি পিকাডিলি সার্কাসের খুব কাছে। শোবার ঘর, বসার ঘর ও স্নানকক্ষসহ একটি স্যুট বা মহল দিয়েছে, দৈনিক ভাড়া আড়াই গিনির একটু বেশি। এখানে এসে আমরা সব রাস্তা দোকান বাজারের নাম পড়তে পারছি, বুঝতে পারছি, তাইতেই খুব খুশী। এতদিন যেন চোখ কান বুজে আন্দাজে আন্দাজে হাত্ড়ে ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছি। বুঝতে এবং বোঝাতে প্রাণান্ত ঘটেছে।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল—স্বামীর জন্য মুর্গীর মাংস, রুটি, শাকসব্জি ও পুডিং, আর আমার জন্য ডিম, রুটি, সব্জি। খেয়ে উঠে আমি বাক্স খুলে এই একমাসের জমানো যা-কিছু কাচতে দেবার এবং ইস্ত্রি করবার ছিল, সমস্ত বার ক'রে এদের ডেকে দিয়ে দিলাম। বেলা সাড়ে তিনটের পর আমরা প্রস্তুত হয়ে নিচে নামলাম। স্বামী আমাকে রিসেপ্শন্-রূমে বসিয়ে রেখে হোটেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলেন যে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের ফোনে ট্রাঙ্ক্-কল ক'রে কথা বলার কি রকম ব্যবস্থা করা যায়। এমন সময় একটি ভদ্রলোক উপরতলা থেকে নেমে এলেন, ভারতীয় ব'লে মনে হ'ল। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা

করলেন — "বাংলা দেশ থেকে আসছেন বোধ হয় আপনি ?"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বললাম — "হ্যাঁ। আপনি ?"

তারপর বেশ আলাপ জ'মে গেল। কলকাতায় থিয়েটার রোডে থাকেন। নাম মিলন গুপ্ত। স্বামী এলে তাঁর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় জমলো। ভদ্রলোক সাতদিন হ'ল এসেছেন এখানে। লণ্ডনে ব্যবসায়ের জন্য যাতায়াত করতে হয়। এর আগে দুই তিন বার এসেছেন লণ্ডনে। তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা একটা স্যুটকেস্ এবং আমার স্বামীর জন্য একটি ইংলিশ স্যুট্ কিনতে চাই শুনে আমাদের নিয়ে নানা রাস্তায় অনেক দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। একটি স্যুটকেস্ কেনা হ'ল এগার পাউণ্ড দামে। স্বামীর জন্য স্যুট্ আজ তো কোনটাই পছন্দ হ'ল না, অথচ এরা কোনও অর্ডার অন্ততঃ তিন-সপ্তাহের আগে সরবরাহ করতে অপারগ ব'লে অর্ডার নিলে না। অল্পবয়সী আর একটি বাঙালি যুবক এই ভদ্রলোকের বন্ধু, তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হওয়ায় ইনি আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

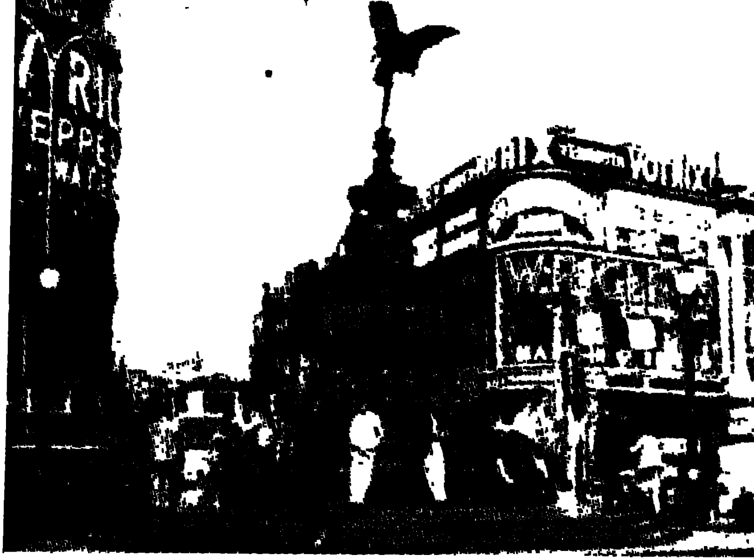
হোটেলে ফিরবার সময় ট্যাক্সিতেই ফিরলাম। ভদ্রলোকটি কোনও মতেই আমাদের ভাড়া দিতে দিলেন না, নিজে দিয়ে দিলেন। বাড়ি এসে চা খেয়ে আমি বললাম — 'আমি আর বেরুচ্ছি না।' স্বামী আবার বেরিয়ে পড়লেন এখানকার রাস্তাঘাট দিক্-বিদিক্ পায়ে হেঁটে চিনে নেওয়ার জন্য। মানুষটির পায়ে বোধ হয় চাকা আছে, অবলীলাক্রমে অনবরতই হাঁটতে পারেন। পায়ে ব্যথা হয় না, বা ক্লান্তি বোধও কি হয়না কখনও ? এ হাঁটা-বাহাদুরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সুকঠিন !

স্বামী বেড়িয়ে ফেরার পর আমরা মিস্টার গুপ্তকে ফোনে ডাকতে তিনি আমাদের ঘরে এলেন। এখানে কোথায় খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা মিস্টার গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—"এখানে কাছাকাছি অনেকগুলি ভালো ইণ্ডিয়ান্ রেস্টুরেণ্ট আছে। সেখানে আপনাদের খাওয়ার সুবিধা হবে।" ঠিকানা জেনে নিয়ে কাছেই এক ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্টে গিয়ে আমরা খেয়ে এলাম। চমৎকার বাংলা রান্না। মিসেস্ মেনন নামে এক মাদ্রাজী মহিলা এই রেস্টুরেণ্টটি করেছেন। নাম—'দিলদার রেস্টুরেণ্ট'। নিরামিষ খাওয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। গিয়ে দেখি দশ পনেরোজন ভারতীয় সেখানে ব'সে খাচ্ছেন ও গল্প করছেন। বাঙালি, মাদ্রাজি, বেহারি, পাঞ্জাবি সব প্রদেশের মানুষই আছেন ব'লে মনে হ'ল। খেতে ব'সে মনে হচ্ছিলো ভারতবর্ষেরই কোনো হোটেলে ব'সে খাচ্ছি।

শনিবার, ১১ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

আজও বেশ রোদ উঠেছে। সকালে বেরিয়ে বিকেলের ট্রিপের জন্য টুরিস্ট্ কোম্পানীর তু'টি টিকিট কিনে স্বামীর ওভারকোট কেনার জন্য অনেক দোকানে ঘোরা হ'ল, কোনও খানেই তিন সপ্তাহের কম সময়ে অর্ডার নিতে রাজি হয়না। তৈরি-ওভারকোট আছে অবশ্য, কিন্তু, সে গায়ে হয় না! বেলা হয়ে গেছে দেখে দিলদার রেস্টুরেণ্টে খেতে গেলাম। আজও সেখানে বহু ভারতীয় খেতে বসেছেন। আজ আমরা ভাত, মাংস, পুরি, আলু-কপি-মাছের কালিয়া, পায়েস ইত্যাদি দেশী খাদ্য খেয়ে এলাম। হোটেলে ফিরে শাড়ি বদ্‌লে প্রসাধন-পর্ব সেরে ২টা ১৫ মিনিটে টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাসে উঠলাম। বেলা

আড়াইটায় বাস্ যাত্রা করেছিল। বেলা সাড়ে ছ'টায় ভ্রমণ শেষ ক'রে আবার আমাদের যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে গেল। পুরো চার ঘণ্টা ঘুরিয়েছে। আজকের ভ্রমণে দেখালো— ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার, পিকাডিলি সার্কাস্, নেল্‌সনের স্মৃতিস্তম্ভ,

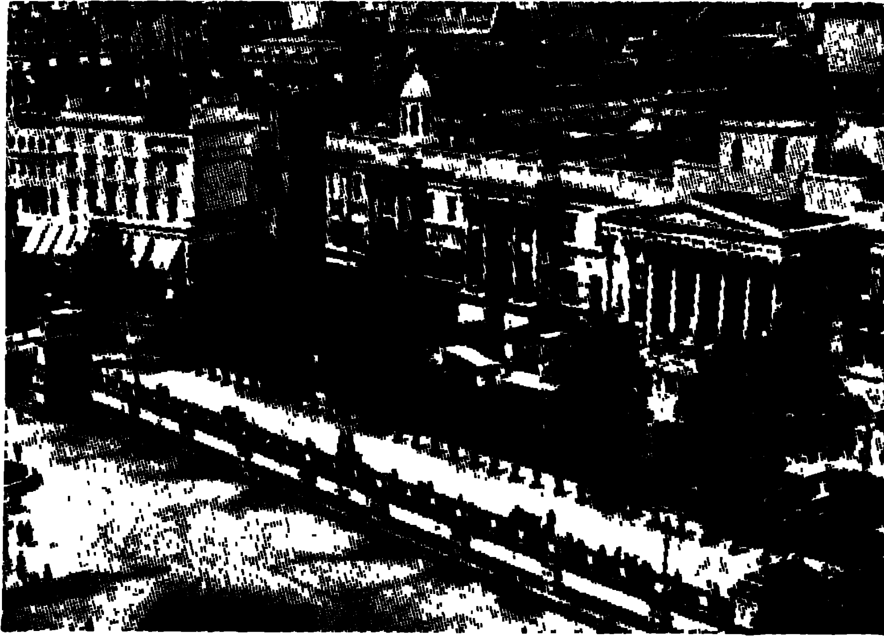


পিকাডিলি সার্কাস্

সেণ্ট্ জেমস্ প্যালেস্ (বর্তমানে ডিউক অব্ গ্লস্টার আছেন), মার্লবরো হাউস (কুইন মেরী আছেন), কুইন্ এলিজাবেথ প্যালেস্, বাকিংহাম প্যালেস্, তারই সম্মুখে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রকাণ্ড মূর্তি, হাইড পার্ক, কেন্‌সিংটন পার্ক, মার্বেল আর্ক, টেমস্ নদী, ল্যাম্বার্থ প্যালেস্ (প্রধান ধর্মযাজক থাকেন), পার্লামেণ্ট হাউস (নেমে দেখা), ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে (নেমে দেখা), ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট্ (প্রধান মন্ত্রীর সরকারী বাসভবন), স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড, হোয়াইট্ হল ইত্যাদি।

হোটেলে ফেরার একটু পরে মিস্টার গুপ্ত ফোন করছেন, আমাদের যদি সময় থাকে, তা'হলে তাঁর বোন এসেছেন তাঁর

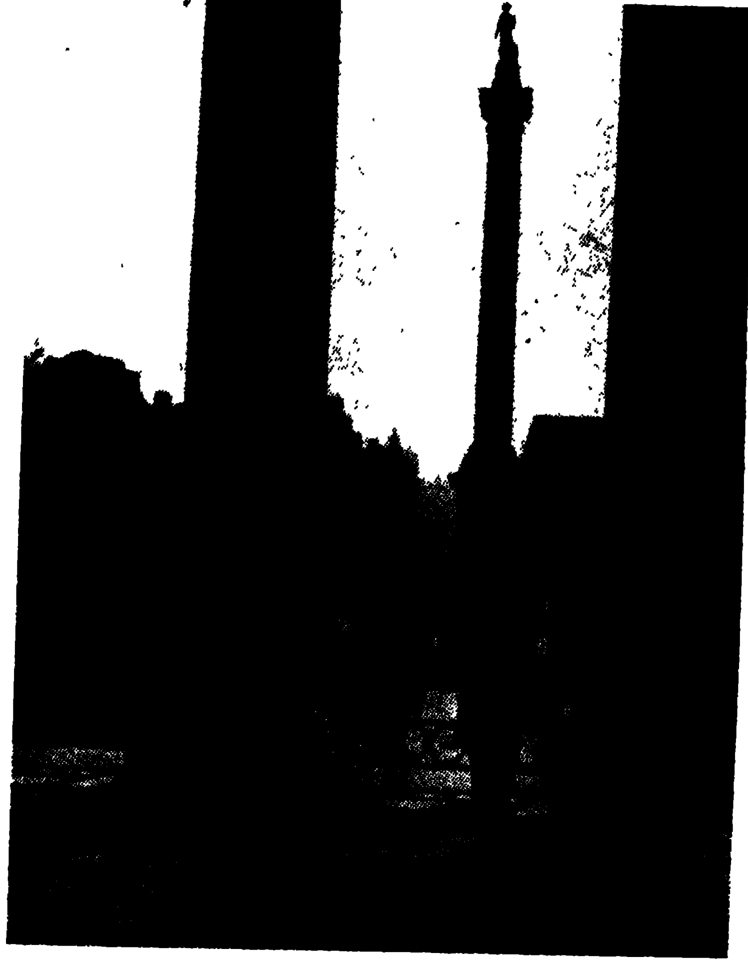
কাছে বেড়াতে, তাঁকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসতে পারেন। আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করায় মিস্টার গুপ্ত এবং তাঁর খুড়তুতো বোন মিসেস্ অনু রায় এলেন। ভদ্রমহিলা খুবই আধুনিকা। চমৎকার ইংরাজী বলেন, ফ্রেঞ্চও জানেন। বললেন, স্বামী অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিলাতে এসেছেন। উনি হু'টি শিশু-সন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে এসেছেন। একটি চারবছরের ও



ট্রাফালগার স্কোয়ারে ন্যাশন্যাল গ্যালারি

অন্যটি হু'বছরের ছেলে। মিসেস্ রায় বিয়ের আগেও তাঁর বাবা কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিস্টার জে. সি. গুপ্তের সঙ্গেও অনেক দিন এদেশে কাটিয়ে গেছেন। গল্পগুজব ক'রে, চা খেয়ে ওঁরা আটটার সময় উঠলেন। স্থির হ'ল আগামী কাল মিস্টার রায় এসে আমাদের নিয়ে যাবেন, তারপর সবাই একসঙ্গে টিউবে চ'ড়ে ঘোরা যাবে। কাল রবিবার, দোকানপাট সবই বন্ধ, তা' ছাড়া সকালবেলায় আমরা কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল্ ক'রে

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফোনে কথা কইবো ঠিক করা হয়েছে, সেজন্য সকালে কোথাও বেরুবো না, একেবারে লাঞ্চ খেয়ে



ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেল্‌সন্‌-স্মৃতিস্তম্ভ

ওঁদের সঙ্গে বেরুবো। মিস্টার অশোক রায়ও এসেছিলেন আমাদের ঘরে, বেশ অমায়িক ভদ্রলোক।

সাড়ে আটটায় দিলদার রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। কাল এইখানে এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, নাম তাঁর বিজয়রত্ন ব্যানার্জি। ভদ্রলোক কিড্‌নীর চিকিৎসার জন্য এদেশে আছেন। তাঁর সঙ্গে ব'সে গল্প করতে করতে খাওয়া

হ'ল। আজ দিলদার রেস্টুরেণ্টে উপরে বেশি ভিড় হওয়ায় ভূগর্ভে যে খাওয়ার ঘরটি আছে, সেইখানে খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, এক-একটি ভারতীয় এক-একটি শ্বেতাঙ্গিনী জুটিয়ে বেশ খাওয়া-দাওয়া ও স্ফূর্তি করছেন।



বাকিংহাম প্যালেস

এতদিন এ ব্যাপারটা লোকমুখে শুনতাম এবং বইয়ে পড়তাম, এখন স্বচক্ষে দেখলাম। এর আগেও অবশ্য অন্যান্য একাধিক স্থানে দেখেছি, তবে সে-সব জায়গার তুলনায় লণ্ডনে ভারতীয় অনেক এবং বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট।

এখানে ঠেলাগাড়ি ক'রে বা রাস্তায় ফল হেঁকে ফিরি ক'রে বিক্রি করছে। চেরী এবং স্ট্রবেরীই বেশি। আজ আমরা কিছু চেরী কিনলাম, এক পাউণ্ডের দাম তিন শিলিং। এখানে খাদ্যদ্রব্য সবই এখনও নিয়ন্ত্রণের অধীন। সেইজন্য চিনি বা অন্যান্য সামগ্রী সম্পর্কে খুবই কড়াকড়ি। যাঁদের পারমিট আছে,

ন্যায্য দামে এবং ন্যায্য পরিমাণেই জিনিস পান, কোনও কষ্ট নেই। মিসেস্ রায় এখানে রয়েছেন, তিনি পরিমিত নির্দিষ্ট



ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল

পরিমাণে সমস্ত জিনিসই পাচ্ছেন, তাঁর মুখে গল্প শুনেছিলাম। এখানে রোগীদের, প্রসূতিদের এবং শিশুদের জন্য যথেষ্ট বেশি পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্য-রেশনের সুব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সমস্ত মানুষ পায় নির্দিষ্ট সাধারণ পরিমাণ মত।

রবিবার, ১২ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

আজ বেলা দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত টেলিফোনের পাশে ব'সে আছি, কলকাতার লাইন পাওয়ার জন্য। এক্সচেঞ্জ

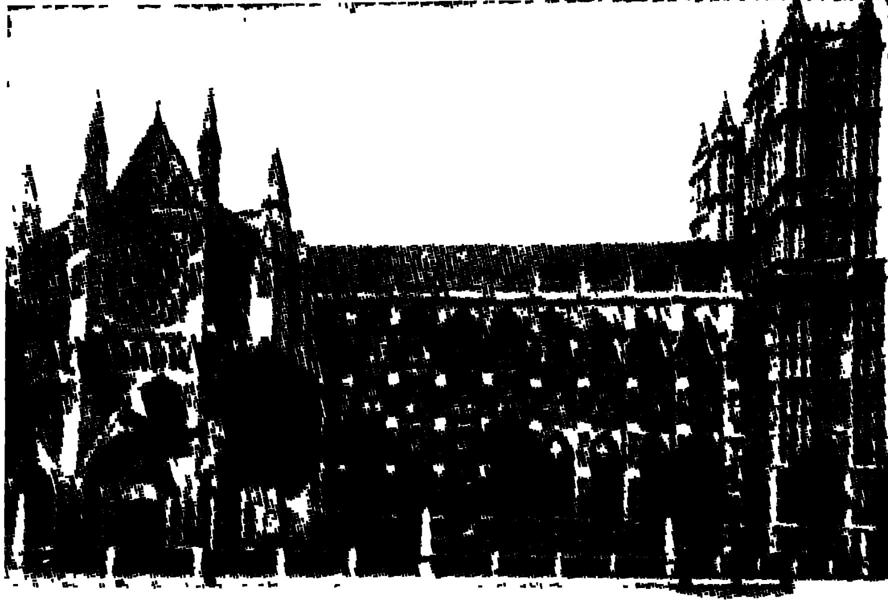
থেকে সংবাদ দিলে ভারতবর্ষের আবহাওয়া খুব খারাপ থাকায় ঠিকমত সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক্, অপেক্ষা ক'রে ব'সে থেকে থেকে প্রায় একটা চল্লিশ মিনিটের পরে আমরা লণ্ডনের ফোনের সঙ্গে কলকাতার ফোনে সংযোগ পেলাম। মাত্র তিন মিনিট,—কিন্তু একমাত্র আমাদের আত্মীয় শ্রীনরেন্দ্র দেব এবং আমার বড় ছেলে শ্রীমান অশোকের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কারুরই আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আমার ছোট ছেলে মেয়ে, অভীক ও প্রমিতা, কথা বললে কিনা জানিনা, কিছুই শোনা গেল না। তাদের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্যই মন আমার



পার্লিয়ামেণ্ট হাউস

উৎসুক ছিল বেশি, শুনতে না পেয়ে আমার তো মন বেজায় খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক্, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সাজসজ্জা ক'রে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় মিস্টার রায়কে নিয়ে মিসেস্ রায় এসে উপস্থিত। তিনি বল্লেন,

'আমি রান্না খাওয়া সেরে নিয়ে একেবারেই বেরিয়ে পড়লাম।' সবাই মিলে ভূগর্ভে নামা হ'ল টিউব-ট্রেন চ'ড়ে যাবার জন্য।



ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে

সেখানে লেটারবক্সের মত লাল লাল বাক্স আছে, তার গায়ে কোথায় কোথায় যাওয়ার টিকিট পাওয়া যাবে এবং তার কত দাম সমস্ত লেখা আছে। শিলিং ফেলে দিতেই টিকিট ও সঙ্গে সঙ্গে বাকি চেঞ্জও বেরিয়ে এলো, তাই নিয়ে একটু দূরে চলন্ত ইলেকট্রিক্ সিঁড়ি বেয়ে নামা হ'ল ভূগর্ভস্থ টিউব স্টেশনে। আমার তো সে চলন্ত-সিঁড়িতে (Escalator) উঠতে বেজায় ভয় করছিল প্রথমে। একটা ধাপের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেটা আপনিই ঘুরে ঘুরে নামে। যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে মাটিতে চট ক'রে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ঐ রকম দু'টি সিঁড়ি পার হ'য়ে আমরা অনেকটা নিচে নেমে পিকাডিলি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। টিউব-ট্রেন খুব দ্রুত

গতিতে চলে। চার পাঁচটা স্টেশন পরে আমরা নামলাম এবং অন্য আর একটি ট্রেন ধ'রে কিউ গার্ডেনে পৌঁছে উপরে উঠলাম। গার্ডেনে প্রবেশ ক'রে দেখা গেল যেন মেলা ব'সে গিয়েছে, এমন ভিড়। যাই হোক্, আমরা বাগানটিতে ঘুরে ঘুরে গাছপালা ও মানুষ দেখতে লাগলাম। অধিকাংশ নারী এবং পুরুষ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ঘাসের উপরে সটান্ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার নাম রৌদ্রস্নান (Sun-Bath) হচ্ছে। বাচ্চা শিশু-গুলোকেও ছোট ছোট পাজামা পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। সকলেই জুতো মোজা খুলে রোদ পোয়াচ্ছে—সে এক দৃশ্য। হেঁটে হেঁটে আমার তো অবস্থা কাহিল। মিসেস্ রায় এবং মিস্টার রায় দু'জনেই দেখলাম বেশ শক্ত। শিশু দু'টি খুব দুরন্ত, তাদের নিয়েই হিমসিম খাচ্ছেন। বাগানের শেষপ্রান্তে এসে একটু বসা গেল এবং আইস-ক্রিম কিনে খাওয়া হ'ল। কিউ গার্ডেনের পাশেই টেম্‌স নদী। আমরা ঠিক করলুম সেখান থেকে টেম্‌সের উপর দিয়ে বোটে ক'রে রীচ্‌মণ্ড যাবো। ওখানে বোট আসার টাইম জিজ্ঞাসা ক'রে আমরা টেম্‌স নদীর ধারে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম বোটের জন্য।



কিউ গার্ডেন — রীচ্‌মণ্ড

খানিক বাদে বোট এলো এবং আমরা তাতে চ'ড়ে রীচ্‌মণ্ডে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আরও বেশি ভিড়। সব লোক

টেম্‌সের সামনে ব'সে আছে। কেউ স্নানও ক'রছে। বোটে চড়ে বেশ ভাল লাগছিল। অনেক চেষ্টা চরিত্র ক'রে একটা রেস্টুরেণ্টে প্রবেশ করা গেল ভিড় ঠেলে—কিন্তু প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরও চা দিলে না তারা। আমার স্বামী এবং মিস্টার রায় গিয়ে বলায় তারা জবাব দিলে—অত্যন্ত ভিড়, আরও দেরি হবে চা দিতে। এদিকে প্রায় ছ'টা বাজে। শিশু ছু'টি ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে পড়েছে, আমার তো ভীষণ কষ্ট হ'চ্ছে—অথচ বলাও যাচ্ছে না কিছু। শেষে আমার স্বামী বললেন, 'চলুন, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাই।' শেষকালে স্থির হ'ল, মিসেস্ রায় কাছাকাছি একটা রেস্টুরেণ্টে তাঁর শিশুদের যা-হোক্-কিছু খাওয়াবেন এবং মিস্টার রায় আমাদের টিউবে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। টিউবে যাওয়ার কারণ, অনেক চেষ্টা ক'রেও এখানে ট্যাক্সি মিললো না। রীচ্‌মণ্ড লণ্ডনের উপকণ্ঠে ছোট গ্রাম, ট্যাক্সি বেশি নেই, তা' ছাড়া অত লোক ভ্রমণে এসে জড়ো হয়েছে, ট্যাক্সি যা ছিল ইতিমধ্যে সব ভাড়া হয়ে গেছে। মিস্টার রায় আমাদের টিউবে তুলে দিয়ে গেলেন। আমরা এসে পিকাডিলিতে যখন উঠলাম তখন আটটা বাজে। আমার তো যা অবস্থা হয়েছে—সর্বাঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রছে। দিলদারে ডিনার খেয়ে হোটেলে ফিরলাম সওয়া ন'টার পর। উপরে এসে দেখি মিসেস্ রায় দাঁড়িয়ে! কী ব্যাপার? বললেন—'আপনি বড়ই কষ্ট পেয়েছেন, তাই দেখে যেতে এলাম।' আমি বললাম, 'বাড়ি ফেরেননি এখনও? ছেলে ছু'টি কই?'

যাই হোক্, অত রাতে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন টিউবে চ'ড়ে। ভদ্রমহিলার শ্রান্তিহীন উদ্যমকে সত্যিই প্রশংসা ক'রতে

হয়। লণ্ডন শহরটি কলকাতারই মত ঘিঞ্জি বটে, কিন্তু একটু বাইরে বেরুলেই সুন্দর ফাঁকা পরিবেশে সুদৃশ্য ফুলবাগানওয়ালা ছোট ছোট বাড়িগুলি দেখলে মন খুশী হয়।

সোমবার, ১৩ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন ॥

সকালে পৌনে ন'টায় ট্যাক্সি ক'রে রাসেল্ স্ট্রিটে গিয়ে টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাসে উঠেছি এবং বিকেলে সাতটায় আজ হোটেলে ফিরেছি। টুরিস্ট্ কোম্পানীর বাস্ লণ্ডন থেকে রওনা হ'ল ঠিক সাড়ে ন'টায়। বেলা এগারটা নাগাদ একজায়গায় দাঁড়ালো কুড়ি মিনিটের জন্য। যাত্রীরা চা-পান বা পায়চারি ক'রে নিতে পারে এ-সময়। বেলা ১২টা ২০ মিনিটে আমরা অক্স্‌ফোর্ডে পৌঁছেছি। পথের দৃশ্য সুন্দর। অনেক ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে এলাম, বড়ই সুন্দর দেখতে ছোট ছোট বাড়ি-ঘরগুলি। বাগান, রাস্তা, দোকানগুলিও ভারি ভাল লাগছিল। অক্স্‌ফোর্ডে মস্ত এক খোলা জায়গায় বাস্‌স্ট্যাণ্ড। সেখানে আমাদের নামিয়ে গাইড সমস্ত যাত্রীদের শহরে নিয়ে গেল এবং খানিকক্ষণ হাঁটার পর এক রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ খেতে দিলে। তিনটা কোর্স-এর উপরে কেউ কিছু বেশি মিলে নিজেদেরই তার দাম দিতে হয়। লাঞ্চ খেয়ে গাইডের সঙ্গে শহর দেখতে বেরুলাম।

এখানে সর্বসমেত কুড়িটি কলেজ আছে। ষোলটি কলেজ ছেলেদের জন্য, চারটি কলেজ মেয়েদের জন্য। অক্স্‌ফোর্ড জায়গাটিও বেশ বড়। এতদিন ভাবতাম যে-অক্সফোর্ডে ছেলেরা পড়তে আসে, সেটা একটা নির্দিষ্ট কলেজ! এখন দেখে জানা গেল, অক্স্‌ফোর্ড একটা জায়গা। কলেজগুলির বাড়ি

বিরাট, এ ছাড়া আর কিছুই দেখার মত নেই। আমরা যখন যাচ্ছিলাম, একটি কলেজের ভাইস্‌চ্যান্সেলার যাচ্ছিলেন— দেখলাম তাঁকে। কালো গাউন্‌ এবং মাথায় একরকম হুড্‌



অক্স্‌ফোর্ড টাওয়ার

দেওয়া। দু'টি কলেজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের ওরা দেখালে। হাফ্‌গাউন্‌ যাঁদের, তাঁরা আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট্‌ এবং ফুলগাউন-পরিহিতেরা গ্র্যাজুয়েট্‌ হয়ে অন্য-কিছু পড়ছেন অথবা গবেষণা করছেন। তারপর লাইব্রেরী। মস্ত বড় গ্রন্থাগার,

এখানে নয় কোটি কুড়ি লক্ষ বই আছে। অনেক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ গ্রন্থ, দুর্লভ প্রাচীন পুঁথি অনেক যত্নসহকারে এখানে সুরক্ষিত আছে। ছাত্ররা এখানে এসে ব'সে প'ড়ে যায়। তারপর দর্শকদল বা আমাদের সঙ্গী যাত্রীদল এক গির্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লেন। হেঁটে হেঁটে আমি বড়ই ক্লান্ত হয়েছিলাম, তাই আমরা দুজনে গির্জার বাগানে এক বেঞ্চে বসলাম। সেখানে একটি ওদেশের ছাত্র বসেছিলেন, আমার স্বামী তাঁকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন এখানকার কলেজ সম্বন্ধে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, আমাদের সহযাত্রীদল গির্জার মধ্য থেকে আর বেরিয়ে আসে না দেখে আমরাও চার্চের ভিতরে ঢুকলাম। দেখি, তাঁরা সকলে ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য কোথায় চ'লে গিয়েছেন। আমাদের তো চক্ষুস্থির! শেষকালে সেই সত্যপরিচিত ছাত্রটি খুঁজে খুঁজে অনেক ঘুরে আমাদের বাস্‌স্ট্যাণ্ডে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখি আমাদের বাসটি নেই। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেল এখনও কোনও বাস্ লণ্ডন অভিমুখে রওনা হয়নি। হেঁটে হেঁটে একে ক্লান্ত, তা'য় এতদূরে এসে মহাবিপদ। শেষকালে আমাদেরই বাস্-এর সহযাত্রী আর এক আইরিশ-দম্পতি তাঁরাও দেখি আমাদেরই মত ক্লান্তদেহে বাস্‌স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছুলেন সঙ্গীদলকে হারিয়ে। এঁরাও পথ হারিয়ে অনেক ঘুরে শেষপর্যন্ত বাস্‌স্ট্যাণ্ড লক্ষ্য ক'রে এসে পৌঁছেছেন। সেই মেমসাহেব ও আমি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং সেই আইরিশ সাহেব ও আমার স্বামী আমাদের বাস্ খুঁজতে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন দু'জনে, কোথাও বাসের চিহ্ন নেই। বেলা প্রায় চারটে নাগাদ

আমাদের বাস্ এলো অন্যান্য সবাইকে তুলে নিয়ে। তাদের তুলতেই বোধ হয় বাসটি স্ট্যাণ্ড ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলো। বাসে উঠে ব'সে শরীর সুস্থ হ'ল। লণ্ডনের পথে আবার যাত্রা। পথে সাড়ে পাঁচটার সময় নামিয়ে চা, রুটি, কেক, স্যাণ্ডুইচ্ ইত্যাদি খাওয়ালে যাত্রীদের। তারপর রওনা হয়ে একেবারে লণ্ডনে এসে পৌঁছলাম। বাসের সহযাত্রী এক আমেরিকান মেম এবং তাঁর সঙ্গে দু'টি ইটালিয়ান ছাত্রী, তাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। মেমটি তাঁর পরিচিতি-পত্র (Card) দিয়ে বললেন তিনি এই মাসের শেষেই শিকাগোতে ফিরবেন। যদি দরকার হয় তো আমরা যেন শিকাগোতে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই মেমটি আমাদের ট্যাক্সিতেই পিকাডিলি পর্যন্ত এলেন।

হোটেলে ফিরে পোষাক বদ্‌লে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। স্বামীকে বললাম, 'তুমি খেয়ে এসো, আমি হোটেলেই আজ সামান্য যা-হোক-কিছু খেয়ে নেবো। আজ আর বেরুতে পারছি না।' উনি ম্যানেজারকে ফোন ক'রে খাবারের কথা বলায় তিনি উত্তর দিলেন—"অত্যন্ত দুঃখিত। আমাদের ডিনার শেষ হয়ে গেছে। আটটা বাজে, তাছাড়া খাবার আর বিশেষ কিছুই নেই।"

বাধ্য হ'য়ে তখন আবার উঠে শাড়ি বদ্‌লে প্রস্তুত হয়ে 'দিলদারে' খেতে যেতে হ'ল। এদেশের লোকেরা একেবারে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত সময় ধ'রে চলে এবং একেবারেই লঘু প্রকৃতির নয়, সর্ববিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

মঙ্গলবার, ১৪ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

শরীর ভাল না থাকায় আজ বেরুই নি। আকাশ আজ ক'দিন পরে মেঘ্‌লা। তবে বৃষ্টি নেই।

অন্যান্য স্থানের তুলনায় লণ্ডনের খাওয়া-দাওয়া এবং রীতি-নীতির একটু পার্থক্য আছে। প্রাতরাশ এরা ভালই দেয়। ডিম, রুটি, জেলি, মাখন ছাড়াও কোনও দিন মাছ বা ফল এই সবও দিয়ে থাকে। এখনও এখানে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ বর্তমান, তাই সপ্তাহে মাত্র দু'দিন ডিম দেয়। বেশির ভাগ সময়ে ফল সিদ্ধ দেয়। এতদিন ভাবতাম লণ্ডনে সিল্ক না-জানি কতই সুন্দর এবং সস্তা। এখানে এসে দেখছি সিল্ক আমাদের দেশেই সবচেয়ে সুন্দর, দামও সুবিধা। আমাদের দেশের সিল্ক দেখে এদেশীয়রা মুগ্ধ। মিসেস্‌ রায়ের মুখে শুনলাম এখানে প্রতি জায়গায় একটি ক'রে দোকান আছে যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও জামাকাপড় বিক্রি হয় একটি নির্দিষ্ট বাঁধাদামে। সেটা নাকি সুন্দর। একদিন সে-দোকানটি দেখবার ইচ্ছা আছে।

আজ বিকেলের দিকে সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে এখান থেকে বাসে উঠে একেবারে ইণ্ডিয়া-হাউসের সামনে নামলাম। ইণ্ডিয়া-হাউসে ঢুকে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের একটি মর্মরমূর্তি আছে (তেমন ভালো নয়), আর ফ্রেস্কো পেণ্টিং অজন্তার ডিজাইনেই সব আঁকা। অনেকগুলো ফোটো আছে, কোথায় কোন্‌ ভারতবাসী কে কি করেছে। বাইরে কতকগুলি শান্তিনিকেতনের চামড়ার কাজ, জয়পুরী কাজ, কিছু কিছু কাঠের কাজ সাজানো আছে। ইণ্ডিয়া-হাউসের ঘরের সিলিং এবং ভিতরের দেওয়ালের পেণ্টিংগুলি আমাদের দেশের এক বাঙালি আর্টিস্ট্‌ এঁকেছেন শুনলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে একটু বেড়িয়ে

নিকটে একটা রেস্টুরেন্টে চা খাওয়া গেল। চা এবং কেক খেতে ছু'জনের মোটে ছু'শিলিং লাগলো। প্যারিসের তুলনায় দাম অর্ধেক। আমরা অনেকটা হেঁটে গিয়ে টেম্‌সের একটা বড় সেতুর উপরে উঠলাম, সে স্থানটি সুন্দর। জায়গাটির নাম চেয়ারিংক্রশ্। আবার পদব্রজে ফিরে বাসে উঠলাম, তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। স্বামী বললেন — "চলো, বাস্ যতদূর যায় যাবো আজ।"

খবর নিয়ে জানা গেল বাস্ ৪৫ মিনিট যাবে, তারপরে পৌঁছবে শেষ স্টপেজে। ছু'জনের ষোলো পেনি ভাড়া দিয়ে সামনের সিটে বসলাম গিয়ে। সর্বত্রই এদের বাস্‌গুলি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসনগুলি কোমল ভেলভেটের। শহর ছাড়িয়ে বার ছুই তিন টেম্‌সের সেতু পার হয়ে আমরা অনেকদূর গেলাম। শেষ স্টপেজ্-এর নাম Mort lake. এখানে ছুধারে ছোট ছোট বাড়ি, রাস্তাটি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। সেখানে নেমে আমরা অন্য বাসে উঠে বাড়ির সামনে Hay marketএ নামলাম এবং একেবারে রেস্টুরেন্টে নৈশভোজন শেষ ক'রে হোটেলে ফিরলাম।

এখানে এই ক'দিনের মধ্যে রাস্তায় একটিও ভিখিরি দেখিনি। প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু কাজ করে। খুব বুড়ো বা বুড়ি দেখি ফুটপাথে ফুল বা বই কাগজ বিক্রি করছে ব'সে। কায়রোতে মাত্র ছু'দিন ছিলাম, একাধিক ভিখিরি চোখে পড়েছে। ইটালীতে কিন্তু দশদিনের মধ্যে একটি মাত্র ভিখিরি দেখেছিলাম। সুইজারল্যাণ্ডে এত ঘুরেছি সব শহরে কিন্তু কোথাও ভিখিরি নেই। ফ্রান্সে ছু'তিন দিনে দেখেছি অবশ্য ছুই-একটি লোককে ভিক্ষা করতে।

এখানে এই হোটেলে আমাদের যে বিকেলের মেইড্ আছে, বেশ বোঝা যায় যে সে ভাল ঘরের মেয়ে। বয়স প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন, একটি ছেলে আছে। বললে, 'যুদ্ধের পর খাওয়া-থাকার খরচ অত্যন্ত বাড়ায় বাধ্য হ'য়ে কাজ করছি।'

বুধবার, ১৫ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

সকালে আজ আমি বেরুলাম না, স্বামী গেলেন খাওয়ার ব্যবস্থা এবং সুইডেন্ যাওয়ার VISA করাতে। বেলা সাড়ে বারোটায় দু'জনে ফোটো তুলতে গেলাম পাস্পোর্টের জন্য। ফোটোর দোকানে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে 'কোহিনূর রেস্টুরেন্টে' আজ খাওয়া হ'ল। 'দিল্দার রেস্টুরেন্ট' বুধবার বন্ধ থাকে। মাংসের পোলাও, শাকসব্জি, রসগোল্লা নেওয়া হ'ল আজ। এরা বেজায় মশ্লা দিয়ে রাঁধে। রান্নাও বিশেষ ভাল নয়। খেয়ে উঠেই আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নামলাম সেই চলন্ত সিঁড়িতে উঠে। বেশ মজা লাগে। পিকাডিলি স্টেশন হ'তে আমরা টিউবে উঠলাম এবং ম্যানার-হাউস্ স্টেশনে নামলাম। মিস্টার রায়দের বাড়ি খুঁজে বার করা হ'ল। মিসেস্ রায় ও তাঁর খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে দোকান করতে বেরুলাম। বাসে চ'ড়ে খানিকটা গিয়ে মার্কেটের কাছে নেমে সেই 'সব-পাওয়া-যায়' দোকানে ঢোকা গেল। সত্যিই সেখানে পেরেক্ থেকে আরম্ভ ক'রে জুয়েলারি পর্যন্ত সবই আছে। সংসারের খুঁটিনাটি. ও রান্নার বাসন-কোসন দেখে তো আমার মনে হচ্ছিল সব কিনে নিই। শেষে শিশুদের বিভাগে গিয়ে কিছু খেলনা কেনা গেল। এত সুন্দর সুন্দর

খেলনা, মনে হয়, সব নিয়ে যাই। আমার মেয়ে খুকুর জন্য ফ্রক কিনতে গিয়ে দেখলাম সুতির ফ্রক এখানে অসম্ভব দাম, তার থেকে পশ্‌মি ভালো। তাই, আমার ছেলে মেয়ে অভু ও খুকুর জন্য দু'টি উলের পোষাক নিয়ে আমরা অন্যান্য টুকিটাকি দেখে কিনতে লাগলাম। আজ আবার আমাদের রাত্রের জন্য 'ক্যাসিনো'তে টিকিট কাটা হয়েছে। হোটেলের নিচের তলার ১৬নং রুমের মিস্টার জৈন ও মিসেস্ জৈন এবং আমরা দু'জনে একত্রে দেখতে যাবো। হোটেলে ফিরে চা খেয়ে বিশ্রাম ক'রে একটু ঘুরে বেড়িয়ে ডিনার খেতে গেলাম। 'ক্যাসিনো'তে পৌঁছুলাম যখন তখন প্রায় ন'টা বাজে।

প্রকাণ্ড জম্‌কালো হল। মিউজিক্ হচ্ছে। কতকগুলো মেয়ে এসে সিট্ দেখে বসিয়ে দিচ্ছে। এদেশে মেয়েরাই সব বাইরের কাজ করে। আজ বাসে দেখলাম মেয়ে-কণ্ডাক্টর, যা' অন্যত্র আর কোথাও দেখিনি। একটু পরেই কয়েকটা লোক এসে বললে, 'ফোটো তুলবো ৫ শিলিংএ।' আমি কিছুতেই তুলবো না, স্বামী কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করলেন। ফ্লাশ-লাইটে এক সেকেণ্ডে কী যে করলে জানি না। বল্‌লে 'ফোটো যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব আপনাদের ঠিকানায়।' মিস্টার জৈনরা এলেন। এদের নাচ গান আরম্ভ হ'ল। সেই একই টাইপের। মাঝে মাঝে কমিক্ বা ক্যারিকেচার ইত্যাদি হচ্ছিল। এদের সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট খুব জম্‌কালো। নাচই বেশির ভাগ এবং সেই সঙ্গে উৎকট চিৎকারে গান। রাত বারোটায় শেষ হ'ল, আমরা হোটেলে ফিরলাম হেঁটেই।

বৃহস্পতিবার, ১৬ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

আজ স্নান ক'রে নিলাম। সে এক পর্ব। দুপুরে মাদাম টুশো-র এগ্‌জিবিশনে গেলাম। এখান থেকে অনেকটা দূর। বেকার স্ট্রিটে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে বেলা তিনটায় টিকিট কাটা হ'ল। এইটিই লণ্ডনে একটা দেখবার মত জিনিস। চমৎকার করেছে। দোতালায় উঠেই আগে দেখা গেল, রাজ-পরিবারবর্গ সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা, রানী, তাঁর মা, মেয়েরা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ, বোন ইত্যাদি। যে যে-রকম, ঠিক সেই পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অবিকল চেহারা। তারপর রাজ-সৈন্যরা, রাজ-মন্ত্রীরা, বড় বড় বিখ্যাত লোকেরা। অন্যঘরে পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা। তার মধ্যে আমাদের গান্ধীজী ও আছেন। তারপরে একটি ঘরে আমেরিকান প্রেসি-ডেণ্ট গ্রুপ্ বসেছেন কাজ করতে। মনে হয়না এগুলি মোমের মূর্তি, যেন সব জ্যান্ত মানুষ ব'সে আছেন। আর একটি ঘরে ডোমিনিয়ন প্রাইম-মিনিস্টার্‌স্। তার মধ্যে আমাদের দেশের জওহরলালজী এবং কায়দে আজম্ জিন্নাও আছেন। দোতলা তেতলা দেখে তো পা ব্যথা হয়ে



মাদাম টুশো-র প্রদর্শনীতে
কুইন্ মেরির মোমের প্রতিমূর্তি

যায়। মাঝে মাঝে বসার জায়গা থাকায় সবাই ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছে। ভূগর্ভে বৃটিশ ঐতিহাসিক কতকগুলি দ্রষ্টব্য সামগ্রী আছে, নিচে নেমে সেটার জন্য আর একটি টিকিট ক'রে ঢোকা গেল। এটির নাম 'হরর্ চেম্বার্'। কোন্ কোন্ লোকের কি কারণে ফাঁসি হয় লিখে রেখেছে এবং তাদের মূর্তি তৈরি ক'রে রেখেছে। আগেকার দিনে কি রকম ক'রে বিচার করা হ'ত এবং শাস্তি দেওয়া হ'ত তাও দেখানো আছে। মিউজিয়ম দেখে ছ'টার পর ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে ফেরা হ'ল। চা খেয়েই উনি আবার বেরুলেন আমাদের পরিচিতা একটি অসুস্থা মহিলার খোঁজ নিতে।

আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। বেশ শীত ক'রছে। তবে এসে পর্যন্ত বৃষ্টি পাইনি। এদেশের লোকেরা তো বলছে অসম্ভব গরম পড়েছে হঠাৎ।

আমরা শীঘ্রই নিউইয়র্ক যাচ্ছি, যে শোনে, সে-ই বলে —'ওঃ, তোমরা কী ভাগ্যবান, আমেরিকা দেখতে পাবে, সে তো একটা অপূর্ব দেশ।' জানিনা সে কী স্বর্গরাজ্য দেখবো! আমার স্বামী আবার ভ্রমণ-তালিকায় সুইডেন্ স্কট্ল্যাণ্ড ইত্যাদি বাড়িয়ে দিলেন। জানি না শেষপর্যন্ত পেরে ওঠা যাবে কিনা।

এখানে এখনও বড় বড় বাড়ি ও কয়েকটা গির্জা বোমাবিধ্বস্ত ভগ্নদশায় প'ড়ে আছে। শুনলাম বহু বাড়ি আবার নতুন ক'রে তৈরি হ'য়েছে এবং মেরামত হ'য়েছে। যুদ্ধের চিহ্ন এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি। বর্তমান শ্রমিক গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের পর শতকরা পঁচিশভাগ ট্যাক্স্ বাড়িয়েছেন ঋণ শোধের জন্য। একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত, সকলেই বেশ হাসিমুখে

সমস্ত সহ্য করছে। কোন দুঃখ নেই। বলে—'এমন অবস্থা তো ছিল না আমাদের আগে, আবার পরে এটা থাকবেও না।' সেদিন অক্স্‌ফোর্ড্‌ যাওয়ার পথে যে-ভদ্রলোক সঙ্গে গাইড্‌ ছিলেন, তিনি আমার স্বামীর পাশে ব'সে গল্প করছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করছিলেন ভারতবর্ষের কতটা অংশ পাকিস্তানে গেল, ইত্যাদি। শেষে বলছিলেন,—"তোমরা লণ্ডনে এসেছ, কোহিনূরটা দেখো, সেটা একটা দেখার মত জিনিস।" আমার স্বামী বললেন, "নিশ্চয়ই। সেটা তো দেখে যাবই। কারণ, সেটা এক সময়ে আমাদেরই ছিল।" লোকটি হেঁ হেঁ ক'রে একটু দেঁতো হাসি হাসলেন।

সেদিন এদের আর্টগ্যালারি দেখলাম। সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু এবং পেন্টিং—তার অধিকাংশই প্যারিসের। এখন বোঝা গেল সেদিন ভার্সাইতে গাইড্‌ কেন বলছিল—'উড়ে গেছে।'

শুক্রবার, ১২ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন॥

আজ সকাল বেলায় আমরা ব্রাইটনে বেড়াতে চ'লে গিয়েছিলাম, ফিরেছি রাত্রি দশটায়।

সকাল বেলায় ছুটোছুটি ক'রে বাস্‌স্ট্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছুলাম, কিন্তু কত নম্বর বাস্‌ ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যায় জানা না থাকায়, একে-ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, স্ট্যাণ্ডে বাস্‌ আর আসেই না সেই নম্বরের। ট্রেন-টাইমের আর ১৫ মিনিট মাত্র বাকি আছে দেখে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ক'রে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যাওয়া হ'ল। ট্রেনে ব'সে তখন নিশ্চিন্ত। এই ট্রেনের পরেও চারটে ট্রেন ব্রাইটন্‌ যায়, কিন্তু এই গাড়িটি নন্‌-স্টপ, ঠিক একঘণ্টা দশ মিনিট লাগে পৌঁছুতে।

ব্রাইটন্ এখান থেকে ৫৮ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি শহর। ব্রাইটন্ যেতে পথের ছোট ছোট গ্রামগুলি খুব সুন্দর দেখায়। প্রায় বেলা দশটায় ব্রাইটনে পৌঁছে সেখান থেকে বাসে চ'ড়ে আমরা সমুদ্রতীরে গেলাম,



ব্রাইটনে — ইস্টবোর্ন

স্টেশন থেকে খুবই কাছে। আজ যদিও ছুটির দিন নয়, তবুও বেশ লোকের ভিড় সমুদ্রের ধারে। এরা সব জায়গাই সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে। অসংখ্য ঈজিচেয়ার পাতা, যার যেমন ইচ্ছা, (দূরে ও কাছে) জলের ধারে ব'সে আছে। সমুদ্রের কূল-কিনারা নেই। সুন্দর লাগছিল। কিন্তু পুরীর সমুদ্রের মত এর রূপ নয়। জলের রং একটু ঘোলাটে ও বেশ শান্ত, কোনও গর্জন নেই, ঢেউগুলি আস্তে আস্তে আসছে। সমুদ্রতীরে শেডের তলায় দোকান—চা, কফি, আইসক্রিম্, খেলনা ইত্যাদির। বালক বালিকা শিশুরা ঠেলাঠেলি ভিড় ক'রে নানা দ্রব্য কিনছে মহা-আনন্দে। আমরা

সমুদ্রের কাছে খানিকটা বেড়িয়ে এবং ফোটো তুলে উপরে এলাম। দেখি নানান্ তামাসার ঘর। কেউ এক মিনিটে ফোটো তোলাচ্ছে, কেউ এক শিলিং দিয়ে গান শুনছে ইত্যাদি। আমরা ১টি ক'রে শিলিং ফেলে ১ মিনিটে ফোটো নিলাম। সে যা' ফোটোর শ্রী — ভূতের মতন। তারপর Aquarium-এ ঢুকলাম টিকিট কেটে। কত দেশের মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ, ব্যাং, কুমির ইত্যাদি রয়েছে। কাচের ছোট বড় ঘর বানিয়ে জলের মধ্যে এইগুলিকে রাখা হয়েছে এবং ইলেকট্রিসিটি দিয়ে জলকে স্রোতশীল ক'রে রেখেছে সদাসর্বদা। আমাদের দেশের মাছও আছে। আর সব অদ্ভুত অদ্ভুত আকারের মাছ। একটি লালমোহন রয়েছে, তার বয়স ১২৫ বৎসর।

বেলা একটার পর আমরা কাছাকাছি একটা রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। লণ্ডনের তুলনায় এখানে খাবারের দাম অনেক কম। লাঞ্চ খেয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়াচ্ছি, দেখি সেখানে এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়ার অফিসে সবাই টিকিট করছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল—দু'তিন রকমের টিকিট আছে, যে যে-রকম ইচ্ছা নিচ্ছে। আমরা আড়াইটা থেকে সাড়ে ছটার ট্রিপের টিকিট কিনলাম। সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে এখান থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে South Dawn পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং আসার সময়ে অন্য রাস্তায় ফিরে ব্রাইটন্ শহরটি ঘুরিয়ে এখানে নামাবে।

তখনও দু'টো বাজে নি দেখে আমরা দু'খানি ঈজিচেয়ার নিয়ে ব'সে ব'সে এদের স্নান এবং শিশুদের খেলা দেখতে লাগলাম। প্রতিটি চেয়ারের ভাড়া তিন পেনি। বেলা

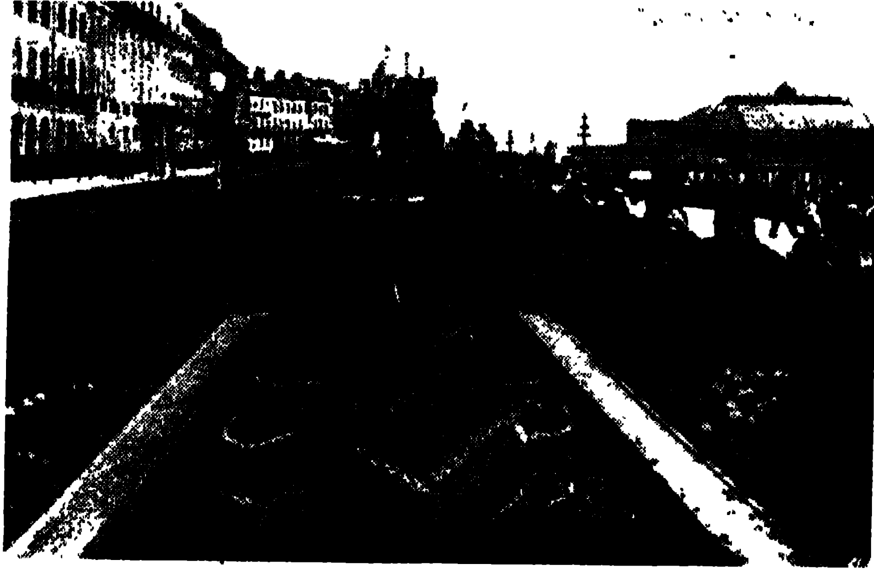
আড়াইটায় বাসে চ'ড়ে যাত্রা ক'রলাম। ব্রাইটন্ শহরটি সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, মাঝে মাঝে ফুলের বেড্-করা বাগান, ভারি চমৎকার। প্রায় চারটের সময় বাস্ Beachy-head নামে একটি জায়গায় আমাদের নামালে। ব্রাইটন্



বীচিহেড — ইস্টবোর্ন

ছাড়বার পর থেকে সমানে ছোট ছোট পাহাড়ের ধার দিয়ে বাস্ চলছিল। ওখানে একটি লাইটহাউস আছে, সিগ্ন্যালের জন্য। জায়গাটি সমুদ্র ও পাহাড়ে ঘেরা নিস্তব্ধপ্রায়। মিনিট কুড়ি আন্দাজ আমরা সেখানে বেড়ালাম, ছবি তুললাম। আবার সবাইকে তুলে নিয়ে বাস্ চললো। বীচিহেড্ থেকেই সাউথডন্ আরম্ভ। এখানে সমুদ্রের জল বেশ নীল। প্রায় চারটে চল্লিশ মিনিটে আমরা ইস্ট্বোর্ন পৌঁছলাম। ব্রাইটন্ থেকে ৩৬ মাইল দূরে এ একটি ছোট্ট শহর। ড্রাইভার বাস্ রাখার জায়গায় গাড়ি রেখে ব'লে দিলে যাত্রীদলকে, 'সাড়ে পাঁচটায় আবার রওনা হবো, তার আগেই আপনারা ফিরে আসবেন এখানে।'

সকলেই এদিক-সেদিক চললো। আমরা একটু এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে ওখানকার কিছু কার্ড কিনে এবং একটি পশমের দোকানে ঢুকে কয়েকটা বই কিনে চা খেতে ঢুকলাম একটা রেস্টুরেণ্টে। চা খেয়ে বেরিয়ে দেখি ৫টা ১৫ মিনিট। তাড়াতাড়ি চললাম বাস্‌স্ট্যাণ্ডের কাছে। চা খেয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা এলাম যখন, একটি সুন্দর ফুলবাগান দেখে ঢুকলাম ; শুনলাম, সেটি সব লোকেই দেখতে আসে, তার নাম 'কার্পেট গার্ডেন'। সত্যিই কার্পেটের মত একটি একটি ফুলের



কার্পেট গার্ডেন

বেড্ করেছে নানা রংয়ের। মাঝে মাঝে ফোয়ারা দিয়েছে। ওখানেও ছবি নেওয়া হ'ল। ঠিক সাড়ে ছ'টায় ব্রাইটনে পৌঁছলাম। ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আমরা স্টেশনে গেলাম এবং ৭টা ২৫ মিনিটের ট্রেন ধ'রে ৮টা ৩৫ মিনিটে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সামনেই বাস্‌স্ট্যাণ্ড— পিকাডিলি সার্কাসের বাসে ক'রে এসে নামলাম

পিকাডিলিতে এবং সোজা 'দিলদার রেস্টুরেন্টে' গিয়ে খেয়ে নিয়ে একেবারে হোটেলে ফিরলাম।

শনিবার, ১৮ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন ॥

সকালের দিকে রিজেন্ট্ স্ট্রিটে একটি Woolworth-এর দোকানে যাওয়া হ'ল। এটি একটি এমন দোকান যে, পৃথিবীর যাবতীয় খুঁটিনাটি এখানে সব থাকে। আবার সাজসজ্জা, খেলনা, পুতুল, পোষাকপত্র ইত্যাদিও আছে। এক কথায়—'সব-কিছু মেলে।' এইরকম একটি ক'রে দোকান প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই নাকি আছে। সেখানে ঢুকে প'ড়ে যেদিকেই যাই, মাথার ঠিক থাকেনা—কি নেবো আর কি নেবো না।

শনিবার, প্রায় একটা বাজে, দোকান বন্ধ হবার সময় হয়েছে দেখে স্বামী রাগ করায় তখন দোকান থেকে বেরুলাম। খেল্না, ক্লিপ্, অ্যাপ্রন, উলের বই, বোনার সরঞ্জাম ইত্যাদি বেশ কেনা হ'য়েছে। ওখান থেকে বাস্ ধ'রে হোটেলের কাছে Hay market-এ নামলাম। স্বামী হোটেলের উপরে উঠে গিয়ে সওদার জিনিসপত্র সব রেখে এলেন, তারপর দু'জনে হোটেলে খেয়ে ২টা ১০ মিনিটে ঘরে ফিরলাম। বেলা চারটে নাগাদ আবার সাজসজ্জা ক'রে বেরিয়ে আজ হেঁটে হাইড পার্কের কোণ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কতই সুন্দর সুন্দর দোকান আর সুন্দর সুন্দর জিনিস যে দেখলাম! দোকান সবই বন্ধ, আজ শনিবার। জিনিসপত্র কিন্তু সমস্তই কাচের শো-কেসের মধ্যে সাজানো রয়েছে। এদেশে বেড়ানো মানেই ভিড় ক'রে শো-কেসে জিনিস দেখে বেড়ানো। হাইড পার্ক কর্নার অবধি গিয়ে আমি আর নড়তে পারি না। কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে

চা খেয়ে নিলাম দু'জনে। চা খেয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকে দু'টি চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলাম আর লোক দেখতে লাগলাম। একে শনিবার, তার উপর আবার এত রোদ, পার্কে লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সারবন্দী চেয়ার নিয়ে ব'সে আছে মাটিতে, ঘাসের উপরও সব শুয়ে, ব'সে আছে। আমরা বসার একটু বাদেই টিকিটচেকার্ এসে দু'খানি টিকিট দিয়ে গেল এবং চার পেনি নিয়ে গেল চেয়ারের ভাড়া বাবদ। সাড়ে সাতটায় উঠে আমরা বাসে চড়লাম এবং বাস্‌খানি লণ্ডন ব্রীজ পর্যন্ত যায় শুনে উনি টার্মিনাস লণ্ডন ব্রীজ পর্যন্ত টিকিট কাটলেন। এদিকটা ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ হয়ে আছে এখনো। দু'পাশে বাড়ি, অফিস, গির্জা, সবই বোমা-বিধ্বস্ত ভগ্নদশায় রয়েছে। রাস্তাগুলি মোটামুটি সংস্কার করা হয়েছে। লণ্ডন শহরের মধ্যেও যুদ্ধের ভয়াবহ বোমাবর্ষণের চিহ্ন বহন ক'রে অনেক বাড়িঘর ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এদিকটাতে বেশি বোমা বর্ষণ হয়েছিল। এক-একটা দিকে নতুন বাড়িঘর তৈরি ক'রে সাজিয়েও ফেলেছে দেখা গেল।

রবিবার, ১৯ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন ॥

আজ আর আমি সকালের দিকে মোটেই বেরুই নি। পূর্ণ বিশ্রাম নিয়েছি। ব্রেকফাস্টের পর চুপচাপ শুয়ে থেকেছি।

কাল শনিবার ছিল। একটা-র সময় সব ছুটি। বিকেলের দিকে থিয়েটার বায়স্কোপের সামনে দিয়ে হাঁটা দায়, এত অসম্ভব ভিড়। এরা সবেতেই কিউ দেয়, বাসে-ওঠার কিউ, টিকিট-কেনার কিউ, দোকানে জিনিস-কেনার কিউ ; এমন কি, 'টয়লেট'-এ যাচ্ছে, তাতেও কিউ। এটা বোধহয় এদের

অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পথের মধ্যে কিছুদূর অন্তর অন্তর মেয়েদের এবং ছেলেদের পৃথক পৃথক 'টয়লেট' (প্রস্রাবাগার) আছে, কোনও কোনও রেস্টুরেন্টের ভিতরেও আছে। অধিকাংশ জায়গাতেই একটি ক'রে পেনি দিয়ে তবে বাথরুমে ঢোকা যায়। সেইজন্য সর্বদা ব্যাগে পেনি রাখতে হয়।

এদেশে সিল্ক ইত্যাদির দাম আমাদের দেশের তুলনায় বেশি। জিনিসপত্র যা-যা আছে, দেখে মনে হয়, সব নিয়ে যাই। কাচের ও সেলুলয়েডের জিনিসগুলি চমৎকার।

আজ তিনটের পর বেড়াতে গেলাম 'জ়্যু'-গার্ডেনে। লণ্ডনে তিনটি 'জ়্যু' আছে। আজ একটি দেখেই পা ব্যথা হয়ে গেছে। বহু বাঘ সিংহ হাতি গণ্ডার ইত্যাদি পশু আছে, তবে আমরা বাঘ সিংহ হাতির দেশেরই মানুষ, আমাদের চোখে এরা কিছু নতুন দ্রষ্টব্য নয়। পাখি সাপ প্রভৃতিও দেখলাম অনেক। এক শিলিং দিয়ে মৎস্যশালায় ঢুকে অদ্ভুত অদ্ভুত মাছও দেখা হ'ল। নতুনের মধ্যে দেখলাম অদৃষ্টপূর্বজীব — অক্টোপাস। বিভিন্ন বইতে ও ছবিতে এর চেহারা দেখা এবং আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা পড়া ছাড়া সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ইতিপূর্বে ঘটেনি। শুনলাম, বহু লোকেরই অদেখা এই জীবটি দুর্লভ জীব-সংগ্রহ হিসাবে একমাত্র লণ্ডন-পশুশালাকেই গৌরবান্বিত ক'রে অবস্থান করছেন, অন্যত্র আর কোনও দেশের পশুশালায় এই জীবটি নেই।

সাড়ে ছ'টায় 'জ়্যু' থেকে বেরিয়ে কিউ ক'রে বাসে উঠতে হ'ল ; অর্থাৎ কিউ-নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীবদ্ধ যাত্রীদের পরের পর তুলে নিয়ে একে একে তিনখানি বাস্ অন্তর্হিত হওয়ার পর আমরা চতুর্থ বাস্খানিতে স্থান পেলাম যথাক্রম অনুসারে।

বেকার স্ট্রিটে বাস থেকে নেমে ভূগর্ভে টিউব ধ'রে আমরা Hay marketএ এসে উঠলাম। হোটেলে ফিরে চা কেক খেয়ে সুস্থ হওয়া গেল। সাড়ে আটটায় 'দিলদার রেস্টুরেণ্টে' গিয়ে সাড়ে ন'টার পর হোটেলে ফিরলাম।

সোমবার, ২০ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন।

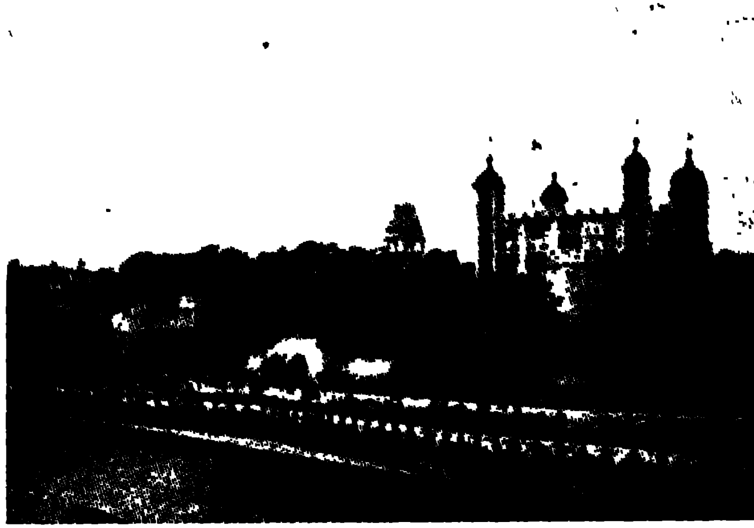
সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেজেগুজে বেরুতেই সাড়ে ন'টা বেজে যায়। ছুটোছুটি ক'রে এক্সকারশন্‌-বাসে ওঠা গেল। প্রথমে Hay market-এর মধ্য দিয়ে Marylebone Street-এ পড়লো। সেখান থেকে পিকাডিলি সার্কাস্‌,



টাওয়ার ব্রীজ

Aldwych, Strand, Fleet Street, Cannon Street, London Bridgeএ পড়লো। এর পর থেকে যে-সমস্ত রাস্তা পড়লো, তার দু'পাশের বাড়িঘর একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর পরে Tooley Street, Tower

Bridgeএ গিয়ে নামালো এবং সেখানে London Towerএ নিয়ে গিয়ে টিকিট কেটে ঢোকালে। টাওয়ারের মুখেই সৈন্যরা টহল দিচ্ছে এবং মধ্যে ঢুকে দেখলাম, লাল কালো ইউনিফর্ম পরিহিত এক একটি সৈন্যাধ্যক্ষ এক একটি ফটক



লণ্ডন টাওয়ার

রক্ষা করছে। টাওয়ারটি একটি দুর্গের মত। বহু শতাব্দী আগে বৃটেনের রাজারা এইখানেই বাস করতেন, এখন এখানে বৃটিশের কোষাগার এবং অস্ত্রাগার সংরক্ষিত আছে। কোষাগারে রাজারানীদের যত সব বহুমূল্য পোষাক, সাজসজ্জা, অলঙ্কার, মুকুট, সোনার আসবাব, সোনার বাসনপত্র ইত্যাদি রয়েছে। রানীদের মুকুট প্রায় গোটা দশেক আছে! সে-সব মুকুটে হীরা, পান্না, চুণী এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান রত্নরাজি খচিত। তার মধ্যে একটি মুকুট আমাদের দেশের দিল্লির দরবার উপলক্ষ্যে আহরিত হয়ে এদেশে এসেছে। সেই মহামূল্য রত্ন-মুকুটটির মাথা হ'তে বিখ্যাত কোহিনূর হীরকটি খুলে মুকুটটির পাশেই রাখা হয়েছে আলাদা ক'রে এবং লেখা

আছে তার বিবরণ। রানীদের দেখলাম সৌভাগ্যের দুর্ভোগ নেহাৎ কম পোহাতে হয় না, বিশেষ বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে যে-সকল হীরা জহরৎ এবং সোনার সাজসজ্জার ভার অঙ্গে চাপাতে হয়, সেই গুরু বোঝা নিয়ে কি ক'রে নড়াচড়া করেন সেইটাই ভাবনার বিষয়। রাজাদের রাজমুকুটও অনেকগুলি রয়েছে। রাজকুমারদের মুকুটও বড় কম সংখ্যক নয়। কোন্ মুকুটটি কবে কোন্ শতাব্দীতে কোন্ রাজা ব্যবহার করতেন, কোন্ স্বর্ণপাত্রটি কবে কোন্ রাজা ব্যবহার ক'রে গেছেন ইত্যাদির বিবরণী দেওয়া আছে। পৃথিবীতে একযুগের এই সকল স্মারকসামগ্রী পরবর্তী কালের মানুষেরা কতই না সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দর্শন ক'রে যান। কুটিল কালচক্রের এমনই আশ্চর্য পরিবর্তন, আজকের যুগে এই রত্নমুকুট ও স্বর্ণপাত্রগুলি মানুষের হৃদয়ে কৌতূহল ছাড়া বিরাট সম্ভ্রম বা গভীর শ্রদ্ধার কিছুমাত্রই উদ্রেক করে না।

আর একধারে দেখা গেল, কোন্ কোন্ টাইটেল্ পেলে তার চিহ্ন হিসাবে কিরকম আকৃতির ব্যাজ দেওয়া হয় এবং কি কি উপহার সামগ্রী দান করা হয়। তারপর আমাদের নিয়ে গেল অস্ত্রাগার দেখাবার জন্য। অস্ত্রাগারটি পাঁচতলা পর্যন্ত প্রসারিত। রাজপরিবারদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, চর্ম একটি বিভাগে সংরক্ষিত, অন্যান্য বিভাগে কত রকমই যে অস্ত্র-শস্ত্র তার আর ইয়ত্তা মেলে না। দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। একটি ঘরের ভিতরে দেখালো, প্রাচীনকালে কেমন ক'রে বিদ্রোহীদের দ্বিখণ্ডিত ক'রে হত্যা করা হ'ত। যে-কাঠের উপর মাথা রেখে কুড়ুল দিয়ে মুণ্ড কেটে ফেলা হ'ত, সেটি পর্যন্ত রয়েছে। ওখানে একটা কোম্পানী ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে,

আমাদেরও নিলে। শুনলাম, তারা সংবাদপত্রে মুদ্রিত করার জন্যই এত ফোটো তুলছে, যদি ছবি ভাল ওঠে, কাগজে মুদ্রিত হবে। স্বামী ঠিকানা দিলেন, যদি ছবি ভাল হয় এবং কাগজে ছাপা হয় তাহলে এক কপি যেন আমাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। টাওয়ার থেকে বেরুতেই আমাদের বারোটা বেজে গেল। সেখান থেকে টাওয়ার-হল দিয়ে Cheapside হয়ে আমরা সেণ্ট্ পল্স্ ক্যাথিড্রালে এলাম। সেখানেও নেমে আধঘণ্টা



সেণ্ট্ পলস্ ক্যাথিড্রাল — লণ্ডন

তার ভিতরে ঘুরে, অন্য রাস্তা দিয়ে এসে Hay marketএ পৌঁছলাম। একটা বেজে গেছে দেখে একেবারে খেয়ে নিয়ে হোটেলে উঠলাম। আবার তু'টোর সময় বেরিয়ে ছ'টা পর্যন্ত ঘুরেছি দোকানে-দোকানে। আমার মেয়ের জন্য একটি ফ্রক ৫৩ শিলিং (ভারতীয় মুদ্রায়, সিকি কম চল্লিশ টাকা) দিয়ে কিনলাম। অন্যান্য টুকিটাকি কিনে ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে

ফিরলাম। হোটেলে এসে চা খেয়ে স্বামী প্রস্তাব করলেন — 'চলো আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক্। মাত্র একদিন ত 'ক্যাসিনো'তে যাওয়া হয়েছে।'

স্বামী গেলেন টিকিট কাটতে, আমি শাড়ি বদ্‌লে প্রস্তুত হ'তে লাগলাম। সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে ডিনার খেয়ে নিয়ে ঠিক আটটায় আমরা 'ক্যাসিনো'তে ঢুকলাম। সাড়ে দশটায় তাদের রঙ্গাভিনয় সাঙ্গ হ'ল। সেই একবার ক'রে নৃত্য, একবার কমিক্ বা হাস্যরসাভিনয় অথবা ক্যারিকেচার বা ব্যঙ্গাভিনয়, কিছু-বা সার্কাসের খেলা। এদের এই অর্দ্ধনগ্ন নাচ আমার তো বিশেষ ভাল লাগে না। একটি নাচ দেখলাম, একেবারে আমাদের দেশের শিবনৃত্যের মতই। সাজপোষাকও শিবনৃত্যেরই ধরনের করেছে।

মঙ্গলবার, ২১ জুন ১৯৪৯। লণ্ডন ॥

কাল ভোরে লণ্ডন ছেড়ে চ'লে যাবো আমরা। বেলা বারোটার পর বেরিয়ে খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে একটা বাজতেই লাঞ্চ খেতে ঢুকে পড়া গেল। ভাত, মাছের ঝোল, রসগোল্লা, পায়েস আজ খেয়ে নিলাম। আবার কতদিন ওদের দেশে মিলবে না এসব খাবার। খেয়ে উঠে বাসে চ'ড়ে অক্স্‌ফোর্ড্ স্ট্রিটে গিয়ে নামলাম। সেখানে কয়েকটি দোকানে ঘুরে আমার দু'একটি নিজের প্রয়োজনীয় পোষাক কিনে সাড়ে পাঁচটার সময় চা খেতে গেলাম। চার পেয়ালা চা, চার টুকরো রুটি, চারখানি কেক — দুই শিলিং নয় পেন্স বিল্ পাওয়া গেল।

চা খেয়ে একটা বাসে চড়ে সেটা যতদূর যায় তত দূরের

টিকিট কেটে বসলুম। সে-বাস্‌টি ফিন্‌সবারি পার্ক হ'য়ে শহর ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। ছ'পাশে অনেক বোমাবিধ্বস্ত ভাঙা-বাড়ি দেখলাম। সেখানে নেমে খানিকটা ঘুরে আবার অন্য একটি বাস্ ধ'রে আমরা লিস্টার স্কোয়ারে এসে নামলাম প্রায় ন'টায়। ঐখানেই 'দিল্‌দার রেস্টুরেন্ট্'।

আজ সকালে বঙ্গের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শিবপদ ব্যানার্জীর ছ'টি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। অল্পবয়সী ছেলে ছ'টি। বড় ছেলেটির বয়স ১৮।১৯ এবং ছোটটির বছর ১৬।১৭ হবে। ওদেরই অফিসার একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোকের সঙ্গে ছুই ভাই ইয়োরোপে বেড়াতে এসেছে। এখানে সমস্তটা ঘুরে ওরা কাল সকালে আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে প্যারিস যাবে। ছেলে ছুটি বেশ শান্ত, শিক্ষিত এবং ভদ্র।

আমরা চট্‌পট্ কাজ শেষ ক'রে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছি, কারণ, কাল সকালে উঠে সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে সাড়ে আটটায় বেরুতে হবে। এমন সময়ে স্বামী ট্র্যাভেলার চেক্-বইগুলি গুছাতে গুছাতে বলে উঠলেন — 'একটা চেক্‌বই কম কেন? আমার ব্যাগে নেই, কোথাও নেই, গেল কোথায়? আবার পাওয়া যাচ্ছে না আমেরিকান্ ডলারের চেক্ বইটাই।' ৭০০ ডলারের চেক্‌বইটা পাওয়া যাচ্ছে না। কাল যাত্রা করবো আমেরিকা, আজই গেল ডলারের চেক্‌বই হারিয়ে? কী সর্বনাশ! ছুজনে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মতই অবস্থা। ছ'জনের ছ'টিমাত্র স্যুটকেস্ ছাড়া অন্য কোনও মালপত্র নেই। ছ'টি স্যুটকেসই তিনবার ক'রে উজাড় ক'রে নামিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে খুঁজে দেখা গেল — কোথাও নেই। শোবার ঘর এবং বসার ঘর ছুখানি তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল

সমস্ত জায়গায়, কুত্রাপি কোনও চিহ্ন নেই ডলার মুদ্রাদায়িনী ব্যাঙ্ক-পুস্তিকার।

আমি প্রশ্ন করলাম — 'কী হবে এখন ?'

স্বামী উত্তর দিলেন — 'কালই গিয়ে আমেরিকান্ এক্সপ্রেস কোম্পানীতে খবর দিতে হবে। সমস্ত চেক নম্বর আমার কাছে টোকা আছে। কিন্তু আবার নতুন চেক্‌বই আসতে তো সময় লাগবে। ভাগ্যে সুইস ফ্রাঙ্ক বাঁচিয়ে কিছু নগদ ডলার ক'রে নেওয়া গেছে। এখন সেইটুকুই সম্বল।'

আমি তো আতঙ্কে উদ্বেগে কাঠ হ'য়ে বসে আছি। হায়, এত কাণ্ড ক'রে দেড়মাস ধরে অতিযত্নে বয়ে এনে যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তেই হারিয়ে গেল ?

স্বামী বললেন — 'যা হবার হয়েছে। শুয়ে পড়ি চলো, রাত্রি বারোটা বাজে। আর জাগা ঠিক হবে না। কাল ভোরে উঠতে হবে। মন খারাপ ক'রে কোনও ফল নেই।'

উঠে শাড়ি ব্লাউজ বদ্‌লে শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, স্বামী স্যুটকেস দুটি চাবি বন্ধ ক'রে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। এমন সময়ে দেখা গেল ওঁর স্যুটকেসটির তলায় মেঝেয় কার্পেটের ভিতর অ্যামেরিকান্ ডলারের চেক্‌বইখানি রয়েছে। তখন সে যে কী আনন্দ আমাদের হারানিধি ফিরে পাওয়ার খুশিতে। আমার যেন তখন ধড়ে প্রাণ এলো এবং দেহেও বল এলো। রাত্রে নির্ভাবনায় ঘুমোলাম ভাল ক'রে।

নিউইয়র্কে

বুধবার, ২২ জুন ১৯৪৯। B. E .A. প্লেনে ॥

সকাল সাড়ে আটটায় Airways Hotel থেকে ট্যাক্সি ক'রে "কেন্‌সিংটন"-এ B. E. A. কোম্পানীর হেড্ কোয়ার্টার্সে



বিমানে ওঠা

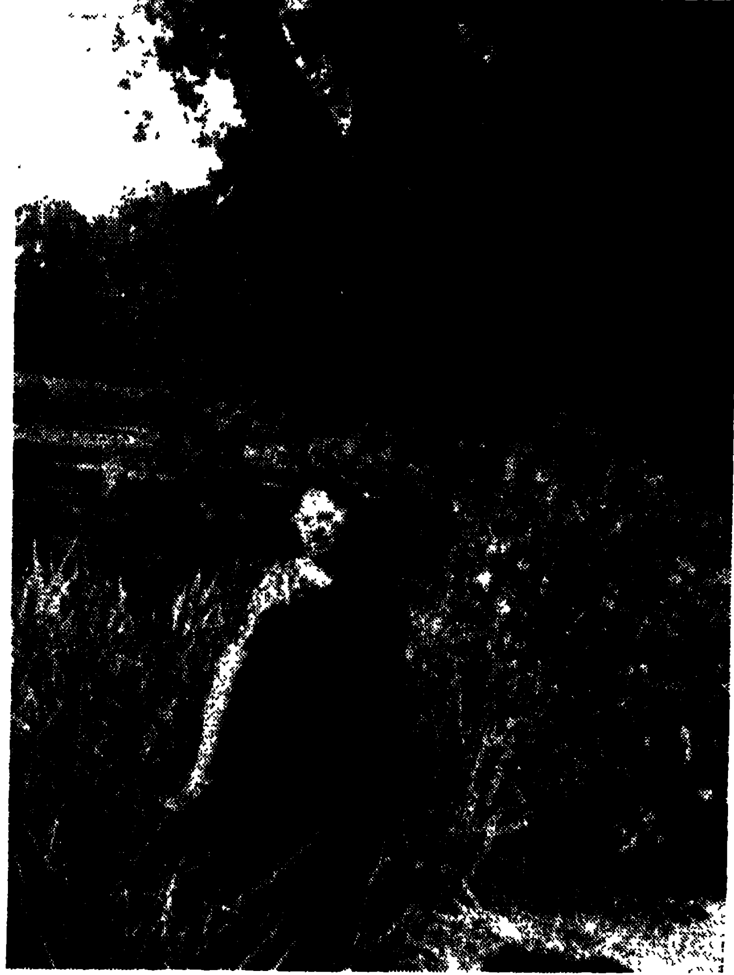
আসা গেল। মালপত্র ওজন ক'রে মিনিট পনেরো বসতে হ'ল। মিস্টার ব্যানার্জীর ছেলে দু'টি ও আমরা একত্রে বাসে

উঠলাম। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে 'নর্থ হল্ট' Airportএ পৌঁছানো গেল। কাস্টম্‌স্‌, পাসপোর্ট্‌, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (ওরা বলে স্যানিটারি) সমস্ত চুকিয়ে ওদের ড্রয়িংরূমে বসলাম। মিনিট কুড়ি বাদে প্যারিস যাত্রীদের প্লেনে ওঠার জন্য ডাক পড়লো। দৌড়ে দৌড়ে গেলাম আগে ওঠবার জন্য, কারণ আগে যারা ওঠে, তারাই পায় ভালো সীট। কিন্তু ওদেশের মানুষের সঙ্গে দৌড়ে আমি কি পারি? শেষে আমার স্বামী চট্‌পট্‌ উঠে প'ড়ে ছু'টো পছন্দসই সীট্‌ দখল ক'রে রাখলেন, আমি পরে এসে উঠে সীট্‌ অধিকার করলাম। দশ পনেরো মিনিট ধ'রে গর্জন ক'রে প্লেন ঘুরে ঘুরে উঠলো উপরে — তখন ১০টা ৩৫ মিনিট। ওঠার সময় ঈষৎ ঝাঁকুনি লাগলেও ভারি সুন্দর দেখতে লাগছিল। লণ্ডন শহরটি যেন একখানি ফ্রেমে আঁটা ছবি। বাড়িঘর, রাস্তা, বাগানগুলি সবুজ গালিচার মত। একটু পরেই কিন্তু ফগে সমস্ত ঢেকে গেল। ১১টা বাজতে কফি ও ছোট বাক্সে চারখানি হাণ্ট্‌লি পামার বিস্কুট ও চকোলেট দিয়ে গেল। এখন আমরা ৫৫০০ ফীট্‌ উঁচুতে যাচ্ছি ঘণ্টায় ২০৮ মাইল গতিবেগে।

ইংলিশ চ্যানেল্‌ পার হচ্ছি। সমুদ্রের জল ও আকাশের মেঘে একাকার হয়ে গেছে। খুব রোদ, সেইজন্য আকাশ পরিষ্কার, নীল। চমৎকার দেখাচ্ছে চারিদিক। চ্যানেল্‌ পার হতে ৩০।৩৫ মিনিট সময় লাগলো। মাটির বুকে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট খেলাঘরের মত। ফ্রান্স-এর উপর দিয়ে এখন চলেছি প্যারিসের উদ্দেশে। এখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আজই আমরা বিকেল ছ'টায় T. W. A. প্লেনে নিউইয়র্ক রওনা হবো।

বিকেল ৭টা। T. W. A প্লেনে॥

বারোটায় প্যারিস পৌঁছে কাস্টম্‌স্‌ পুলিশ সেরে এয়ার কোম্পানীর বাসে ক'রে 'ইন্‌ভ্যালিডে' পৌঁছুলাম বেলা ১টায়। ব্যানার্জীর ছেলেরা আমাদের কার্ড নিলে ও অনেক ক'রে ওদের

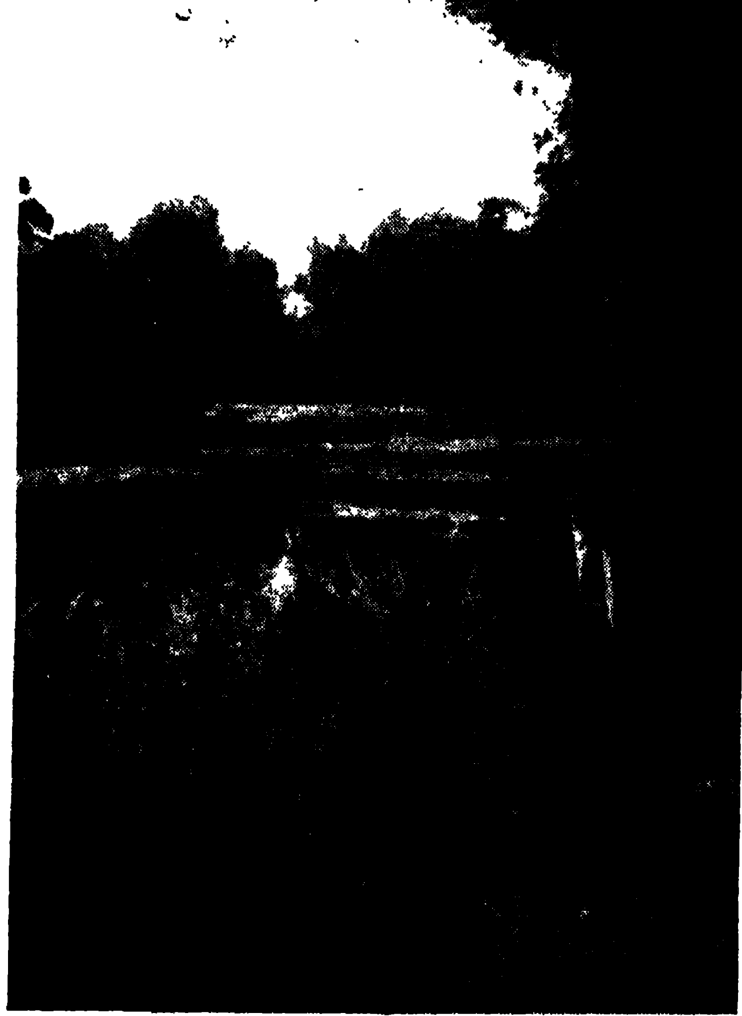


বোয়া দে বুলোঁ — প্যারিস

বোম্বায়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বললে। তারা বললে, 'বোম্বেতে আমরা আপনাদের গাইড্‌ হ'য়ে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবো।'

কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাওয়া গেল। খেয়ে আমরা বেরুলাম ১টা ৪৫ মিনিটে। খানিকক্ষণ নেপোলিয়ঁর

সমাধির কাছে, খানিকক্ষণ 'বোয়া দে বুলোঁ' বেড়িয়ে তিনটে ১০ মিনিটে আবার ইন্‌ভ্যালিডে এলাম। লণ্ডন থেকে এসে আজ প্যারিসের রাস্তাগুলো এবং সাজানো বৃক্ষের এ্যাভিনিউ



বোয়া দে বুলোঁ — প্যারিস

বড় সুন্দর লাগছে। নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ বসার পরই আমাদের ডাক দিলে। ঠিক ৪টার সময় বাস ছাড়লো। এবার কিন্তু অন্য এরোড্রোম Orly Fieldএ এলাম। এটা আরও প্রকাণ্ড, সুন্দর সাজানো।

এবার আমরা মোটে ২৪।২৫ জন যাত্রী নিউইয়র্কের। মস্ত বড় প্লেন, যার যেখানে পছন্দ, খুশিমত বসা হ'ল সব। ঠিক ৬টার সময় গম্ভীর গর্জন ক'রে চক্রায়িত হয়ে বিরাট বিমানপোত আকাশে উঠে পড়লো। স্টুয়ার্ড এসে ব'লে গেল, ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট বাদে আমরা স্যানন্ পৌঁছবো এবং সেখানে নামবো। সাড়ে ছ'টার সময় আবার সেই সুন্দর ট্রেতে খোপ খোপ্ করা বাটি গ্লাস ইত্যাদি বসিয়ে খেতে দিয়ে গেল। রুটি, মাখন, চা, ফল, স্যালাড্ ইত্যাদি।

প্যারিস ছাড়িয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছি। চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উপরে আকাশ, নিচে নীল সমুদ্র, একখানা জাহাজ যাচ্ছে দূরে, দেখা যাচ্ছে।

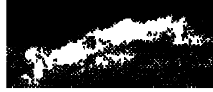
রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটে আমরা স্যাননে নামলাম। সেখানে ৪৫ মিনিট থেকে আবার ছাড়লো প্লেন। ব'লে দিলে, এবার ১০ ঘণ্টার রাস্তা। একেবারে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে গিয়ে কাল সকালে ৪টা ৪৫ মিনিটে থামবে। এখন ৮৫০০ ফীট্ উপর দিয়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল গতিবেগে প্লেন চলেছে।

সামনের সীটে এক মার্কিন-মহিলা এবং তাঁর ছেলে চলেছেন। ছেলেটি কিশোর বয়স্ক, আমাদের বড় ছেলে অশোকের বয়সী মনে হয়। প্যারিসে পড়াশুনা করে, নিউইয়র্কে বাড়িতে যাচ্ছে। স্যাননে ওর মা আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ছেলেটি স্যাননে ওর মায়ের সঙ্গে আমারও একটা ফোটো তুলে নিলে। বলেছে, ভাল হ'লে পাঠিয়ে দেবে। ওর মা তো আমার শাড়িতে বারবার হাত দিয়ে দেখছেন এবং বলছেন 'ভারি সুন্দর তোমাদের কাপড়।'

রাত্রি দশটা চল্লিশ মিনিটে সূর্য অস্ত গেলেন কিন্তু এখনও

বেশ দিনের আলো। আমরা স্যানন ছাড়ার পর থেকে অ্যাট-লান্টিকের উপর দিয়ে চলেছি। নীল সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও কিছুই নেই। এগারটা বাজে। স্টুয়ার্ড এসে সবাইকে







অতলান্ত সাগরের উপর

কম্বল বালিশ দিয়ে গেল শোবার জন্য। অনেক যাত্রীই কোট খুলে শোবার তোড়জোড় করছেন। আমার স্বামী স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দিনের আলো আর কতক্ষণ থাকবে?' সে হেসে জবাব দিলে—'আরও ২।১ ঘণ্টা থাকতে পারে।' ক্রমে ১২টা বেজে গেল। বাইরে পরিষ্কার দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। বিমানের ভিতরের কক্ষ পর্দা টেনে বেশ অন্ধকার মত ক'রে দিয়েছে। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যে-সব যাত্রী ঘুমোন নি, তাঁরা সীটের আলো ব্যবহার করছেন।

বৃহস্পতিবার, ২৩ জুন ১৯৪৯। T. W. A. প্লেনে॥

সারারাত আমার ঘুম হয়নি। স্বামী রাত দু'টোর পর থেকে বেশ নিরবচ্ছিন্ন ঘুমিয়েছেন। বিমান মাঝে মাঝে খুব

তুলেছে। রাত একটার পর থেকে দিনের আলো কমেছিল এবং অন্ধকার মত হয়েছিল। বেশ শীত অনুভব করেছি। মাঝরাত্রে আর একটা কম্বল পেড়ে নিয়ে গায়ে দিতে হয়েছে। ভোর ৪টা ১০ মিনিটে আমরা নিউ ফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে নামলাম। সারারাত্রি বিশাল অতলান্তিক সাগরের উপর দিয়ে উড়ে এসেছি, এতক্ষণ বাদে মৃত্তিকার মুখ দেখলাম। সবে ভোর হচ্ছে, আকাশের চারিদিক রক্তাভ হয়ে উঠেছে, সুন্দর লাগছে দেখতে। বিমান থেকে নেমে মুখ ধুয়ে কেশ-বেশ ঠিক ক'রে নিয়ে বসলাম গিয়ে ওদের প্রকাণ্ড হল ঘরে। এখানে নামতেই একটি মেয়ে এসে ঘোষণা ক'রে গেল এইখানকার স্থানীয় সময় (Local Time) এখন কত। দেখা গেল, আমাদের ঘড়ির সময় থেকে এখানকার সময় সাড়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। আমার স্বামী তাঁর ঘড়ির সময় এখানকার সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে কাঁটা ঘুরিয়ে নিলেন। আমার ঘড়িতে লণ্ডন-টাইম রেখেছি এখনও। একঘণ্টা সময় বিমানক্ষেত্রে কাটিয়ে আবার বিমানে ওঠা হ'ল। এদের সময় পাঁচটায় (আমার ঘড়িতে লণ্ডন-টাইম প্রায় সাড়ে আটটা) বিমান ছাড়লো। পূর্ববর্ণিত ট্রে সাজিয়ে কফি, রুটি, মাখন, কেক্, দুধ-কর্নফ্লেক্-চিনি, ফল, টোম্যাটোর রস ইত্যাদি অনেক খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গেল। আজ আর চা পেলাম না। খাওয়া শেষ ক'রে ব'সে ব'সে দেখতে লাগলাম — এখনও লোকালয় দেখা যায় না। বেশির ভাগ জল এবং মাঝে মাঝে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বিমানের পরবর্তী অবতরণ বোস্টনে। তারপর নিউইয়র্ক।

আমার ঘড়িতে বেলা ঠিক আড়াইটে, কিন্তু স্থানীয় সময় ঠিক সাড়ে দশটায় বিমান বোস্টনে নামলো। প্রকাণ্ড বিমান-

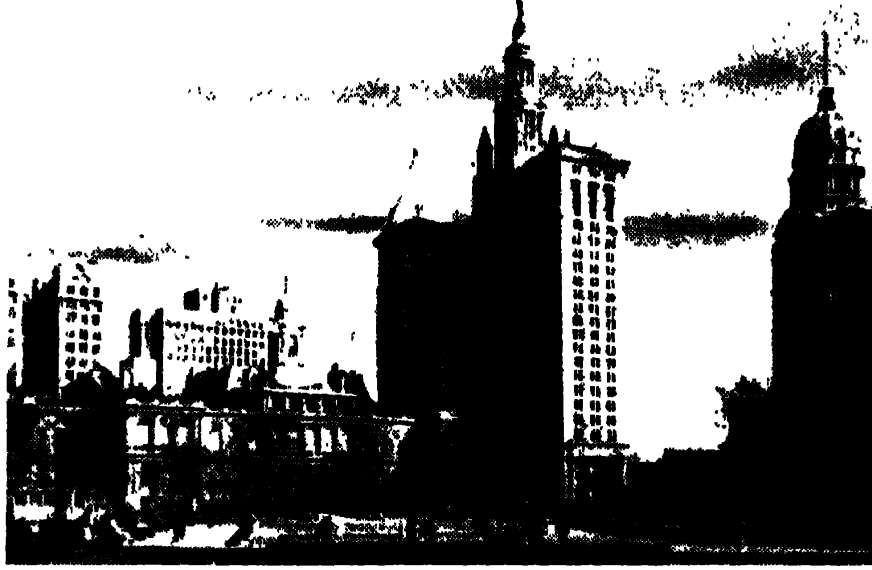
ক্ষেত্র এবং বাড়ি। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে সাতজন এখানে নামলেন। আমাদের ট্র্যানজিট (Transit) কার্ড দিয়ে অন্য বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালো। বাথরূমে গেলাম, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে নিলাম তখন। এখানে বেশ রোদ। গরম অনুভূত হচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে দেখি, একটি মেশিনে লোকে পয়সা ফেলছে, অন্য ধার দিয়ে বোতল বেরিয়ে আসছে, বোতলটি নিয়ে মেসিনের আর একজায়গায় ধরছে আর অমনি মুখটি খুলে যাচ্ছে, তখন সবাই খাচ্ছে। খাওয়া হ'লে খালি-বোতল নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে চলে যাচ্ছে। আমার স্বামী আমাদের বিমানের সহযাত্রী এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করায় জানা গেল ওরা কোকা-কোলা খাচ্ছে। সহযাত্রী সাহেবটি এগিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য দু'টি এবং নিজের জন্য একটি বোতল নিয়ে এলেন। ঐ রকমভাবে খুলে আমরাও খেলাম। সুন্দর আইস্-লেমন, দাম পাঁচ সেণ্ট ক'রে। স্বামী একখানি ডলার বার ক'রে দিতে গেলেন, কারণ তখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে খুচরো ভাঙানি নেই মার্কিনি মুদ্রার, কিন্তু সে-ভদ্রলোক কিছুতেই দাম নিলেন না।

প্রায় ৪০ মিনিট বাদে আমাদের বিমানে উঠতে হ'ল। বিমান ছাড়বার পর ব'লে গেল, বোস্টন থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে।

নিউইয়র্কে এনে যখন আমাদের নামালো তখন এদের স্থানীয় সময় বেলা ১২টা। বেজায় রোদ, বেশ গরম বোধ হচ্ছে। ৪৫ মিনিট লাগলো পাসপোর্ট, পুলিশ, কাস্টম্স্, মেডিক্যাল পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট পার হতে। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সে-ঘর, এমনি ক'রে অনেক ঘরে ঘুরিয়ে স্যুট্কেস্ খুলে

তছ্‌নছ্‌ ক'রে তারপরে পরীক্ষার পালা শেষে আমাদের ছাড়লে।

নিউইয়র্কে টি. ডব্লিউ. এ-র হেড অফিস, তাই এয়ারোড্রোমে নিজেদের কোনওরকম বাস্‌-সার্ভিস্‌ রাখেনি। ট্যাক্সি নিয়ে



সিটি হল ও পার্ক — নিউইয়র্ক

ড্রাইভারকে ঠিকানা দেওয়া হ'ল। সে বললে — অনেকটা দূর যেতে হবে। ড্রাইভারটি কাফ্রি। নেমে অবধি অনেক কাফ্রি দেখছি এখানে।

অনেক পোলের তলা দিয়ে নদীর ধার দিয়ে এলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা, বাড়ি, ঘর। ট্যাক্সি শহরের মধ্যে ঢুকলে দেখতে পেলাম মানুষে আর গাড়িতে ভর্তি সমস্ত রাস্তাঘাট। এখানে বোধ হয় মানুষের চেয়ে গাড়িই বেশি।

হোটেলটির নাম Lexington, খুব সুসজ্জিত এবং প্রকাণ্ড হোটেল। এখানে কেবলমাত্র আবাসিক চার্জ্‌ (প্রাতরাশ না দিয়ে) দৈনিক ১০ ডলার। ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে

সেই কাপড়েই খেতে বেরুতে হ'ল। কাছেই একটি রেস্টুরেণ্ট। আসার সময় লক্ষ্য করেছিলাম লেখা রয়েছে 'রাজা রেস্টুরেণ্ট' Indian — সুতরাং সেইখানেই খেতে গেলাম।



হোটেল লেক্সিংটন — নিউইয়র্ক

মাটির নিচে ভূগর্ভে রেস্টুরেণ্টটি। ভারতীয় পদ্ধতিতে সুসজ্জিত। ছবি, গালিচা, ফুলদানি, আসবাব সমস্তই জয়পুরী ও কাশ্মীরী। খাওয়ার সময় সুন্দর সুন্দর হিন্দি গানের রেকর্ড বাজানো হয়; আমাদের দেশের হিন্দি ফিল্মের গান। খাদ্য-তালিকার (Menu) কার্ডখানি পর্যন্ত তাজ-মহলের ডিজাইনে কাটা পেস্টবোর্ডের কার্ড, — তার উপরে

আহার্য-তালিকা মুদ্রিত। সমস্তই খুব সুরুচিসঙ্গত এবং শিল্পসম্মতভাবে গড়েছে এরা। এক বোম্বেওয়ালা ভদ্রলোক এটির মালিক। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করলেন। সুন্দর খাওয়া হ'ল। ভাত, মাংস, নানারকম ফলের আইসক্রীম্, তরকারি, চাট্‌নি। ভদ্রলোক অনেক ব'লে-কয়ে দিলেন, কোন্ কোন্ জায়গায় কি কি পাওয়া যায়, কি কি দেখার আছে ইত্যাদি।

আমরা খেয়ে উঠে বেরুলাম ঘুরতে। যেখানেই যাই অবাক হ'তে হয়, দাঁড়াতে হয়, এত জিনিসের প্রাচুর্য! এ-রকম আর দেখিনি কোথাও। দামও অন্যান্য জায়গার চেয়ে অনেক কম। প্রায় আটটা পর্যন্ত ঘুরে আমরা 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' খেয়ে প্রায় রাত্রি ৯॥টায় হোটেলে ফিরেছি। তখনও এত রোদ যে ঘরে বসার উপায় নেই। ঠাণ্ডা দেশ থেকে হঠাৎ এত গরম দেশে এসে পড়ে আমাদের বেজায় কষ্ট হচ্ছে। আমার স্বামীর আবার গরম স্যুট ছাড়া সুতি-পোষাক সঙ্গে নেই।

শুক্রবার, ২৪ জুন ১৯৪৯। 'Lexington Hotel'—নিউইয়র্ক॥

ভারতবর্ষের সময়ের সঙ্গে এখানকার সময়ের ঠিক আট ঘণ্টার তফাৎ। এখানে এসে বার বার মনে হচ্ছে যেন, সেই ছোটবেলার শোনা-গল্পের দেশে এসে পড়েছি। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার দেশে এসেছি, যেখানে খাওয়া-দাওয়া আর সুখ-সমৃদ্ধির অদ্ভুত বর্ণনা শুনে ছোট ছেলেরা কেন, বড়দেরও চমক লেগে যায়। এখানকার ঐশ্বর্য দেখে মাথা ঘুরে যায়। অথচ মার্কিনি মুদ্রা অর্থাৎ ডলারেরই সবচেয়ে অসংকুলান ভ্রমণ-

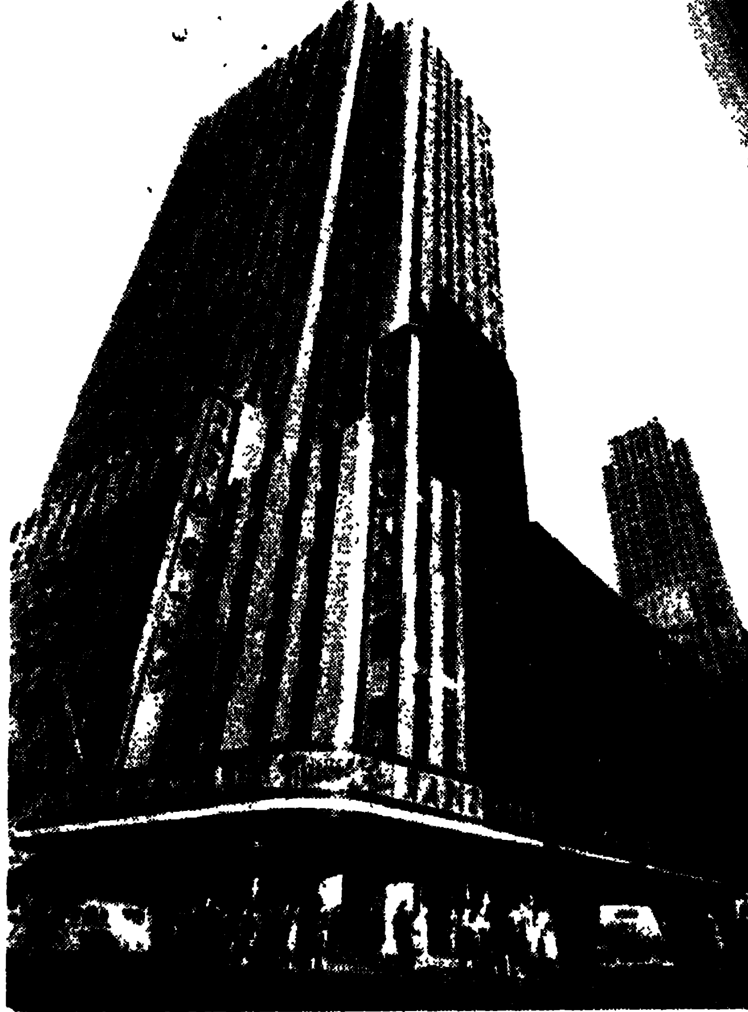
কারীদের। যেমন সুন্দর সব জিনিস, তেমনি দামেও সস্তা। এখানকার বাড়ি সব ৮০।৯০ তলা ক'রে। আমাদের হোটেলটি ত্রিশতলা বাড়ি। আমরা কুড়িতলার উপরে একটি ঘরে আছি। রূম্ নম্বর ২০৩১। ঘরের সংখ্যা বুঝে নাও।

কাল ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্টে দেখলাম খরমুজা, তরমুজ, শশা, আম, প্রভৃতি ভারতীয় ফল বিক্রি হচ্ছে। রাস্তায় কাফেতে চা, কফি, আইস্ক্রীম, দুধ, ফলের রস ক'রে দিচ্ছে। বিকেলের দিকে দু'জনে আনারসের রস কিনে খেলাম, ৪৮ সেণ্ট্ পড়লো। এখানে আর কিছু নেই, শুধু পয়সা খরচ ক'রে ঐশ্বর্য উপভোগ করা ছাড়া। কুবেরের রাজ্যই বটে। সারা পৃথিবীর স্বর্ণরাশি গড়িয়ে এসে জমা হয়েছে এই পাতালপুরীর কুবেরলোকে। ঘরে-বাইরে তাক্ লাগিয়ে দেবার মত অনেক-কিছু আছে।

এদেশের গরমের উত্তাপে মনে হচ্ছে যেন আমাদের ভারতবর্ষেই আছি বুঝি। কাল একটি দোকানে রান্নাঘরের ও অন্যান্য ঘরের সরঞ্জাম দেখতে ঢুকেছিলাম। কত রকমের অদ্ভুত কত কী সামগ্রীই যে দেখলাম বলতে পারি না। নানা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কত সুন্দর সুন্দর মেশিন রয়েছে। এদের যা-কিছু কাণ্ড কারখানা, সমস্তই মেশিনের সাহায্যে। দেখে ইচ্ছা হয় এর কিছু অংশও যদি নিতে পারতাম নিজেদের দেশে। আমরা বেলা ৮টায় বেরিয়ে প্রায় ১টায় বাড়ি ফিরেছি ঘুরে ঘুরে। স্বামীর জন্য সুতি-পোষাক ও আমার ব্যাগ ইত্যাদি খুচরো কতকগুলি জিনিস কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে দেখতেই প্রাণ গেছে। বেলা ১২টা আন্দাজ সময়ে পথে একজায়গায় ফলের রস ও আইসক্রীম খেয়েছিলাম। হোটেলে এসে স্নান সেরে 'রাজা'তে লাঞ্চ খেতে গেলাম যখন তখন প্রায়

বেলা হু'টো। ওদের রান্না চমৎকার। মাছ, মাংস, মিষ্টি পুডিং, আনারসের রস ইত্যাদি খাওয়া হ'ল। খাওয়ার পর স্বামী আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন বিশ্রামের জন্য। নিজে গেলেন আমেরিকান্ এক্স্‌প্রেস কোম্পানীতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে। ডায়েরি ও চিঠিপত্র লেখা সেরে একটু শুয়েছি, স্বামী এসে পড়লেন। এসেই বল্লেন — 'চলো, আমরা আজ রাত্রে কোনও নাচে বা সিনেমায় যাই।' কোথায় যাবো অবশ্য কিছুই জানা নেই। এখানে বিকেলের দিকেও দেশের মত গা-হাত-পা ধুলে বা মুছলে আরাম পাওয়া যায় — এত বেশি গরম। চা খেয়ে সাজসজ্জা ক'রে বেরুতে ৭টা বাজলো। আমরা গেলাম 'রাজা'তে নৈশভোজন সারতে। এবেলাও লুচি, ভাত, মাংস, ভাজা, হনিকেক্, ডালিমের রস খেয়েছি। রেস্টুরেণ্টের মালিক মিস্টার ওয়াদিয়াকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল এখানে অনেক ডান্স্ অপেরা ও সিনেমা হল আছে, তার মধ্যে রকফেলার সেণ্টারে যে মিউজিক্ হল্ আছে, সেইটি দেখার মত। বহু কোটি টাকা খরচ ক'রে ওটি তৈরি করা হয়েছে। সেই মিউজিক্ হলে যে ডান্স্ বা অপেরা সিনেমা ইত্যাদি হয়, তাই দেখা যেতে পারে। বাসে ক'রে রেডিও-সিটিতে গিয়ে টিকিট কেটে ঢুকতেই ৯টা বাজলো। প্রায় আধ মাইল লম্বা ভিড়ের কিউ। একটু ক'রে নাচ আবার সিনেমা, আবার যন্ত্রসঙ্গীত বা কণ্ঠসঙ্গীত — এই সব হ'ল। এদেশের দর্শকদের হাততালির ঘটাটাও উল্লেখযোগ্য রকমের। মিউজিক-হলটি খুবই চমৎকার। স্টেজ্, সাজসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। রাত প্রায় ১ঃটাতে 'শো' শেষ হ'ল। রেডিও-সিটি থেকে হেঁটেই হোটেলে ফিরলাম।

রাস্তায় তখনও দারুণ ভিড় — গাড়ির এবং মানুষের। সমস্ত কাফেতে সেই ১২টা রাত্রেও যথেষ্ট লোক ঢুকে খেতে বসছে।

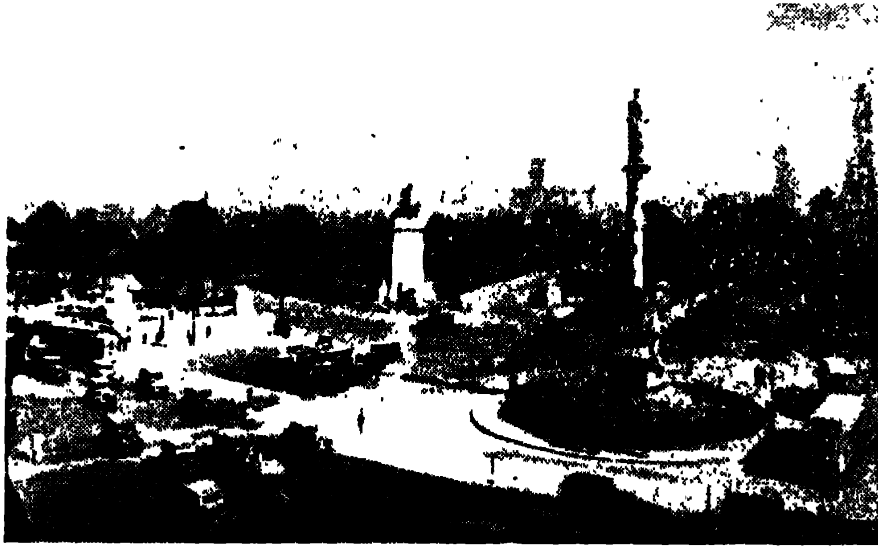


'মিউজিক হল' — রেডিও সিটি

আমরা একটা কাফেতে ঢুকে আইসক্রীম খেয়ে ১২৷৷টার পর ফিরেছি হোটেলে। রাস্তায় বাড়ি দেখতে দেখতে এলাম। আশিতলা-বাড়ির কোনও সৌন্দর্যই নেই, কেবল ঐশ্বর্য আছে মাত্র।

শনিবার, ২৫ জুন ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

চা খেয়ে বেলা ন'টা অন্দাজ আমরা বেরুলাম আজ। প্রথমে বাসে ক'রে Broadway যাওয়া হ'ল। এখানকার একটি খুব বড় দোকানে — Gimble Brothersএ (যদিও এখানকার সব দোকানই বড়) ঢোকা গেল। দোকানটি খুব



ব্রড্ওয়ে — ফিফ্থ্ এ্যাভিনিউ

বিখ্যাত। এদের দৈনিক কেনাবেচার অর্থের অঙ্কের পরিমাণ নাকি অসম্ভব রকম মোটা — বহু লক্ষ ডলার। দোকানটি তো একটি ক্ষুদ্রকায় শহর বিশেষ। লিফ্ট তো আছে যথেষ্টই, এছাড়া ওঠা-নামার জন্য চলন্ত-সিঁড়ি (Escalator) আছে। এ রকম চলন্ত-সিঁড়ি অবশ্য লণ্ডনেও একটি বড় দোকানে দেখেছি ; এখানে বহু দোকানেই তা দেখতে পাচ্ছি। আমার রেইন্কোট, সিল্ক্, জুতো ইত্যাদি দেখতে ও কিনতে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজলো। সে-দোকান থেকে বেরিয়ে চশ্মার দোকানে ঢোকা গেল। চশ্মার দোকানের মালিক ডাঃ ম্যাকলারের

সঙ্গে গতকাল খুব আলাপ হয়েছে। সবচেয়ে আধুনিক যে-ফ্রেম এখানে উঠেছে, সেই রকম চশ্‌মা আমার জন্য এবং আমার স্বামীর জন্য অর্ডার দিয়ে যখন বেরুলাম তখন প্রায় বেলা দেড়টা বেজেছে। পাশের কাফেতে ঢুকে স্বামী লেবুর রস এবং আমি কলার আইসক্রীম খেলাম। হোটেলে ফিরে স্নান ক'রে 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' খেতে গেলাম প্রায় তিনটেয়। স্বামী মাঝে মাঝে বলছেন 'এত কাণ্ড ক'রে এত কষ্টে ডলার জোগাড় ক'রে খরচপত্র ক'রে এদেশে তুমি কি শুধু জিনিসপত্রই কিনতে এসেছ? দেশটাকে দেখতে হবে না ভালো ক'রে?'

আমি জবাব দিই — 'এখানে দেখার মধ্যে তো উঁচু উঁচু আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, ঝাঁকে-ঝাঁকে রকমারি গাড়ি, আর দোকানে-দোকানে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া কাঁড়ি-কাঁড়ি জিনিস-পত্রের ঝল্‌সানি। সর্বদা এখানে তাই দেখেই তো বেড়াচ্ছি।'

'রাজা রেস্টুরেণ্টে'র মালিক মিস্টার ওয়াদিয়ার কাছে একটি বাঙালি ছেলে কাজ করে। নাম নৃপেন ঘোষ। ডাক-নাম মিস্টার মুন্সি। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে ঠিক করা গেল, আজ বোটে করে নিউইয়র্ক দ্বীপের চারিদিক ঘুরে দেখা হবে। হোটেলে ফিরে স্বামী থিয়েটারের টিকিট বিক্রির বিভাগে যেতে তারা তৎক্ষণাৎ বোটে বেড়াবার টিকিটও দিলে এবং কোথা দিয়ে গিয়ে বোটে উঠতে হবে সব বলে দিলে, তার সঙ্গে একরাশি বই ও কাগজপত্রও দিয়ে দিলে, জ্ঞাতব্য তথ্য জানবার জন্য। তাই নিয়ে বাসে ক'রে ফেরিঘাটে গিয়ে স্টিমারে ওঠা হ'ল। বেজায় ভিড়, ওরই মধ্যে ভালো জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। ঠিক ছ'টায় স্টিমার ছাড়লো। নিউইয়র্ক সিটির ধার দিয়ে সব দেখাতে দেখাতে এবং মাইকে গাইড

সমস্ত বিশদভাবে বল্‌তে বল্‌তে চললো। বিরাট বিরাট আকাশস্পর্শী অট্টালিকা। কোন্ বাড়িটি কী এবং কোন্

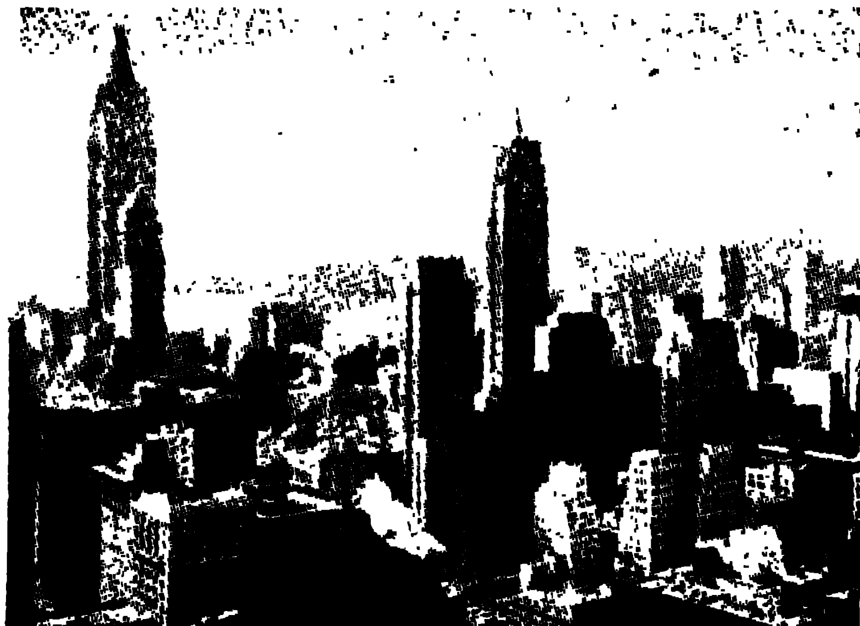


বোট ট্রিপ

বাড়িটি কোন্ ধনীর, কতো মিলিয়ন ডলার ব্যয় ক'রে নির্মিত হয়েছে — ঘোষক ঘোষণা ক'রে বলতে লাগলো। রক্‌ফেলার্ বিরাট হাসপাতাল এবং আর কি কি ক'রে দিয়েছেন ইত্যাদি। মোটের উপরে সমস্তই ধন-ঐশ্বর্যের ব্যাপার। অমন সুন্দর লেকের জলের উপরে বেড়ালে কি হবে, আশেপাশের কুবের-

পুরীর উদ্ধত প্রাসাদশ্রেণী যেন প্রকৃতিলক্ষ্মীকে কারাবন্দিনী ক'রে রেখেছে ব'লে মনে হচ্ছিল।

রাত্রি প্রায় ন'টায় ফেরিঘাটে ফিরলাম। সামনেই বাস্ পেয়ে উঠে পড়ে একেবারে 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' খেতে চলে

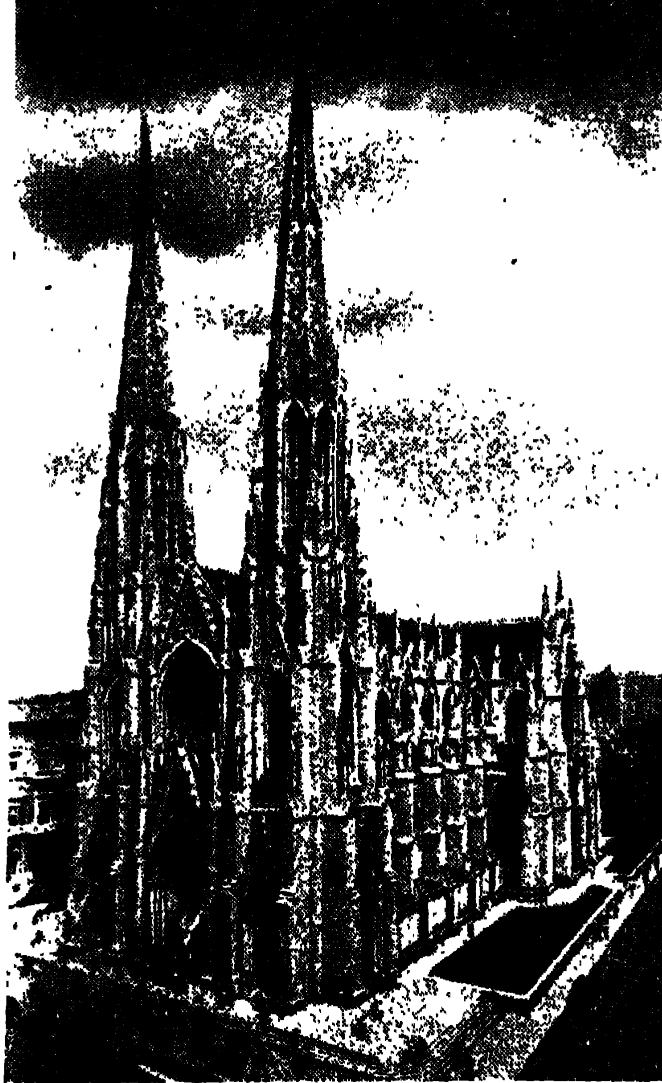


নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটান প্রদেশে নভোচুম্বী সৌধাবলী

গেলাম। একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলে ফিরলাম। এখানকার স্কাইস্ক্রেপার্ বাড়িগুলি এতই বেশি লম্বা উঁচু উঁচু যে, দেখে যেন ভয় হয়। যদি এক মাপেরও হ'ত তা'হলেও-বা হ'ত, একটি আশিতলা বাড়ির পাশেই একটি চল্লিশতলা, আবার তার পাশে একটি ষাট্তলা বাড়ি। দৃষ্টিকে অসমঞ্জসতার অসৌন্দর্যে পীড়িত করে। চোখ খুশি হয়না মোটেই, বিস্মিত হয় মাত্র।

এদের হাসপাতাল যা দেখলাম, প্রায় মাইল দুই ব্যাপী অসংখ্য প্রকাণ্ড বাড়ি। আরও বাড়ানো হচ্ছে দেখালে

আমাদের। এদেশের গরিবদের কোয়ার্টারগুলিও ভাল। বাড়িগুলি ৫০।৬০ তলার। শুনলাম, খুব সামান্যই ভাড়া দিয়ে থাকে স্বল্পবিত্ত লোকেরা।



সেণ্ট্ প্যাট্রিকস্ ক্যাথিড্রাল — (ফিফ্‌থ্ এ্যাভিনিউ)

রবিবার, ২৬ জুন ১৯৫৯। নিউইয়র্ক ॥

আজ স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে সাইট্ সীয়িং কোম্পানীতে যাওয়া হ'ল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় ওদের বাস্ ছাড়লো।

কয়েকটা ক্যাথিড্রাল, রেডিও সিটি, রক্‌ফেলার সেণ্টার, মিলিও-নিয়রদের পল্লী (ফিফ্‌থ্‌ এ্যাভিনিউ)-র সামনেই সেণ্ট্রাল্‌ পার্ক, এটি আড়াই মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া, গরিবদের পল্লী (Harlem Section) হয়ে সেণ্ট্‌ জন ক্যাথিড্রাল্‌, কলম্বিয়া



ওয়াশিংটন স্ট্যাচু

ইউনিভারসিটি ও লাইব্রেরি এবং প্লে-গ্রাউণ্ড, বার্নার্ড কলেজ, হাড্‌সন নদীর উপরে Grant's Tomb, ওয়াশিংটন ব্রিজ, ওয়াশিংটন স্ট্যাচু, নিউইয়র্কের বিখ্যাত সব হোটেলগুলি

দেখালো যা' পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড়। প্রায় পাঁচটি ঘণ্টা প্রখর রোদে বাসে ক'রে এবং মাঝে মাঝে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়েছে। এর মধ্যে বেলা একটার সময় আমাদের লাঞ্চ খাওয়ার অবকাশ দিয়েছিল। এত অত্যধিক



গ্র্যাণ্টস্ টুম্ব.

গরম এদেশে যেন আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালের আবহাওয়ার মতই। একটু ঘোরাফেরার পরই কষ্ট হয় এবং ক্লান্তি অনুভব করতে হয়।

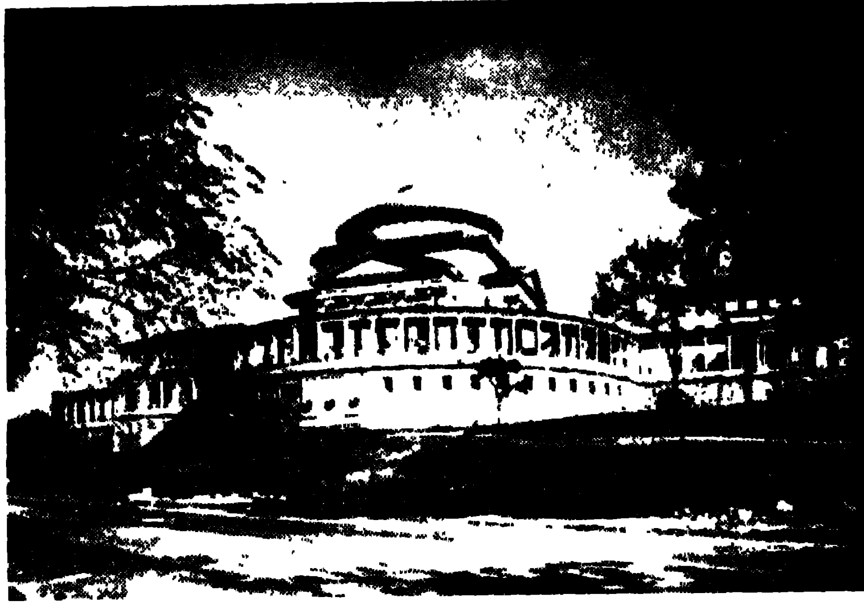
প্রায় সাড়ে পাঁচটায় হোটেলে ফিরে বিশ্রাম ক'রে এবেলাও আবার স্নান করতে হ'ল। সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে চা খেয়ে আমরা ব্রড্ওয়ে পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে দোকান দেখতে দেখতে গেলাম। ক্যামেরা, দূরবীন্, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোর্টেবল্ রেডিও, অতি ক্ষুদ্র টাইপ্রাইটার, ইত্যাদি যা দেখছি, সবই চমৎকার এবং দামও অত্যন্ত সস্তা। নতুন নতুন নানা মডেলের মোটর সাজানো রয়েছে দোকানে দোকানে — ডি-সোটো, ক্রাইস্লার্ ইত্যাদি। এখানে দাম মাত্র চার পাঁচ হাজার টাকা ; দেশে আমরা কিনি প্রায় তিনগুণ বেশি দামে। সাড়ে আটটা পর্যন্ত দোকানে দোকানে ঘুরে একটি রেস্টুরেণ্টে নৈশভোজন সেরে হোটেলে ফিরেছি।

সোমবার, ২৭ জুন ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

আজ আর সকালে দেখার বা বেড়াবার হাঙ্গামা করিনি। দশটায় বেরিয়ে বেলা একটা পর্যন্ত দোকানে দোকানে ঘুরে কিনে কেটে বেড়িয়েছি। হোটেলে ফিরে স্নান ক'রে 'রাজা'য় খেতে গেছি দু'টোয়। খেয়ে উঠে দুপুরে 'সাইটসীয়িং-বাসে' নিউইয়র্কের আরেকটা দিক দেখতে গিয়েছিলাম। পাঁচটার পর ফিরে বিশ্রাম ক'রে চা খেয়ে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে একটু ঘোরাফেরা করে ন'টায় 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' ঢুকে রাত্রির খাওয়া সারলাম।

আজ সাইট্ সীয়িং কোম্পানী আমাদের দেখালো, স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি, ওয়াল স্ট্রিট, এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং, ব্রুক্লীন্ ব্রিজ, সিভিক্ সেণ্টার, নিউইয়র্ক য়ুনিভার্সিটি হল অফ্ ফেম, সেনট্র্যাল পার্ক, এরাউণ্ড কর্নার, সবশেষে চীনা-টাউন। চীনা-

টাউনের মধ্যে নামিয়ে ওদের মন্দির দেখালো। ভূগর্ভে একজায়গায় নামিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখালো আগে ওরা যেখানে



নিউইয়র্ক য়ুনিভার্সিটি — 'হল অফ্ ফেম'

জুয়া খেলে ও নেশা ইত্যাদি ক'রে নিজেদের মধ্যে নিজেরা খুন-খারাপি করতো। ওদের বাজার ঘরবাড়ি ইত্যাদি দেখালো। বহু চীনা চলে গেছে। এখনও এই টাউনে কুড়ি হাজার চৈনিক আছে। এখন এরা কিছু ভদ্র হয়েছে।

চীনা-টাউনটি অপরিচ্ছন্ন নোংরা, সেখানে চীনদেশী মানুষ ছাড়াও অন্যান্য নানাদেশী বদ্ লোকের আড্ডা। অনেক লোককে মদ্ খেয়ে ফুটপাতে বা বাড়ির দরজায় প'ড়ে থাকতে দেখা গেল। এই সব নানান্ ধরনের লোক এখানে মিশ্রিত, যাদের দেখলেই ভয় হয়। আমেরিকায় সর্বসমেত ২৬০০০ চীনা আছে ; তার মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে এই চীনা-টাউনেই আছে ২০,০০০ হাজার। গাইডটি চীনা-পল্লীর নোংরামি,

কুশ্রীতা এবং জঘন্যতা দেখিয়ে গর্ব ক'রে বলতে লাগলো, "আমরা এরকম নয়।" বুঝতে পারলাম, 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইয়ের লেখিকার জাত এরা — এরা এশিয়াবাসীকে সভ্যতা-লেশহীন, বর্বর, পশুশ্রেণীরূপে প্রমাণ করবার জন্য বিশেষ



সেণ্ট্রাল পার্ক

উৎসুক। তা না হ'লে এরা এশিয়ার উপরে সাম্রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্যবিস্তার ক'রে রক্ত শোষণ করবে কেমন ক'রে? চৈনিকেরা যে কত নিম্নস্তরের জাতি এবং কত কদর্য জীবন-

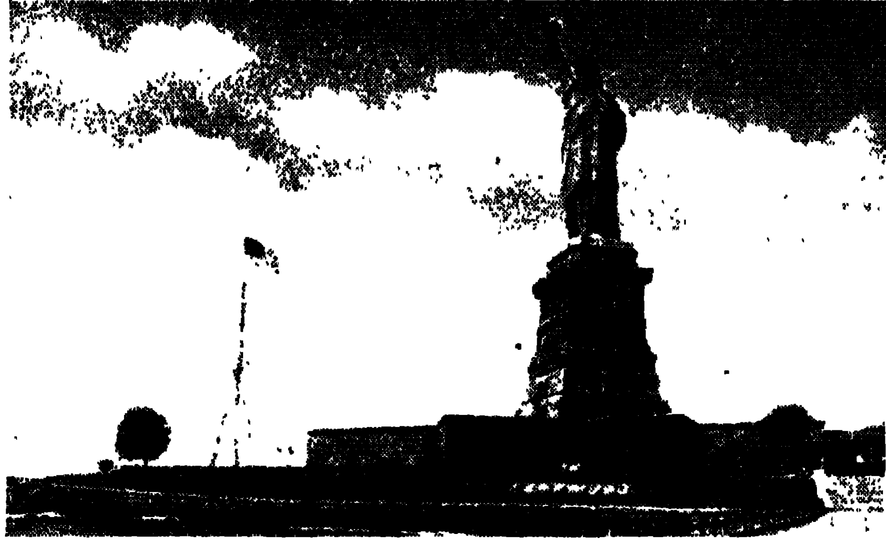
যাপনে অভ্যস্ত, এটা যদি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যজাতিকে এই চীনা-টাউনের বীভৎস পরিবেশের মধ্যে টেনে এনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া না যায়, তা'হলে মার্কিন জাতির চীন-শোষণ এবং চীনের সর্বনাশ সাধনের মহৎ কৈফিয়ৎ দেওয়ার যে পথ থাকে না।



ব্রুকলীন ব্রিজ

আমরা ভারতবর্ষীয়। আমরা জানি, পৃথিবীর সুপ্রাচীন বিরাট মানব-সভ্যতার বাহক মহাচীনের প্রতিনিধি এই নিউইয়র্কবাসী বৃত্তিজীবি অশিক্ষিত চৈনিকেরা নয়। চীন দেশের জ্ঞান, গুণ, শিল্পকলা, আবিষ্কার এবং জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তার বিপুল দান আমাদের সুবিদিত। প্রাচীন সভ্যজাতি রূপে এবং অতিপ্রাচীন সংস্কৃতির বাহকরূপে মহাচীনের কাছে আজও সমস্ত সংস্কৃতিজগৎ মাথা অবনত করে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই কতকগুলি পশুভাবাপন্ন বিকৃত রুচির মানুষ থাকেই। সেই খুনি, গুণ্ডা, জুয়াড়ি, মুর্খ, নেশাখোর, জুয়াচোরেরাই সেই

জাতির পরিচয়স্বরূপ নয়। এই চীনা-টাউনে ভ্রমণকারীদের টেনে এনে এদের জীবন-যাত্রা দেখানোর অর্থ কি? উদ্দেশ্য কি? সমস্ত মন আমার দুঃখে তিক্ততায় এবং ঘৃণায় অন্ধকার হয়ে উঠলো। এরাই আমাদের ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্বর



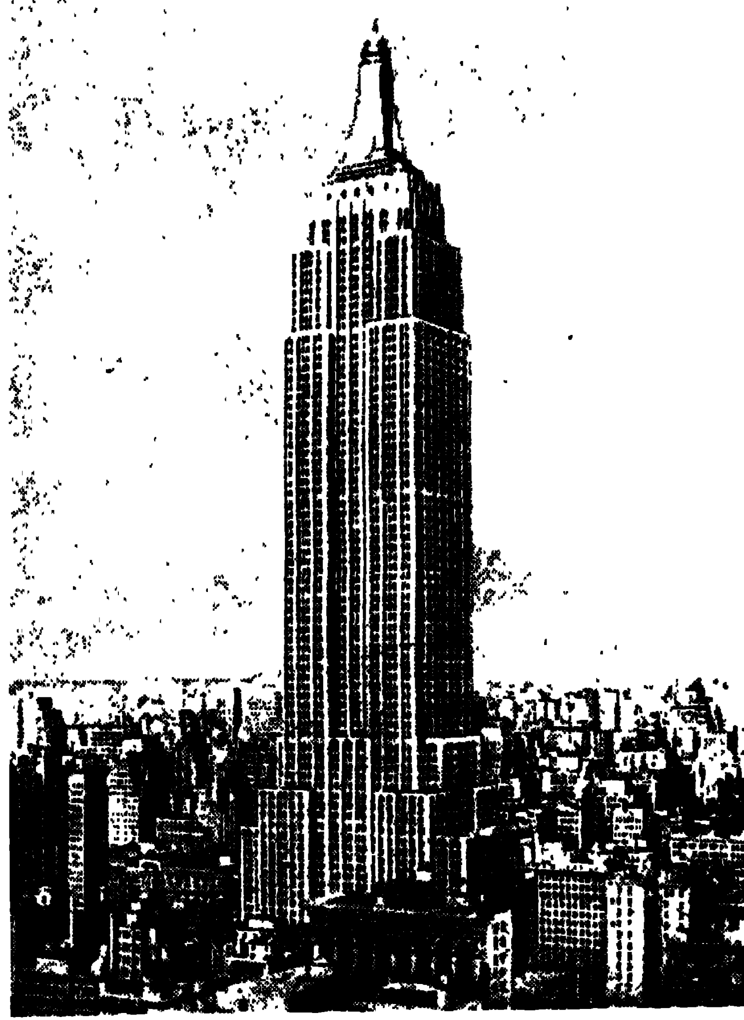
স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি

জাতিরূপেই চিত্রিত করতে বারংবার প্রয়াস পেয়েছে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। চীন এখনও আত্ম-সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নচেৎ দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের নিয়ে গিয়ে নিউইয়র্কের বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর চীনাদের বিকৃত কুৎসিত জীবনযাত্রা দেখিয়ে আনার মত সাহস ও দুর্বুদ্ধি মার্কিনবাসীর হ'ত না।

মঙ্গলবার, ২৮ জুন ১৯৪৯। নিউইয়র্ক॥

আজ সকালে ৯॥টায় বেরিয়ে T. W. A. অফিসে যাওয়া হ'ল। ওখানে কাজ সেরে আমরা বাসে ক'রে ব্রড্ওয়ে গেলাম। দোকানে ঘুরে ঘুরে বেলা ১টা পর্যন্ত জিনিস

কিনেছি। তারপর হোটেলে এসে স্নান ক'রে 'রাজা'য় খেতে গেলাম। মিস্টার ওয়াদিয়া (রেস্টুরেন্টের মালিক) লোকটি



এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

বড় অমায়িক। আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেন। প্রায় তিনটে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে ফেরা হ'ল। ৬টার সময় বেরিয়ে চা খেয়ে বাসে ক'রে বেড়াতে বেরুলাম। ব্রড্‌ওয়ের কাছে একটি ফোটোর দোকানে ঢুকে ছবি তোলা হ'ল দু'জনের। তারপর ঘুরে ঘুরে ব্রড্‌ওয়ে দেখে বেড়াতে

লাগলাম। সন্ধ্যাবেলায় এজায়গাটা দেখার মত। নিয়ন-লাইটে কতরকম লেখা হচ্ছে ও কতরকম বিজ্ঞাপনের ছবি হচ্ছে, ভারি মজার। সমস্ত রাস্তাটা ঝল্‌মল্‌ করছে। সাড়ে আটটা বেজে গেলে আমরা বাস্‌ ধ'রে Lexington-এ এলাম। আজ রাত্রে 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' অনেক ভারতীয় এসেছিলেন। সবার সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমাদের পাশেই দু'টি ছাত্র খেতে



চায়না টাউন

বসেছিল, তারাও আলাপ করলে। একটি মদ্রদেশী, অন্যটি উৎকলী। মাদ্রাজী ছেলেটি দু'বৎসর হ'ল এসেছে, আরও এক বৎসর থাকবে। উড়িষ্যাবাসী ছেলেটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, এবার দেশে ফিরবে। কটকে উচ্চপদের সরকারি চাকুরি পেয়ে গেছে। আর একটি বাঙালি ভদ্রলোক এসে আলাপ করলেন, নাম ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। তিনি আমাদের ভারতবর্ষের ভাইস-কন্‌সাল হয়ে নিউইয়র্কেই

রয়েছেন। তিনি আবার তাঁর টেবিলে মিস্টার পি. এন. ব্যানার্জীর কাছে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রমথ-নাথ ব্যানার্জী, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার।



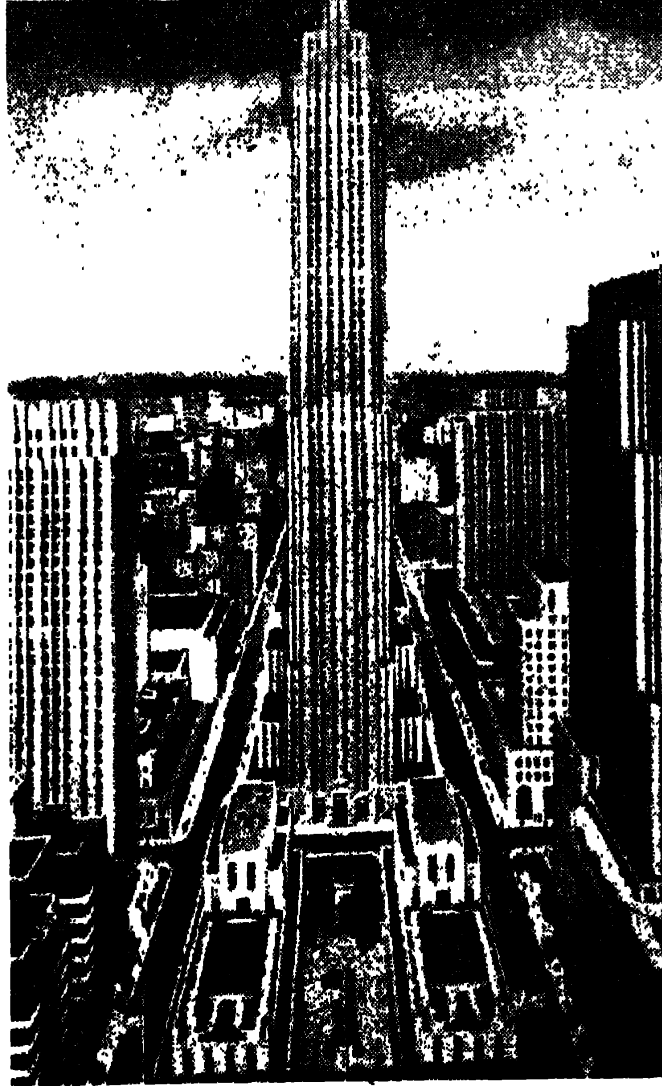
রাত্রের নিউইয়র্ক

আমাদের নিকট-আত্মীয় শ্রীনরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বললেন। উনি আমাদের পাশের হোটেলেই আছেন। উনিও অনেকক্ষণ গল্প করলেন। ওয়াশিংটন্, চিকাগো, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো ইত্যাদি হয়ে ৯ই জুলাই ভারতবর্ষে ফিরবেন বললেন। এঁরা ছাড়া আরও দু'জন ভারতীয়ের সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল।

বুধবার, ২৮ জুন ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

ব্রেকফাস্টের পর ফ্রান্সের Visa করানোর জন্য Radio City-তে যাওয়া হ'ল। Radio City-র মধ্যে যে কী

বিরাট ব্যাপার, চারিদিকে দেখলে থ' হয়ে যেতে হয়। এইটি রক্‌ফেলারের, এছাড়া বহু বিরাট বিরাট বাড়ি, কয়েকটা এ্যাভেনিউ, সবগুলিই রক্‌ফেলারের। 'রক্‌ফেলার সেণ্টার'



রক্‌ফেলার সেণ্টার

(সমস্ত বাড়িগুলিই রক্‌ফেলার সেণ্টারের)

নাম এর। পাঁচ তলায় ফ্রান্সের অফিসে কাজ সেরে আবার ত্রিশতলার উপরে উঠে বেল্‌জিয়মের 'ট্র্যান্‌জিট ভিসা'র জন্য

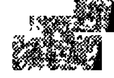
লিখিয়ে যখন বেরুনো হ'ল তখন বেলা ১১টা বেজেছে। ওখান থেকে বাস্ নিয়ে 7th Avenue বা সপ্তম বীথিকায় যাওয়া হ'ল। সেখানে কতকগুলি ফাউন্টেন্ পেন ইত্যাদি কিনে তার পাশেই এক রেডিও, রেফ্রিজেরেটর ইত্যাদি মেশিনের দোকানে ঢুকেছিলাম। সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট রেডিও, দাম ৭০৲ ৮০৲ থেকে আরম্ভ ক'রে যত বেশি দামের চাও। এখানে ইলেকট্রিক্যাল্ শেভিং-সেট পাওয়া যায়। আমরা টেলিভিশন দেখিনি শুনে ওরা একটা বড় রেডিও খুলে দিলে। অন্য রেডিও স্টেশনে যা' যা' হচ্ছে, সব দেখা যেতে লাগলো ঠিক সিনেমার ছবির মত। সকালবেলায় বোধহয় ছোটদের আসর জাতীয় কিছু ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে মাঝে মাঝে গান করছে, আবার একজন বুড়ি মেম এসে ওদের গল্প ও গান শোনাচ্ছেন। আমরা হাঁ ক'রে দেখতে লাগলাম। কত রকমেরই মেশিনের জিনিস যে দেখে এলাম! মনে হচ্ছিল, আহা, কিছু কিছুও যদি এর মধ্যে নিয়ে যেতে পারতাম দেশে! এরা খুব যত্ন করে সব দেখাচ্ছিল এবং বোঝাচ্ছিল। আমাদের দেশের কথাও জিজ্ঞাসা করছিল।

এখানে বাসে উঠে যেখানেই যাও, সাত সেণ্ট ভাড়া লাগে। এর বেশিও নেই, কমও নেই। একটা মেশিন্ আছে তার মধ্যে ৭ সেণ্ট ফেলে দিতে হয়। প্রত্যেক রাস্তার আলাদা আলাদা নম্বরের বাস আছে, বদল ক'রে যেতে হয়। তখন আবার আলাদা ভাড়া লাগে, নচেৎ নয়। সাধে কি বলেছি, হবুচন্দ্র রাজার রাজ্য এটা।!

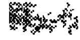
দুপুরে খেয়েই আবার বেরিয়ে Macyতে যাওয়া হ'ল। এটাও খুব বিখ্যাত দোকান। একটু-আধটু জিনিসপত্র কিনে

চা খেয়ে আমরা রেডিও সিটির মধ্যে কি কি আছে দেখবার জন্য গেলাম। ওখানে গিয়ে টিকিট কিনতে হয় এক ডলার ৪২ সেণ্ট দাম দিয়ে জন-পিছু প্রত্যেকের জন্য। এই কোম্পানীর নাম 'রক্‌ফেলার সেণ্টার টুর কোম্পানী'। আমরা টিকিট কিনতেই ওদের কোম্পানীর নামের একটি ক'রে নীল রংয়ের ব্যাজ দিলে। সেই ব্যাজ প্রত্যেক যাত্রীকে বুকে আট্‌কে নিতে হ'ল। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর আমরা ১৪।১৫ জন যাত্রী গাইডকে সঙ্গে নিয়ে চললাম। প্রথমে ঐ তলাতেই একটা কাচের উপর রেডিও সিটির ছবিটা আমাদের দেখিয়ে বোঝালে কোন্‌টা কি এবং সেই সমস্তগুলো বাড়িঘরই রক্‌ফেলারের। 49th St. থেকে 52nd St. পর্যন্ত এবং 5th Avenue থেকে 7th Avenue পর্যন্ত জমি নিয়ে এই সেণ্টার। ভূগর্ভে দুইতলা পর্যন্ত নিচে নিয়ে গেল। উপরের রাস্তাগুলি সর্বসাধারণের জন্য দিয়েছেন। কিন্তু, নিচের তলায় সব পথ একটার সঙ্গে আর একটার— এইরকম প্রত্যেকটারই যোগ আছে। নিচে দোকান, অফিস, মোটরলরী ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপার রয়েছে। নিচে দিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে একবার ক'রে ঘরে ঢুকে আবার এস্কেলেটার ক'রে উঠে একেবারে রাস্তায় বের ক'রে ফেলতে লাগলো। আবার রাস্তা পার হয়ে অন্য বিরাট বাড়িতে ঢোকা হ'ল। এইভাবে বহু বাড়িতেই যাওয়া গেল। বললে, এই সেণ্টারের মধ্যে ৬০টা ব্যাঙ্ক আছে, ১২টা বড় বড় মিউজিক্‌-হল্‌, অনেক বড় বড় দোকান এবং ত্রিশহাজার ভাড়াটিয়া আছে। এছাড়া মস্ত বড় পোস্টঅফিস, রেডিও অফিস ইত্যাদি আছে। শেষে গাইড্‌ মেয়েটি বললে, শহরের মধ্যে যা-যা থাকা দরকার, এর মধ্যে সবই আছে, কেবল একটা জেলখানা নেই। এইভাবে

আমাদের প্রায় কুড়িতলায় তুলে দেখালে একটা মস্ত বাগান রয়েছে। সুন্দর ফুল ফুটেছে, মাঝখানে মস্ত ফোয়ারা, বাগানে সব-কিছুই আছে। মাঝে মাঝে বড় বড় রেস্টুরেন্টে অনেকে খাওয়া-দাওয়া করছেন দেখলাম। সব শেষে আমাদের উনআশীতলায় লিফ্‌টে ক'রে নিয়ে গেল। তিনবার লিফ্‌ট বদল









উনআশীতলার উপর

ক'রে ওখানে গেলাম। ওঠার সময় কানের মধ্যে রিন্‌রিন্ করে একটু। উপরে উঠে দেখি চমৎকার ছাদ। চেয়ার টেবিল সাজানো রয়েছে বসার জন্য। এখান থেকে সমস্ত নিউইয়র্ক শহর দেখায় ঠিক ছবির মতই। এরোপ্লেন যখন নামে উপর থেকে সমস্ত শহরটা ঠিক এইরকমই দেখায়। উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, চারিদিকে জল, মাঝে মাঝে এক একটা দ্বীপের উপর থেকে এক একটা এই রকম বড় শহর গ'ড়ে উঠেছে। গাইড ব'লে দিতে লাগলো

কোন্ বাড়িটা কি? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু 'এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং', তারপরেই ক্রাইস্লার কোম্পানীর বাড়ি। তারপর অনেক বাড়িই ৭০।৮০ তলার রয়েছে। তিনবার লিফ্ট বদল ক'রে একেবারে নিচের তলায় যখন আমরা নামলাম, প্রায় ৮টা বাজে। আমাদের সঙ্গিনী তিনটি মেয়ে ক্যালি-ফোর্নিয়া থেকে এসেছেন, তাঁরা আমাদের ফোটো নিলেন। নিচে এসে আমরা বড় বড় দোকানগুলি দেখতে দেখতে রাস্তায় বেড়াতে বেরুলাম।

বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

সকালে স্বামী গিয়েছিলেন বেলজিয়ম সুইডেন্ ইত্যাদির Visaর জন্য। আমি বেরুই নি, ঘরেই ছিলাম। দুপুরে খেতে গিয়ে রেস্টুরেণ্টে আজ ডাঃ মুখার্জি নামে এক বাঙালি ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর আছেন এদেশে। মানুষটি বেশ শিক্ষিত। বাঙলা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন এবং জানেনও। গল্প ক'রে দু'টোর পর বেরিয়ে আজ 59th স্ট্রিটের Bloomingdale নামে নতুন আর একটি দোকানে গেলাম। সেখানে জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি কিনে প্রায় ৬টায় যখন ফিরছি, লণ্ডনে পরিচিত এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। অনেকক্ষণ গল্প ক'রে ফেরা হ'ল। হোটেলে এসে চা খেয়ে আবার বেরিয়েছিলাম। হেঁটে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এখানে মুস্কিল, কোথাও একটু বসার জন্য চেয়ার নেই। এমন কি, দোকানে জিনিস-পত্র কিনতে গেলেও বসার জন্য একখানা চেয়ার নেই, সেজন্য পা ব্যথা হয়ে যায় বেড়িয়ে ও দাঁড়িয়ে। প্রায় ৭॥টা নাগাদ

একটা বাসে ক'রে আমরা লেক্সিংটন এ্যাভিনিউতে ফিরে 'রাজা রেস্টুরেন্টে' গিয়ে আইস্‌ক্রীম খেলাম।

আমি রোজই মাছ চাই, এদের রোজই মাংস থাকে। তাই আজ মুন্সি নিজে বাজারে গিয়ে আমার জন্য মাছ এনে রেঁধেছে। ডিনারে মাছ দিয়েছিল আজ। খুব ঝাল দিয়ে বাঙলা দেশের রান্নার মত রেঁধেছে মাছের ঝাল, আর একরকম ভাজাও আছে। রান্নাটা সুন্দর করেছিল, খুব তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খাওয়া গেল। মুন্সি খুব যত্ন ক'রে আমাদের খাওয়ায়। আজ কোথা থেকে সুপুরি যোগাড় ক'রে এনেছে। বলেছে, চীনা-টাউন থেকে আরও এনে দেবে। বাঙালি কিনা, বাঙালির প্রতি টান আছে। মিস্টার ওয়াদিয়া, তাঁর স্ত্রী এবং আর একটি বাঙালি ভদ্রলোক মিস্টার মুন্সি ও আমরা অনেকক্ষণ গল্প ক'রে হোটেলে ফিরেছি।

শুক্রবার, ১ জুলাই ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

একটু আগে Prexyতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলাম। রোজ সকালের ব্রেকফাস্ট আমরা পাশের কাফে Prexyতেই খাই। এক ডলার খরচ ক'রে আমরা দু'জনে পেট ভ'রে খেয়ে আসি। লেবুর রস, চা, চার শ্লাইস রুটি, মাখন ও কেক্ প্রত্যেকে খাই। অন্যান্য অনেক রকম খাবারও আছে, মাঝে মাঝে মুখ বদলেও নেওয়া হয়। আমার শাড়ি ও গহনা দেখে এরা তো অস্থির। সবাই অনবরত হাত দিয়ে দিয়ে দেখে ও বলে 'খুব সুন্দর'। কালও একটি মেম দোকানে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে— 'শাড়িটা ক'গজ? আর, তুমি এটা কি রকম ক'রে পরেছ?' সবাই বলে, তোমাদের ড্রেস বড় সুন্দর দেখতে। কয়েকটা

দোকানে আমাদের খুব ভাব হয়েছে। গেলেই তারা নানান্ কথা জিজ্ঞাসা করে ও নানা প্রশ্ন করে আমাদের দেশ সম্বন্ধে। এরা বড় মিশুক ও অমায়িক। বেশির ভাগ এদেশী মেয়েদের মুখশ্রী ভালই। তবে এরা পুরুষের মত কাজ করে ও চালচলন সেইভাবের ব'লেই বোধ হয় এদের কোমলতা নেই, যেটা আমাদের দেশের মেয়েদের মুখে আছে।

স্বামী সকালে বেরিয়েছিলেন আমেরিকান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানীতে এবং কয়েক জায়গায় Visa-র জন্য। ১২টার সময় তিনি হোটেলে ফিরলে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে 7th অ্যাভেন্যুতে স্থইডেনের কাগজপত্রে সই করবার জন্য যাওয়া হ'ল। সেখানে কাজ সেরে বেলা ১টায় ফিরলাম। আবার বেরিয়েছিলাম তু'টো নাগাদ, ৭৷৷টার পরে ফিরেছি। চশমার দোকানে গিয়ে চশমা নেওয়া হ'ল ও আবার একটা অর্ডার দেওয়া হ'ল। Woolworth-এ গিয়ে কয়েকটা জিনিস কিনে চা খেয়ে বেরুতেই খুব দেরি হ'য়ে গেল। Woolworth-এ খাবার জিনিসের আরও কম দাম নেয়। আমরা চা, কেক্ এবং আইস্ক্রীম খেলাম তুজনে, ৬০সেন্ট পড়লো। ওখান থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাস ধ'রে হোটেলের কাছে এসে ডাইংক্লিনিং থেকে আমাদের কাপড় নেওয়া হ'ল। কাপড় নিয়ে হোটেলে ফিরে ঘণ্টাখানেক বাদেই খাওয়ার জন্য আবার বেরুলাম। আজ আমি জংলা বেনারসী প'রে গিয়েছিলাম। সবাই তো শাড়ি দেখেই অস্থির। লণ্ডনে পরিচিত মাড়োয়ারি ভদ্রলোক মিস্টার সোমানি (ইনি বিড়লাদের আত্মীয় হন) মহা ধনীলোক, তারও চেয়ে বড় বাক্যবীর। বড় বড় কথা ছাড়া বলেনই না। তিনিও স্ত্রীকে নিয়ে 'রাজা'য় খেতে

এসেছেন। আর একজন বম্বেবাসী ভদ্রলোকও সস্ত্রীক এসেছেন 'রাজা'য়। এ ছাড়া অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্র বোস্টন্ থেকে এসেছে, আমেরিকার স্বাধীনতাদিবসের ছুটি উপলক্ষ্যে। আজ খুব হৈচৈ ক'রে খাওয়া হ'ল। অনেকগুলি ভারতীয় একত্র হয়েছে, আর রক্ষে আছে! সাহেবগুলি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে আমাদের দিকে। মিস্টার ওয়াদিয়া বলছেন — 'আজ তিনজন সুন্দরী ভারতীয় মহিলা আমার এখানে উপস্থিত। আমার আজ কী সৌভাগ্য!' ভদ্রলোক যেমন সুপুরুষ তেমনি সুরসিক।

আমি এখান থেকে একটি কাপড়-কাচা যন্ত্র কেনার জন্য অস্থির। কিন্তু ডলার পরিমিত থাকায় এবং নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শুল্ক বিভাগের অসম্ভব দাবীদাওয়া ও হাঙ্গামার জন্য নেওয়ার কোনও সুবিধা করতে পারছি না। মিস্টার সোমানি শুনে বলতে লাগলেন, 'আমরা পাঁচটা ওয়াশ-মেশিন্ নিয়ে গেছি। তার থেকে একটা বিক্রি ক'রে দেবো'খন। এর জন্য আর ভাবনা কি?' সত্যিই দেবেন কি না জানি না।

শনিবার, ২ জুলাই ১৯৪৯। নিউইয়র্ক॥

কাল সকালে আমরা চ'লে যাচ্ছি ওয়াশিংটন। আজ সব গুছিয়েগাছিয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে। বিকেল চারটেয় বেরিয়ে বাসে ক'রে ব্রডওয়ে পর্যন্ত গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে দোকান দেখে দেখে সাড়ে পাঁচটায় ছবির দোকানে গিয়ে ছবি নেওয়া হ'ল। ছবি আমাদের ভালই হয়েছে, সুতরাং আরও দুই কপি এবং রঙিন ছবি এক কপি অর্ডার দেওয়া হ'ল। ওখান থেকে বেরিয়ে চা ও খাবার খেয়ে বাসে

ক'রে হোটেলে আসা গেল। ফিরে একটু বিশ্রাম ও চিঠি লেখা সেরে আবার আটটা বাজতেই 'রাজা'তে গেলাম। সেখানে খেয়ে মিস্টার ওয়াদিয়ার সঙ্গে গল্প ক'রে বেশ সময় কাটলো। ওখানে একটি মেয়ে আছে, পরিবেশন করে। তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছে। স্বামী তাকে মিথ্যা মিথ্যা আমার নাম নিয়ে বলেন — 'আমার স্ত্রী বলছেন তোমার মুখখানি কী মিষ্টি! তোমার হাসিটি কী সুন্দর' ইত্যাদি। সে তো শুনে খুশিতে গদ্‌গদ্ হয়ে নিজের সব কথা বলতে থাকে। তার বাবা ইটালিয়ান এবং মা ফরাসী, সেইজন্যই তার মুখ এমন ভালো। সে একটি যুবককে ভালোবাসে, শীঘ্রই তার সঙ্গে বিয়ে হবে, ইত্যাদি। আমার স্বামী মজা করবার মতলবে ক্রমাগতই বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে অনেক-কিছু ব্যাজস্তুতি করতে থাকেন রোজ। আজ সেই মেয়েটি আমাদের খুব যত্ন ক'রে খাওয়ালে এবং তার ভাবী-স্বামীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে।

ওয়াশিংটনে

রবিবার, ৩ জুলাই ১৯৪৯। 'ডজ্ হোটেল', ওয়াশিংটন ॥

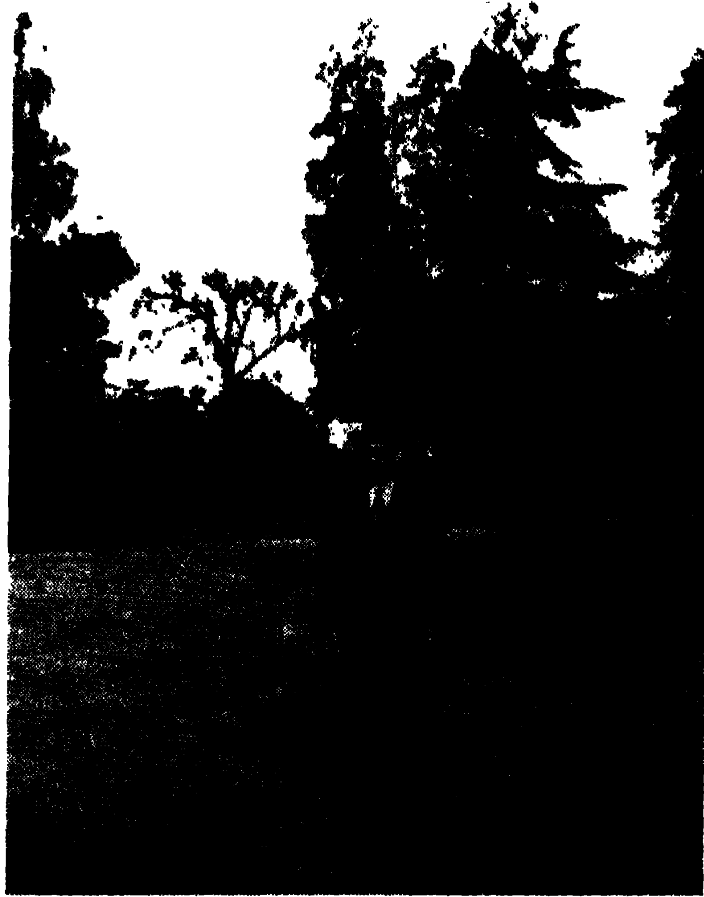
আজ বেলা দু'টো পনেরো মিনিটে ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছেছি। সকাল সাড়ে দশটায় নিউইয়র্ক থেকে ট্রেন ছাড়লো, এখানে এসে পৌঁছলো তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। নিউইয়র্ক স্টেশনে ঢুকে আমাদের দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়েছিল। কোথায় যাবো, কোন্‌দিকে প্ল্যাটফর্ম্ বোঝা দায়। পোর্টারই শেষে পৌঁছে দিলে একটি গেটের সামনে। সেখানে অনেক যাত্রীই অপেক্ষা করছেন দেখলাম। প্রত্যেক লগেজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পনেরো সেণ্ট ভাড়া। আমরা বড় স্যুটকেস্‌টি এবং আরও কিছু জিনিস নিউইয়র্কে 'লেক্সিংটন্ হোটেলে' জমা রেখে দিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি। সঙ্গে আছে একটি স্যুটকেস্ এবং T. W. A. কোম্পানীর উপহার দেওয়া হাতব্যাগটি মাত্র।

প্ল্যাটফর্ম ভূগর্ভের মধ্যে খানিকটা নেমে গেছে। ট্রেন ছাড়বার মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে গেট্‌টি খুলে দেয়, তখন সমস্ত লোক রীতিমত হুড়মুড় ক'রে ঢুকছে। অবশ্য প্রতি ট্রেনের এই রকম পৃথক পৃথক গেটের ব্যবস্থা। আমাদের সীট্ লণ্ডন থেকেই রিজার্ভ থাকায় আমরা ব্যস্ত না হয়ে ভিড় একটু কম্‌লে, নিচে নেমে পুলম্যান্ কারের ১৫২ নম্বর গাড়ি খুঁজে উঠে পড়লাম। ভিতরের ব্যবস্থা চমৎকার। এয়ার-কুলিং থাকায় শরীর ঠাণ্ডা হযে গেল। মালপত্র রাখার জন্য সংলগ্ন একটি কামরা আলাদা। মালগুলি আমাদের কামরার পোর্টার ভিতরে নিয়ে গেল। লম্বা আকৃতির কামরার দুইধারে

পনেরোখানি ক'রে চেয়ার, ভেল্‌ভেটের গদিআঁটা, রিভল্‌ভিং। সামনে ছোট্ট একটা ক'রে টেবিল। খুব আরামে চার ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণ ক'রে এখানে এসে নেমেছি। ট্রেনের ভিতর পাশেই ভোজন-কামরা (Dining-Car) এবং ধূমপান-কামরা (Smoking-Car) সংলগ্ন। এই গাড়িগুলিকে এখানে 'পার্‌লার্‌-কার্‌' বলে। আমরা যে-কামরায় এলাম সেটি প্রথম শ্রেণী। অনেকেই 'ডাইনিং-কারে' দ্বিপ্রাহরিক ভোজন করতে গেল বেলা একটার সময়। আমরা কেবলমাত্র আইসক্রীম্‌ খেয়ে এলাম।

ওয়াশিংটনে নেমে দেখলাম নিউইয়র্কের মত এ স্টেশনটিও প্রকাণ্ড। প্ল্যাটফর্ম্‌ থেকে পোর্টারের সঙ্গে বেরিয়ে ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে এলাম। ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে কাছাকাছি একটা চাইনিজ্‌ রেস্টুরেণ্টে খেয়ে এলাম। খাবার অখাদ্য। কোনও রকমে ভাত, মাছ, আলু, কড়াইসুঁটি সিদ্ধ, আইসক্রীম্‌ খেয়ে হোটেলে ফিরলাম তিনটের পর। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ ক'রছে, পথে বেরোয় কার সাধ্য? স্টেশনে নামা অবধি শরীর ঝল্‌সে যাচ্ছে। আমি এসে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে শুয়ে পড়লাম, স্বামী তাঁর চিঠিপত্র লেখা এবং হিসাবপত্রাদির কাজ নিয়ে বসলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই তিন ঘুমিয়ে বিশ্রাম ক'রে একটু সুস্থ হওয়া গেল। সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে সেই রেস্টুরেণ্টেই চা বিস্কুট কেক খেয়ে কাছেই বাস্‌-টার্মিনাসে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে একটি বাসে ওঠা হ'ল, যে-বাস্‌টি যাবে শহর ছাড়িয়ে সবচেয়ে দূর পর্যন্ত। আজ রবিবার ব'লে সব বন্ধ এবং এদের স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে কালও সোমবারে সব বন্ধ।

ওয়াশিংটনে এসে আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বদ্‌লালো। সুন্দর গাছপালা সাজানো পার্ক্‌,—মাঝে মাঝে রাস্তাগুলি এঁকে বেঁকে পার্কের পাশ দিয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করছে



ওয়াশিংটন পার্কে

সব। রাস্তার দু'ধারে সারিসারি গাছ সমান লাইনে বসানো। অনেকটা প্যারিসের রাস্তার মত লাগছে। সবচেয়ে দেখতে ভালো লাগছে এখানকার বাড়িগুলি। চার পাঁচ তলা বাড়ি —খুব বেশি আট-নয় তলা পর্যন্ত, সেইজন্য দৃষ্টিকটু নয়।

নিউইয়র্কের স্কাইস্ক্রেপারগুলি দেখতে দেখতে মনে হ'ত এ যেন বিরাট এক কারা-নগরী। বাড়ি ত নয়,—গারদখানা! ভিতরে বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের ব্যবস্থা থাকুক না কেন, প্রকৃতি দেবীকে পিছ্মোড়া করে বেঁধে লৌহকারায় বন্দিনী রেখে বিজ্ঞান তার বিজয়কেতন উঁচু ক'রে তুলে ধরায় মানুষের মন সেখানে তার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পরিবেশ খুঁজে পায় না। কারণ, মানুষ প্রকৃতি হতেই সৃষ্ট, বিজ্ঞান হ'তে নয়। প্রকৃতির মধ্যেই নিজের মৌলিক উপাদানগুলি থাকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ যোগ একান্ত স্বাভাবিক।

শহরের মধ্যে দিয়ে বাস্ যাচ্ছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। আবার শহর ছাড়িয়ে যখন আরও এগিয়ে গেল আরও ভালো লাগছিল। মাঝে মাঝে ক্ষেত, জলধারা, ছোট ছোট সুন্দর বাড়ি — প্রতি বাড়িতেই গ্যারাজে গাড়ি আছে। গাড়ি লোকে রাখবে না-ই বা কেন? এখানে সপ্তাহে কিংবা মাসে কিছু কিছু ক'রে দিলে গাড়ি, বাড়ি, রেডিও, আস্বাবপত্র ইত্যাদি সবই কিন্তে পাওয়া যায়। কিস্তিবন্দী হিসাবে তার দাম শোধ হ'লেই জিনিসটি নিজের হয়ে যায়।

প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটায় শেষ টার্মিনাসে যখন বাস্টি থামলো, তখন বাস্ খালি ক'রে সকলে নামলো, আমরাও নামলাম। সেখানে অনেকটা জমি ঘিরে নিয়ে সুন্দর ক'রে বৈদ্যুতিক আলোয় সাজিয়ে কি-জানি কি-সব হচ্ছে। সেখানটার নাম Merryland. দশ সেণ্ট্ ক'রে দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হ'ল। নানারকম খেলা ও জুয়ার ব্যাপার। আমরা খাবো ব'লে চেষ্টা ক'রে একটি দোকানেও খাবার পেলাম না, সমস্তই মদ্য।

আইসক্রীম্, ফলের রস ইত্যাদি তরল পানীয় কিছু কিছু আছে। কাল স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে বোধ হয় এই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছে এইখানে। খুব ভিড়ও হয়েছে। স্বামী বলতে লাগলেন — 'প্রায় ন'টা বাজে, আর এ সব দেখে কাজ নেই, চলো ফেরা যাক্।'

তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে আবার বাসে ওঠা এবং সাড়ে দশটায় এসে ওয়াশিংটনে নামা। আবার সেই ছাইপাঁশ রুটি, মাখন, ডিম, আইসক্রীম খেয়ে কোনও মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রে হোটেলে ফেরা এবং রাত্রির মত বিশ্রাম।

সোমবার, ৪ জুলাই ১৯৪৯। 'ডজ্ হোটেল', ওয়াশিংটন ॥

সকাল সাতটায় উঠেই স্নান সেরে নিলাম। কারণ, আজ ন'টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সমস্ত শহরটা ঘুরিয়ে যা' যা' দ্রষ্টব্য সব দেখাবে। সাড়ে আটটায় নিচে নেমে ডজ্ হোটেলেই ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে সামনেই সাইট সীয়িং কোম্পানীতে গিয়ে মোটরে ওঠা হ'ল।

আজ এদের স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে সব বন্ধ। পতাকা দিয়ে শহর খুব সাজিয়েছে এবং সব জায়গায় খুব ভিড়। প্রথমে বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোন্‌টা কি দেখাতে লাগলো। ল' কোর্ট, ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন্ মেমোরিয়্যাল্, লিন্‌কন্ মেমোরিয়্যাল্, জেফার্সন মেমোরিয়্যাল ইত্যাদি অনেক মেমোরিয়্যাল্, মিউজিয়ম চারটি চার রকমের, হোয়াইট হাউস, প্রেসিডেন্টের আবাস, ক্যাপিটল ও সেনেট। হোয়াইট হাউস উপস্থিত সংস্কার হচ্ছে ৫০ লক্ষ ডলার খরচ ক'রে। এক

বৎসর সময় লাগবে সংস্কার-কর্ম সম্পূর্ণ হ'তে। আগামী বৎসর আবার জনসাধারণ হোয়াইট হাউস দেখতে পাবে ভিতরে



জেফার্সন মেমোরিয়্যাল — ওয়াশিংটন

গিয়ে। বর্তমানে বন্ধ আছে। হোয়াইট হাউসের সামনেই প্রেসিডেন্টের গেস্ট্ হাউস — নাম Blair House. প্রকাণ্ড বাড়ি, উপস্থিত প্রেসিডেন্ট্ সেখানেই আছেন। Smithsonian Building নামে প্রথম মিউজিয়মটিতে ঢুকে এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, সাইকেল, ইঞ্জিন, প্রিন্টিংমেসিন, আরও নানান্ যন্ত্রপাতি কিভাবে প্রথম আবিষ্কার হয় সব দেখা হ'ল। প্রত্যেক জিনিসের একটি ক'রে মডেল্ রয়েছে এবং তারপর কিভাবে তাদের ক্রমশঃ উন্নতি হয় — একটু একটু ক'রে সব মডেল্ দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। তা' দেখে আর শেষ করা যায় না। তারপর বায়োলজি ডিপার্টমেণ্ট, জিয়োলজি, এ্যাষ্ট্রোলজি নানারকম ভাবে মডেল ক'রে আলো দিয়ে দেখিয়েছে। 'ন্যাচারাল্ হিষ্ট্রি বিল্ডিং'-এ নানা দেশের মানুষ,

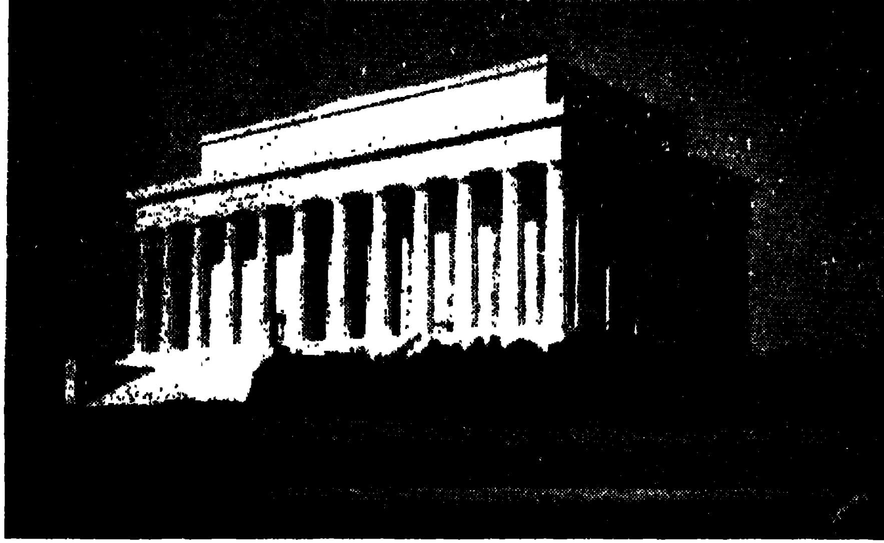
তাদের প্রাচীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সাজ পোষাক পরানো অবস্থায় আছে এবং নানাদেশের পশু পক্ষী জীবজন্তু মুদ্রা



ওয়াশিংটন মন্যুমেণ্ট

ইত্যাদি সবকিছু আছে। নানা ধাতুর তৈরি বহু বুদ্ধ মূর্তিও রয়েছে। বই সংগ্রহের ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে কত রকমের, কত দেশের, কতো কাল আগের সব বই রয়েছে দেখলাম। এর মধ্যে হিন্দু উপনিষদ্ প্রাচীন পুঁথির আকারে আছে, কোরাণও আছে। এত বড় গ্রন্থ-সংগ্রহ বোধহয় লণ্ডনেও নেই।

তবে ঠিক জানিনা, কারণ লণ্ডনের সব কয়টি মিউজিয়ম আমরা দেখতে পারিনি। ওখানে আমরা ছবি তুলছিলাম। কয়েকজন



লিন্‌কন মেমোরিয়্যাল

আমেরিকান আবার আমার ছবি তুলে নিয়েছেন। বল্লেন, রেখে দেবেন।

ফিরে এসে মুখ হাত ধুয়ে রেস্টুরেণ্টে খেয়েছি। তিনটেয় হোটেলে ফিরে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি এবং উঠেছি সাড়ে পাঁচটায়। চা খেতে বেরুলাম দু'জনে, তখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত রোদ থাকে এখানে। সাতটার সময় ট্রামে মাউন্ট্ প্লেজেণ্ট্ পর্যন্ত গিয়ে আবার সেই ট্রামেই ফিরেছি যখন, — তখন প্রায় সাড়ে আটটা। হোটেলে ডিনার খেয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওয়াশিংটন মেমোরিয়্যালের কাছে বাজি-পোড়ানো দেখতে গিয়েছিলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট নানারকম সুন্দর সুন্দর বাজি পুড়লো। আমাদের দেশেরই মত বহু লোক জমেছে মাঠে। বাজিতে এমন-কিছু

বিশেষত্ব দেখলাম না। আমাদের নেতাজীর জন্মদিনেও এই রকম বাজি পোড়ানো হয়েছে দেখেছি। বাজি-পোড়ান শেষ হওয়া মাত্র দলে দলে সব চললো। অত যে হাজার হাজার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, দশ পনেরো মিনিটে সব সাফ্ হয়ে গেল। আধ



ক্যাপিটল — ওয়াশিংটন

ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা ক'রেও একটা ট্যাক্সি পেলাম না। শেষে পুলিশকে পথ জিজ্ঞাসা ক'রে ট্রামে ক'রে হোটেলে ফিরেছি। এখানে ভূনিম্ন পথ নেই, ট্রাম ও বাস ওপরেই চলে। বেজায় গ্রীষ্ম ব'লে এখানে একটুতেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে আমাদের দেশের মত।

মঙ্গলবার, ৫ জুলাই ১৯৪৯। ওয়াশিংটন॥

প্রায় সাড়ে ন'টায় ব্রেক্‌ফাস্ট্ খেয়ে বেলা দশটায় একটা বাসে চড়ে বসলাম দু'জনে। এই বাস্‌টির টার্মিনাস্ ওয়াশিংটন্ শহর ছাড়িয়ে অনেকদূর 'ম্যাকার্থার বুলেভাঁর্দ' নামে একটি জায়গায়। সে-জায়গাটি বড় সুন্দর। ওয়াশিংটনে অনেকগুলি

লেক আছে। আজও একটি সুন্দর লেক দেখলাম ওদিকে। রাস্তা বাড়ি সব সুন্দর। শেষ পর্যন্ত গিয়ে আবার ঐ বাসেই



হোয়াইট হাউস

ফিরে এলাম বেলা বারোটায়। ফিরে স্নান সেরে খেতে গেলাম। এরা একরকম মাছভাজা, ভাত ও সিদ্ধ তরকারি দেয়, তাই খাই। অন্য রান্না প্রথম দিন খেয়ে মালুম হয়েছে। নিউইয়র্কের তুলনায় এখানে ঘরভাড়া অনেকটা কম। কারণ নিউইয়র্কের মত সেইরকম বড় হোটেলের ভাল ঘরেই এখানে সাত ডলার পড়ছে। নিউইয়র্কের চেয়ে এখানে

দেখছি বেশি কাফ্রী বাস করে। প্রায় সমস্ত হোটেলে কাফ্রী-মেয়েরা পরিবেশনকারিণী, ঘরের দাসী বা 'মেডে'র কাজও করে এবং লিফ্‌ট্‌ চালনাও করে কাফ্রী-মেয়েরাই। নিউইয়র্কেও দেখেছি, কাফ্রীরাই ওখানে কুলীর কাজ, মোটর-ড্রাইভারি



স্মিথ্‌সোনিয়ান বিল্ডিং

ইত্যাদি করছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে শ্বেতকায় মার্কিনরা হীনবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীদের দাসশ্রেণী বা শূদ্রে পরিণত ক'রে রেখেছে আর কি! কিন্তু এ আর কতদিন চলবে? যুগের চাকা ঘুরে এসেছে।

আমার মনে পড়লো, মনুষ্যত্বের মহাপ্রতীক রবীন্দ্রনাথও

একদিন এই ধনগর্বিত আমেরিকার দাম্ভিক ব্যবহারে আহত হয়ে এর দুয়ার থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থই জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিচায়ক নয়।

আজ বিকেল ছ'টার পরে বেরিয়েছি চা খাওয়ার জন্য। যা' গরম এবং রৌদ — সারা দুপুর ঘরে কাটাতে বাধ্য হয়েছি। চা খেয়ে বাসে ক'রে বাজার এবং বড় বড় দোকান যেদিকে, সেই দিকপানে গিয়েছিলাম। প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি, তারপর ডিনার খেয়ে হোটেলে এলাম রাত্রি দশটায়।

আমেরিকানরা সাজপোষাক সম্বন্ধে ইউরোপীয়ানদের মতো খুব সজাগ নয়। যার যা'-খুশি প'রে বেড়াচ্ছে। এখন খুব গরম, তাই ছেলেরা প্যান্ট্ ও গেঞ্জি বা প্যান্ট ও হাফশার্ট পরেছে, টাই বা টুপির বালাই নেই। মেয়েরা সবাই স্ট্র্যাপ্-দেওয়া গাউন, কেউ কেউ-বা শুধু ছোট বডিস্ ও তার তলায় খাটো স্কার্ট প'রে কোনওরকমে সভ্যজীবনের দায় বাঁচিয়ে, লজ্জা নিবারণ ক'রে পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে অবাধগতিতে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কেবলমাত্র অন্তর্বাস মাত্র অঙ্গে ধারণ ক'রে অথবা বহির্বাসকে অন্তর্বাসের ক্ষুদ্র আয়তনে সংক্ষিপ্ততর ক'রে যারা স্বচ্ছন্দে লোকসমাজে ঘুরে বেড়াতে পারে, তারাও 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তক রচনা করে! আমাদের দেশের নারীদের প্রকাশ্য তীর্থস্থান ও গঙ্গাস্নানকে বর্বরতা ও অসভ্যতার চরম নিদর্শনরূপে প্রচার করতে তাদের বাধে না এবং আমাদের দেশের গ্রাম্য নারীদের সেমিজ ব্লাউজহীন শাড়ি পরিধানের নিন্দায় ও তার ধিক্কারে তারাই পঞ্চমুখ! দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়ম। প্রাচীন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকময় দিনের অন্তে বিশ্ববিধানের

নিয়মেই নেমে এসেছে অন্ধকার মিশরে, চীনে, ভারতবর্ষে। আবার সেই নিয়মেরই গতিতে কালচক্রে নব সূর্যোদয়ের আভাস ফুটে উঠেছে সমগ্র এশিয়ার ললাট আরক্তিম ক'রে। ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয় আবার ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন ঐতিহ্যে, প্রাচীন গৌরবে, প্রাচীন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলুক। আমাদের জীবনকালেই যেন আমরা দেখতে পাই, এই ভারতবর্ষের বেদান্ত দর্শনের দ্বারে, তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারে, মানব-মানস-লোকের সর্বোত্তম চিন্তার ঐশ্বর্যের দ্বারে পৃথিবীর নানা দেশ-দেশান্তরের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে গুরুর সম্মুখে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রেরই মতো বিনম্র মূর্তিতে, যুদ্ধের মারণাস্ত্র অ্যাটমবোমা নিয়ে নয়।

বুধবার, ৬ জুলাই ১৯৪৯। Sleeping Car. রাত্রি দশটা॥

আজ সকালে ওয়াশিংটনে বেলা ন'টায় বেরিয়ে বারোটায় হোটেলে ফিরেছি। দোকানে দোকানে সব দেখে বেড়াচ্ছিলাম। সামান্য কিছু কিনেছি। বেশি কেনার মত ডলার-সঙ্গতি নেই। বেলা সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে হোটেলের বিল্ চুকিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে আসা গেল। সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ছাড়লো। এদের ট্রেন ইয়োরোপের ট্রেনের চেয়ে আরও সুন্দর ও আরামপ্রদ। কামরার মধ্যে তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় ট্রেনে উঠে বেশ আরাম অনুভব করলাম। রাত্রে ডিনারটা আমরা আটটার সময় ডাইনিং-কারেই খেয়ে নিলাম। রাত্রি সাড়ে ন'টায় আমরা হ্যারিস্‌বার্গ্ স্টেশনে নামলাম এবং ৯টা ৪০ মিনিটে অন্য ট্রেনে উঠলাম। এখানে শোওয়ার জন্য স্লিপিংকার রিজার্ভ্ থাকায় সেই নম্বরের তু'টি সামনা-সামনি কামরা দিয়েছে

আমাদের। সিংগ্‌ল্‌ খাটে সুন্দর বিছানা করা, আলো, র‍্যাক্‌, বই কাগজ দেওয়া সব সাজানো। সেখানে শুয়ে শুয়ে দেশে চিঠি লিখছি। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হাত কাঁপছে। এই ছোট ছোট ঘরগুলো দেখে আমার এত ভালো লাগছে, মনে হ'চ্ছে আমার ছেলেমেয়েরা এইরকম ঘর পেলে বড় খুশি হ'ত। আজ যে-গাড়িতে আমরা হ্যারিসবার্গ পর্যন্ত এলাম, ঐ রকম গাড়িই লোয়ার ক্লাশ। এক রেলের কর্মচারীর সঙ্গে স্বামীর আলাপ হওয়ায় তিনি সব বললেন। এদের ট্রেনে ঐ রকম সাধারণ কামরা ও 'পারলার্‌ কার্‌'—এই দু'রকম আছে। এই সাধারণ কামরা যে কী সুন্দর, কি বলবো! সব দু'খানি ক'রে বড় বড় ভেল্‌ভেটের চেয়ার একত্র-সংলগ্ন, ঠিক এরোপ্লেনের সীটের মত, স্প্রিং আছে, টিপ্‌লে ইজিচেয়ারের মত হেলান দিয়ে ঘুমানো যায়। যারা রাত্রির জন্য স্লিপিংকার্‌ রিজার্ভ্‌ করে না, তারা এইভাবেই যায়, সেইজন্য একটি বড় স্টেশনে ২০ সেণ্ট্‌ ক'রে বালিশ ভাড়া দিয়ে গেল, অনেকেই নিলে দেখলাম। বেশ হেলান দিয়ে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লো। প্রত্যেক কারের সংলগ্ন বাথরুম, স্মোকিং-রুমগুলিও চমৎকার।

বৃহস্পতিবার, ৭ জুলাই ১৯৪৯। 'Netherland Plaza'
Cincinnati

সকাল সাড়ে ন'টায় সিন্‌সিন্নাটি পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এলাম। ট্রেন থেকে নেমেই গরমের বহর বোঝা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড হোটেলে সীট্‌ রিজার্ভ রেখেছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের হোটেলের চেয়ে এটি আরও বড় ও খুব সাজানো। ঘরভাড়াও বেশি সেইজন্য। হোটেলে ঢুকে মনে হচ্ছে, বুঝি

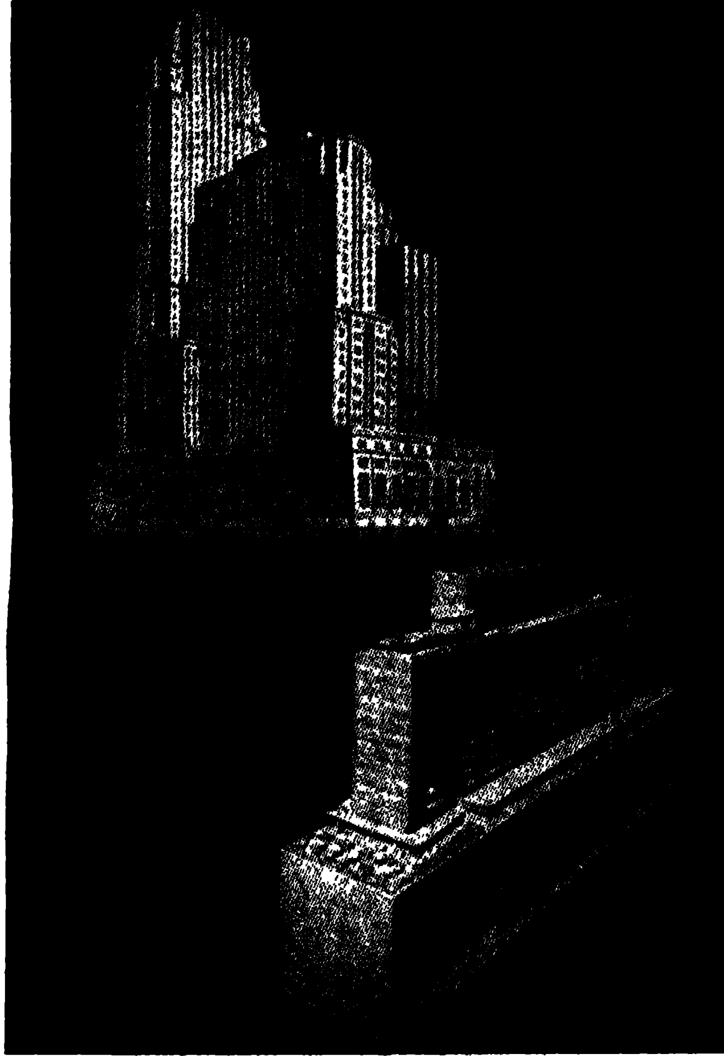
কোন্ রাজপ্রাসাদে এলাম। ছাদনিম্ন দিক (Ceiling) আগাগোড়া সোনালী কারুকার্য করা। আলোর ঝাড়গুলি সোনালী গিল্টি করা, ভেল্‌ভেটের সোফা দিয়ে লবি সাজানো, মাঝে মাঝে মস্ত দোকান — জুয়েলারি, বই, খেলনা ইত্যাদির। হোটেলটি ৪৫ তলা। এখানে নিউইয়র্কের মত স্কাইস্ক্রেপারের ভিড়ের ঘিঞ্জি। সিন্‌সিন্নাটি পুরনো শহর, দেখার মত কিছুই



সিন্‌সিন্নাটি

নেই মনে হয়। যাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় এখানে দেখার মত কি আছে, সকলেই জবাব দেয় — 'Cony Island দেখে এসো, খুব ভাল লাগবে।' নিউইয়র্কে আমাদের Cony Island দেখা হয়নি, তাই আজ বিকেলে দেখতে গিয়েছিলাম। ঐখানে যাওয়ার জন্য আলাদা বাস্ পাওয়া যায়, প্রত্যেকের ভাড়া পড়ে ২০সেণ্ট্। আমরা হোটেলের কাছেই বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে একটি বাসে উঠলাম। অনেক লোক যাচ্ছে। প্রায় সবারই হাতে স্নানের সরঞ্জাম। পৌঁছতে আধ ঘণ্টাটাক

লাগলো। শহরের মধ্যে স্কাইস্ক্রেপার বাড়ি ও দোকান—নিউইয়র্কেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। একটু বাইরে যেতে ফাঁকায় ছোট ছোট বাড়ি আছে দেখা গেল, তবে তাদের সুন্দর ক'রে



উপরে — নেদার্‌ল্যাণ্ড্‌ প্লাজা। নিচে — টেরেস্‌ প্লাজা। টেরেস্‌ প্লাজার নিচের কয়েকটি তলায় কোনো জানালা নেই, একেবারে নিরেট গাঁথা। ভিতরে কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলো-বাতাস চলাচল হয়।

রাখা হয়নি। Cony Island-এ একটি কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে এবং তাতে স্নানের ও বোট্‌ রোয়িং-এর ব্যবস্থা আছে।

মস্ত বড় জায়গা জুড়ে নানা আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র অনুষ্ঠান চলেছে। ছোট ট্রেনে চ'ড়ে ঘোরা, মেরি-গো-রাউণ্ড্, মোটর-চালনা, নৌকায় বাইচ্ খেলা, বালকবালিকাদের নানা-রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে এবং জুয়ারও অনেক রকম আয়োজন দেখলাম। সেদিন ওয়াশিংটনেও এইরকমই দেখেছিলাম Merrylandএ গিয়ে। এটা কিন্তু, সাময়িক নয়, স্থায়ী আমোদ-প্রমোদের স্থান। স্নান, সাঁতার, নৌকা-বাইচের স্থান। কত লোকে যে কত রকমের জুয়া খেলছে তার শেষ নেই। আমরা চা খেয়ে গিয়েছিলাম, কিছু আইসক্রীম খেয়ে সব খেলা দেখে ফিরতে সাড়ে আটটা হয়ে গেল। সওয়া ন'টায় এক ক্যাফেটেরিয়াতে খেতে গেলাম। 'ক্যাফেটেরিয়া' হোটেলগুলি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক আহারের স্থান। কারণ দাম সস্তা। এখানে কোনও 'ওয়েটার' নেই। যার যা খাবার ইচ্ছা একখানি ট্রে নিয়ে সেই সেই জিনিস নগদ দাম দিয়ে কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে চলে যাও। যদি কোনও টেবিল খালি থাকে তবে বসে খেতেও পারো। নিউইয়র্কে মিস্টার ওয়াদিয়ার রেস্ট্রেণ্টে ভালো রান্না খেয়ে বড়ই আরামে ছিলাম। এখন কেবলমাত্র মাছভাজা, তরিতরকারি-সিদ্ধ, স্যালাড ইত্যাদি খেতে হচ্ছে।

রাত্রি দশটার পরে হোটেলে আমাদের ঘরে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। স্বামী ফোন ধ'রে কথা কয়ে এসে বললেন, 'মিস্টার লুইজ নামে এক কাগজের রিপোর্টার বলছিলেন — আপনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

কাল সকাল বেলায় রিপোর্টারকে আসবার জন্য উনি

বলেছেন। আজ বিকেলে হোটেলের লবিতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি এখানকার অধ্যাপক। নাম ম্যাক লায়ন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। তাঁর স্ত্রী এই হোটেলের লবিতে একটি জড়োয়া-সামগ্রীর দোকান করেছেন। ঐ অধ্যাপক বলেছেন যে কাল তিনি তাঁর নিজের মোটরে ক'রে আমাদের সিন্‌সিন্নাটি শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি সমস্ত ঘুরিয়ে দেখাবেন।

শুক্রবার, ৮ জুলাই ১৯৪৯। সিন্‌সিন্নাটি ॥

সকাল সাড়ে ন'টায় প্রাতরাশ সেরে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে ৫৯ নং বাসে চড়ে এখানকার বিখ্যাত সিন্‌সিন্নাটি গার্ডেন এবং 'জ্যু' দেখতে যাওয়া হ'ল। এখানে দেখছি, বাসের মধ্যেও রেডিও ফিট্‌ করা, রেডিও-প্রোগ্রাম শুনতে শুনতে বাসযাত্রীরা চলেছে।

শহর ছাড়িয়েও রাস্তা বেশ সুন্দর। উঁচুতে উঠেছে ক্রমশঃ পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে। নতুন পরিচিত সেই প্রফেসরটি কাল বলছিলেন, সিন্‌সিন্নাটি সাতটি পাহাড়ে বেষ্টিত। এখন দেখতে পাচ্ছি চারিধারে ছোট ছোট পাহাড় এবং তার মাঝে সব শহর, হিজিবিজি মত দেখতে লাগছে।

Down Town নামে একটা শহরে এসে বাস্‌ থামলো। 'জ্যু'তে একটু ঘুরে আমরা চ'লে এসেছি। যা' অসম্ভব গরম আর রোদ, ঘুরে শহর দেখে কার সাধ্য! কাল এখানে ১০৩ ডিগ্রি টেম্পারেচার গেছে।

বেলা একটার সময় 'Cincinnati Times and Star' নামক দৈনিক কাগজের এক রিপোর্টার ফোন করছিলেন, 'বেলা

আড়াইটায় আমরা যাবো, অনুগ্রহ ক'রে সেই সময় যদি আপনি দেখা করেন।' স্বামী উত্তর দিলেন — 'আচ্ছা, তাই হবে।'

ফোন ছেড়ে বিরক্ত হয়ে স্বামী বললেন, "শুনেছি মহা শঠ এই ইউরোপ আমেরিকার রিপোর্টাররা। দেশ আমাদের সদ্য স্বাধীন হয়েছে। হয়তো এমন কতকগুলি প্রশ্ন করবে, যার যত ভাল উত্তরই দিই না কেন, নিজেদের সুবিধামত সেই উত্তরের অর্থ ও টীকা ক'রে কাগজে হৈচৈ তুলবে। এদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে।"

আবার ফোন এল। প্রফেসর লায়ন জিজ্ঞাসা করছেন, উনি আমাদের নিয়ে দু'টোর সময় বেড়াতে যেতে চান্। স্বামী এঁকেও সম্মতি দান করলেন। বুঝলাম, কাগজওয়ালাদের ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলেন।

হোটেল প্লাজার ভূগর্ভে দু'তলা নিচে নেমে গিয়ে আজ মস্ত বড় এক হোটেলে খেলাম। নিচে নেমে তাক লেগে যায়। মস্ত বড় বড় দোকান, রেস্টুরেণ্ট, অফিস — কি যে সেখানে নেই জানি না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা দু'টোর সময় প্রফেসর লায়নের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে সিন্‌সিন্নাটি দেখতে বেরুলাম। তাঁর মস্ত বড় নতুন হাড্‌সন গাড়ি। প্রথমে শহরের মধ্যে সব ঘুরিয়ে দেখালেন, গরিব নিগ্রোদের পল্লী, তারপর তাদের ধর্মমন্দির (সিনাগগ)। মন্দিরটি খুব পুরাতন এবং তখন মেরামতের কাজ হচ্ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে ক্লিপটন হিলে উঠলো গাড়ি উঁচু খাড়াই পথ দিয়ে। ক্লিপটন হিলে প্রফেসর লায়নের হিব্রু ইউনিয়ন কলেজ। সেখানে গিয়ে মিউজিয়ম, লাইব্রেরি, হোস্টেল, সুইমিং-পুল, জিমনাসিয়াম্, লেকচার হল, প্রফেসরদের থাকবার

বাড়ি ইত্যাদি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়ে ব্যথা ক'রে ছাড়লেন পাগলা প্রফেসর। এদিকে বেলা তিনটেয় হোটেল থেকে ফোনে 'সিন্‌সিন্নাটি টাইমস্ অ্যাণ্ড স্টারের' রিপোর্টার প্রফেসরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমরা ওঁর সঙ্গে আছি কিনা? তিনি 'হ্যাঁ' বলায় রিপোর্টাররা বলেছেন, 'আমরা ট্যাক্সি ক'রে যাচ্ছি মিস্টার ঘোষ এবং মিসেস ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে।' একটু পরে তু'জন মহিলা-রিপোর্টার কলেজে এলেন এবং আমাদের ফোটো তুলে নিয়ে কেন আমেরিকায় এসেছি, আর কোন্ কোন্ স্থানে যাবো, কতদিন দেশবিদেশে বেড়াবো, কি রকম লাগছে আমেরিকা, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব লিখে নিয়ে আধঘণ্টা পরে বিদায় হলেন।

তখন প্রফেসর আবার আমাদের পাক্‌ড়ে নিয়ে কলেজের আর সব দেখাতে দেখাতে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। ঝাঁ-ঝাঁ কাঠফাটা রোদ, মাঠের উপর দিয়ে এ-বিল্‌ডিং থেকে ও-বিল্‌ডিং ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন নাকে দড়ি দিয়ে — আমার তো তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা! স্বামী বাংলায় বলছেন — 'কী পাগলের পাল্লায় প'ড়ে গেছি রে বাবা!' ইংরাজীতে কিন্তু অনবরতই বলে যাচ্ছেন — 'চমৎকার' 'সুন্দর' 'আশ্চর্য' 'অতি অপূর্ব।'

প্রফেসর কলেজের অন্যান্য সব প্রফেসর, ডাক্তার, সেক্রেটারি, এমন কি শেষে ওঁদের কলেজর গভর্নিং-বডির প্রেসিডেন্টের কাছেও নিয়ে গিয়ে পরিচিত করিয়ে তবে ছাড়লেন। কিন্তু ঘুরিয়ে যা' যা' দেখালেন তা সত্যিই সুন্দর। ছেলেদের থাকার ঘর, খাওয়ার জায়গা, খেলাধুলোর জায়গা, রান্নাঘর, সমস্ত-কিছুরই অতি সুব্যবস্থা। সুইমিং-পুলটি

চমৎকার, দেখার মত। তারপর দেখালেন প্রফেসারদের থাকবার যায়গা, ওঁদের প্রিন্টিং-মেশিন অফিস, বুক-বাইণ্ডিং অফিস। সবই দেখবার মত এবং নিজেদের দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাববার মতও বটে।

ফেরার পথে অন্য একটি পাহাড়ে উঠে উপর থেকে শহরের দৃশ্য দেখালেন। সেখান থেকে নেমে Rook Wood পটারি দেখে আমরা প্রায় ছ'টায় হোটেলে ফিরেছি। আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা নিচে থেকে মল্টেড্ চকোলেট মিল্ক এবং আইসক্রীম খেয়ে উপরে এলাম। এই গরমে আর চা খেতে ইচ্ছা হয় না। উপরে এসে শাড়ি বদ্‌লে একটু বিশ্রাম ক'রে চিঠিপত্র লিখতে বসছি, এমন সময়ে নিচের তলা থেকে মিসেস্ লায়ন্ ফোন ক'রে বলছেন — 'আজ আটটায় আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় বেড়িয়ে এক সঙ্গে ডিনার খেতে হবে।'

আমার স্বামী অনেক ক'রে বললেন — 'আপনারা আমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন, আপনাদের সুন্দর আচরণে এবং আন্তরিক সহৃদয়তায় আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ হয়েছি। কিন্তু আবার ডিনারে ডাকছেন কেন ? এতে আমরা অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করছি' — ইত্যাদি। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হ'ল না। পাগল প্রফেসর লায়নের পত্নী এই লায়নেস্‌টিও নাছোড়বান্দা ! শেষে যেতেই হ'ল।

এখান থেকে ওহিও নদীর পুলের উপর দিয়ে পনেরো মাইল দূরে ওঁরা আমাদের 'কেন্টাকি স্টেট'-এ বেড়াতে নিয়ে গেলেন। ওহিও স্টেটের রাজধানী সিন্‌সিন্নাটি এবং ওহিও নদীর ওপারে কেন্টাকি স্টেট। সে-শহরটিও খুব বড় এবং সাজানো। শহর

ছাড়িয়ে ফাঁকায় যখন যাওয়া হ'ল তখন জায়গাটি আরও সুন্দর লাগলো। ছোট ছোট বাড়ি, দুই পাশে শ্যামল-সুন্দর লন্ পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। একটু দূরে গিয়ে এক হোটেলে গাড়ি থামিয়ে আমাদের খেতে নামালেন। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধ'রে খাওয়া গেল। হোটেলটি বেশ নিরিবিলি উঁচু যায়গায়। অনেক লোক সেখানে খেতে আসছেন দেখতে পেলাম। ডাইনিং-হলের এক পাশে ডান্স্ হচ্ছে। আমরা খেয়ে যখন আইসক্রীম খাচ্ছি এমন সময়ে পাশের টেবিলে দুটি অল্প-বয়সী সাহেব এবং দু'জন মেম এলেন। একটি সাহেব আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন— 'তোমরা কি কলকাতা থেকে এসেছ? বাঙালি?'

স্বামী উত্তরে 'হ্যাঁ' ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন — 'আপনি গিয়েছিলেন নাকি সেখানে?'

তিনি তখন আমাদের কাছে জাঁকিয়ে চেপে ব'সে গল্প শুরু ক'রে দিলেন। তিনি সতেরো মাস ছিলেন আমাদের দেশে। সমস্তই জেনে ফেলেছেন আমাদের দেশের। আমার পরনের শাড়ি দেখেই চিনে নিয়েছেন যে আমরা বাঙালি। কলকাতা শহরের সমস্ত-কিছু তাঁর নখদর্পণে। নিউমার্কেট চেনেন, চৌরঙ্গী চেনেন, ফাঁড়ি মানে জানেন ইত্যাদি সে সব্জান্তার কত-কি অভিজ্ঞতার গৌরবময় গল্প!

মিস্টার এবং মিসেস্ লায়ন্ আমাদের পৌঁছে দিলেন 'নেদারল্যাণ্ড প্লাজা' হোটেলে প্রায় রাত্রি বারোটায়। মিস্টার ও মিসেস্ লায়নের তিনটি ছেলেমেয়ে। সকলেই বড় হয়ে গেছে এবং বিয়ে থা' হয়ে আলাদা সংসার করছে।

এখানে বোধহয় ভারতীয় মহিলা খুব কমই আসেন; কারণ,

আমাকে দেখে বহুলোক অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করে — 'কোন্ দেশ থেকে আসছো?' সেদিন একটি তরুণী অনবরতই আমার শাড়ি দেখছে, শেষকালে আমার কাছে এসে মার্জনা চেয়ে বললে — 'তুমি কিছু মনে করো না। তোমার পোষাকটি এতই সুন্দর যে আমি বাবংবার না তাকিয়ে পারছি না।'

আমেরিকানরা খুব রং-চংএ পোষাক পরতে ভালবাসে। বুড়ো বুড়ো সব ভদ্রলোক হাতি, গরু, ঘোড়ার চিত্র ছাপা গেঞ্জি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মোজা ও টাইয়ের তো কথাই নেই। যার যত ইচ্ছা হাবিজাবি মার্কা টাই পরেছে। এমন কি, নানা রংয়ের ফুলকাটা ও প্লেন ছাপা-সিল্কের শার্ট ও ব্যুশ-কোট প'রে বেড়াচ্ছে।

শনিবার, ৯ জুলাই ১৯৪৯। সিন্‌সিন্নাটি ॥

সকালে ব্রেক্‌ফাস্টের পর শুধু হোটেলের ভিতর কি কি আছে ঘুরে দেখতেই দু' ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর ঘরে এসে একটু গোছগাছ ক'রে স্নান ক'রে ঠিক একটার সময় খেতে গেলাম। নিচে নামতেই দেখি প্রফেসর লায়ন আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। মিসেস্ লায়ন গেছেন হেয়ার ড্রেস করতে। প্রফেসর আমাদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নিচেরই এক রেস্টুরেন্টে জবরদস্তি লাঞ্চ খাওয়ালেন। আমরা লাঞ্চ খাচ্ছি এমন সময় মিসেস্ লায়ন এসে পড়ায় চারজনে খাওয়া গেল। ভদ্রলোক আমাদের খাইয়ে সঙ্গে নিয়ে এরই পাশে 'টেরেস প্লাজা' নামে একটা পঁচিশ তলা হোটেলের ভিতরে যে-সমস্ত অদ্ভুত আধুনিক ব্যবস্থা আছে তা দেখানোর জন্যে নিয়ে

চললেন। প্রথমেই ঢোকবার সময় দরজার চাবি খুলে তারপর পাশের একটি সুইচ টিপ্‌লে তবে দরজা খুলবে। ভিতরে কিছু দূর যাওয়া মাত্র দরজা আপনিই পিছনে বন্ধ হ'য়ে যাবে।

হোটেলটির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক কিছুই রয়েছে দেখলাম। যেমন — একটি সুন্দর সুসজ্জিত ড্রয়িংরূম রয়েছে, একটি সুইচ টিপবা মাত্র কৌচগুলি সব বিছানায় পরিণত হ'ল এবং ড্রয়িংরূমটি বেডরূমে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি সুইচ আছে, কোন্ সুইচটি কি কাজে লাগে সব দেখিয়ে দিলেন। একটি সুইচ টিপ্‌লেই দেওয়ালের ভিতর থেকে 'ওয়াশ-বেসিন' আর তার যা-কিছু আনুষঙ্গিক অর্থাৎ সাবান, টাওয়েল প্রভৃতি বেরিয়ে আসে। আর একটি সুইচ টিপ্‌লেই দেওয়ালে টাঙানো ছবি একখানা সরে গিয়ে ড্রেসিংটেবিল মায় তার সবরকম সরঞ্জাম বেরিয়ে আসে। ফেরবার সময় যখন হোটেল থেকে বেরুবো — দরজার কাছাকাছি দু'ফুটের মধ্যে আসতেই দরজা আপনি খুলে গেল। আবার চৌকাঠ পার হতেই আপনি বন্ধ হয়ে গেল। যেন ভূতে করছে! ছাদের উপরে ন্যাচারাল্ বাগান, স্কেটিং করার জায়গা ইত্যাদি সব দেখিয়ে অনেক হাঙ্গামার পর তবে তিনি বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক মহা পাগল। ব'লে গেলেন, অন্য এক জায়গায় তিনটের সময় যাওয়ার এন্‌গেজমেণ্ট আছে, তা' না হ'লে তোমাদের চিকাগো যাত্রার ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতাম।

রবিবার, ১০ জুলাই ১৯৪৯। 'ওএরস্টার হোটেল' চিকাগো॥

কাল রাত্রি সাড়ে ন'টায় চিকাগোতে এসে পৌঁছেছি। বড় সুন্দর স্থানে হোটেলটি। ঘর থেকে লেক দেখা যায় এবং

তিনধারে প্রকাণ্ড পার্ক। চিকাগো শহর মস্ত বড়। প্রায় নিউইয়র্কেরই সমান। রাস্তায় খুব জমকালো বড় বড় দোকান এবং আলোর নানারকম লেখা ও ছবি হচ্ছে ব্রড্‌ওয়ের মত।



চিকাগো

রাত্রে বেজায় ক্লান্ত হয়ে এসেছিলাম, পাশের রেস্টুরেণ্টে খেয়েই শুয়ে পড়েছি। রাত্রে কম্বল গায়ে দিতে হয়েছে, এত ঠাণ্ডা হাওয়া।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর নিচে নেমে জিজ্ঞাসা ক'রে বেরুনো গেল। এক জায়গায় গিয়ে 'সাইট্ সীয়িং'এর টিকিট কেনা হ'ল।

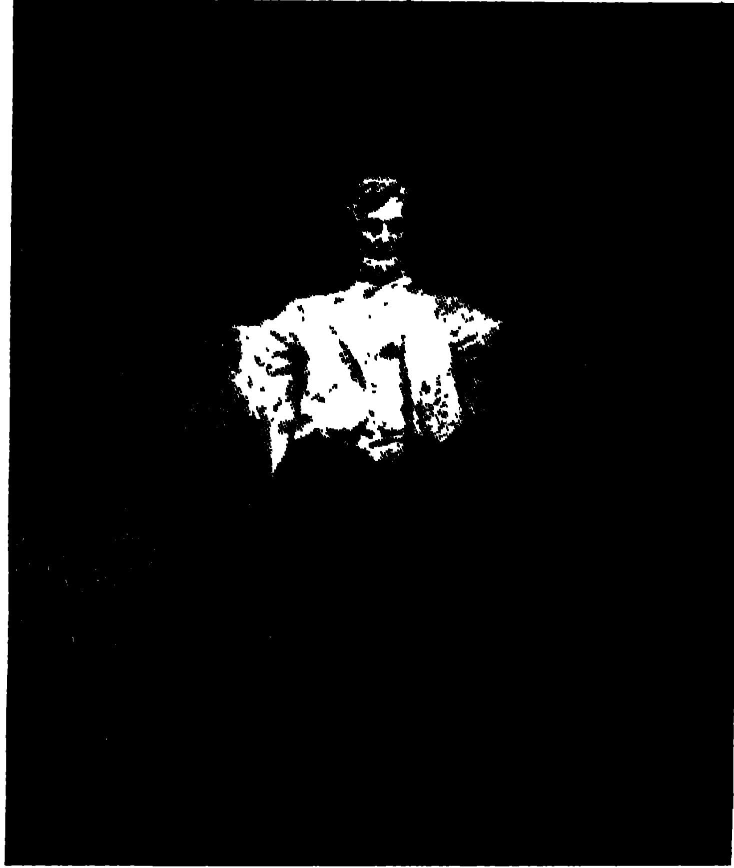
চিকাগো প্রকাণ্ড জায়গা। ইউনাইটেড স্টেটের দ্বিতীয় বড় শহর। চমৎকার বড় বড় রাস্তা, দু'পাশে ফুট্‌পাথ্ এবং একটুখানি অন্তর বড় বড় পার্ক। বাড়িগুলো সমস্তই খুব উঁচু, ত্রিশ-চল্লিশ তলার কম হবে না। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে

খুবই কাছাকাছি বাড়িঘরের ঘিজিমিজি ঘিঞ্জি, কিন্তু অন্যান্য সব জায়গায় বেশ একটু দূরে দূরে বাড়ি।

আমরা বেলা দশটায় বেরুলাম চার ঘণ্টার ট্রিপে। পঞ্চাশ মাইল ঘোরাবে। লেকটি ঘন নীল ও সমুদ্রের মত ঢেউ হচ্ছে। দলে দলে মেয়ে পুরুষ স্নান করছে। কেউ কেউ-বা বালির উপরে এই রৌদ্রে চোখে নীল চশমা প'রে শুয়ে আছে। এদের বেজায় শখ্ গায়ের রং ব্রাউন করার। সাদা রং এরা পছন্দ করে না। ইয়োরোপেও দেখেছি এবং আমেরিকাতেও দেখছি রং কালচে করার জন্য এরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে রোদে পুড়তে থাকে। বলে, ট্যান্ করছে রং। লেকের ধার দিয়ে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেল বাসখানি। এখানে সবশুদ্ধ ১৩৫টা পার্ক আছে। আজ মোটামুটি দেখা হ'ল — ডেক্ স্ট্রিট, মিচিগ্যান্ বুলেভাঁর্দ, মিচিগ্যান নদী, লিন্‌কন পার্ক, চিকাগো গোল্ডকোস্ট্, লেক ফ্রন্ট বেদিং বীচ্, চিকাগো হিস্টোরিক্যাল্ সোসাইটি, লোয়াল ইউনিভার্সিটি, এক্সন্যাশনাল্ মেমোরিয়্যাল্, মিউজিয়ম অফ্ সায়ান্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, ট্যাফট্স্ ফাউন্টেন্ অব্ টাইম, গ্রাণ্ট পার্ক, বাকিংহাম ফাউনটেন, স্ট্যাচু অফ্ লিন্‌কন ইত্যাদি। প্রায় পঁচিশ মাইল লেকের কূলে ড্রাইভ্ ক'রে দেখিয়েছে।

চিকাগো শহরটি ১৪ মাইল চওড়া এবং দু' মাইল লম্বা। এখানকার লোকসংখ্যা এখন পঁচিশ লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা দশ জন নিগ্রো। খেয়ে প্রায় তিনটেয় হোটেলে এসেছি। এখানে গরম কম থাকায় আমার কেবলই ঘুম পাচ্ছে। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে ছ'টার পরে আবার দু'জনে বেরুলাম। কাছেই একটা দোকানে চা খেয়ে হেঁটে হেঁটে অনেকদূর গেলাম। এখানে বিশেষ কিছু দোকানপাট নেই। শহরের ঘেঁষাঘেঁষি

থেকে এ জায়গাটা একটু দূরে। একটা বাসে চেপে শহরের ঠিক মধ্যকেন্দ্রে গিয়ে নামা হ'ল। খানিকক্ষণ ঘুরে সাড়ে আটটার



লিন্‌কন স্ট্যাচু

পর একটি চীনা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে ডিনার খেয়ে প্রায় সাড়ে দশটায় ফিরেছি। রাত্রে জানালা দিয়ে সুন্দর লেক্ দেখা যাচ্ছিল।

এখানে একটা নতুন জিনিস দেখলাম যা আজ পর্যন্ত অপর কোথাও চোখে পড়েনি। শহরের কেন্দ্রস্থলে অনেকগুলি প্রধান রাস্তার দু'ধারে লম্বা লম্বা লোহার উঁচু স্তম্ভ রয়েছে আর সেই স্তম্ভের উপর কাঠ চাপা দিয়ে ছাদের মতো ক'রে

রাস্তাগুলি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত। সেই রাস্তা-ঢাকা কাঠের আচ্ছাদনের উপরে রেললাইন পাতা। তার উপর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন চলছে। লণ্ডনে, প্যারিসে, নিউইয়র্কে যেমন ভূগর্ভে ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল করে এখানে তেমনি রাস্তার মাথার উপর দিয়ে Overhead বৈদ্যুতিক ট্রেন চলছে। এই ট্রেনে চড়তে হ'লে রাস্তা থেকে যে Overbridge উঠে গেছে সেই কাঠের ছাদের উপর — সেখানে গিয়ে উঠতে হয় এবং উপরেই যে সব রেলওয়ে স্টেশন অবস্থিত সেখান থেকে টিকিট কিনে এক স্টেশন থেকে অপর স্টেশনে যেতে হয়।

সোমবার, ১১ জুলাই ১৯৪৯। চিকাগো॥

সকালে উঠে দেখি নাক দিয়ে বেজায় রক্ত পড়ছে। বোধ হয় এত গরমে সমানে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করেছি বলেই এমন হয়েছে। ন'টা নাগাদ্ নিচে নেমে ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাছাকাছি যাওয়া হ'ল ফিল্মগুলি প্রিণ্ট্ করতে দেওয়ার জন্য। আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু কোনও দোকান পাওয়া গেল না। আমার স্বামীর আজ সুইফ্‌ট কোম্পানীর কাছে গিয়ে মৎস্য-ব্যাবসা সংক্রান্ত সব দেখবার কথা — ওরা কেমন ক'রে সব রকম মাছ preserve ক'রে টিনে প্যাক ক'রে পৃথিবীর দেশবিদেশে পাঠায়। আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে উনি চলে গেলেন সুইফ্‌ট কোম্পানীতে, রাস্তার মাথার উপরে অবস্থিত ইলেকট্রিক ট্রেনে চ'ড়ে। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমি ফোন পেলাম স্বামী সুইফ্‌ট্ কোম্পানী থেকে বলছেন, আমি যেন লাঞ্চ খেয়ে নিই, ওঁর ফিরতে অনেক দেরি হবে। আমার কাছে এদিকে ডলার রেখে যান্ নি। নিচে ডাইনিং-হলে খেতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে

নগদ্ বিল্ চুকিয়ে দিতে হয়। আমি ফোনে স্বামীকে সেই কথা বলায় তিনি বললেন — 'আচ্ছা, আমি ম্যানেজারকে ফোনে ডেকে ব'লে দিচ্ছি, তোমার লাঞ্চ্ আজ ঘরেই দেবে।'

একটু পরেই এক সাহেব লাঞ্চের মেনু নিয়ে হাজির হলেন। আমি তো যা' হয় ক'রে তাঁকে বোঝালুম আমার কি কি দরকার। ব'লে দিলাম একটার পরে যেন খাবার পাঠান। স্বামী ফিরলেন বেলা প্রায় চারটায়। সুইফ্ট্ কোম্পানীতে ওরাই ওঁকে লাঞ্চ খাইয়েছে এবং সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। কিন্তু দেখতে গিয়েছিলেন মাছের ব্যাপার, আর দেখে এলেন মাংসের ব্যাপার। উল্টা বুঝিলি রাম হয়ে গেল আর কি!

মঙ্গলবার, ১২ জুলাই ১৯৪৯। চিকাগো॥

সকাল বেলা উঠে দেখি মেঘলা করছে। কুয়াশায় লেক একটুও দেখা যাচ্ছে না। আজ বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে একটু বেড়াতে গেলাম। পাশের পার্ক দিয়ে লেকের কাছে যাব ইচ্ছা ছিল। ওমা, খানিকটা গিয়ে দেখি সেটা সাধারণ পার্ক নয়, জ্যু-গার্ডেন। বাঘ, সিংহ, পাখিদের ঘর ইত্যাদি। খানিকক্ষণ ঘুরে আমরা অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। পোস্ট্ অফিসে গিয়ে আমার ছোট মেয়েটির বার্থ্ডে-কার্ডখানি পোস্ট ক'রে কিছু স্ট্যাম্প কিনে হোটেলে এলাম সাড়ে দশটার পরে।

বেলা বারোটায় মার্শাল ফিল্ডে গেলাম। শুনেছিলাম — ফিল্ড এখানে নিউইয়র্কের 'মেসি' বা অন্য দোকানের মতই, কিন্তু তার থেকে বেশি সাজানো। সত্যিই ঢুকে দেখলাম চমৎকার ভাবে সাজানো বড় বড় মানুষ-সমান পুতুল দিয়ে।

যে-ডিপার্টমেণ্টটি যে-ভাবের, সেই ভাবে মূর্তিগুলির পোষাক পরানো ও সেইভাবে দাঁড় করানো। যাই হোক, একটু ঘোরার পরই আমরা এদের লাঞ্চ-ঘরে লাঞ্চ খেতে গেলাম। সাত তলার উপরে লাঞ্চঘর। সেখানে শুধুই রেস্টুরেণ্টের ব্যাপার। ঢুকতে হচ্ছে কিউ দিয়ে। আমাদের সঙ্গে ব্যানার্জি নামে একটি পরিচিত ছেলেকেও আমরা খেতে সঙ্গে নিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ ঘুরে তিনটেয় বাড়ি এসে কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম। আবার পাঁচটায় বেরিয়ে চা খেয়ে বাড়ির সামনের পার্কেই বসেছিলাম, কারণ আজ শরীর ও মন ক্লান্ত থাকায় বেশি ঘুরিনি।

বুধবার, ১৩ জুলাই ১৯৪৯। হোটেল 'স্টেট্‌লার', ডেট্রয়েট্ ॥

বেলা হু'টো ৪৫ মিনিটে ডেট্রয়েটে এসে পৌছেছি। এ হোটেলটিও মস্ত বড় এবং খুব জ াঁকজমকের। রাস্তায় আসার সময়ে বড় বড় বাড়ি, দোকান অন্যান্য শহরের মতই দেখলাম। এখানে যা দ্রষ্টব্য আছে কালকের মধ্যেই দেখে নিয়ে আমরা কালই এখান থেকে রওনা হব—এই রকম ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি স্টেশনে নেমেই। এখানে এসে চা খেয়ে চারটের পর বেরিয়েছিলাম, রাত্রে ডিনার খেয়ে প্রায় দশটায় ঘরে ফিরেছি। শহরের ঠিক মধ্যস্থলেই হোটেলটি, তাই যত বড় বড় দোকান সব এই দিকেই। প্রায় সাতটা পর্যন্ত হেঁটে বেড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল এবং শেষকালে একটা বাসে উঠে পড়া হ'ল। বাস্‌টির শেষ টার্মিনাস পর্যন্ত ব'সে দেখতে দেখতে যাওয়া গেল। ডেট্রয়েটে সুন্দর সুন্দর পার্ক এবং খুব বড় বড় খোলা লন্ আছে। তবে শহরের ভিতরে কিন্তু সেই ৫০।৬০

তলা যক্ষপুরীর আকাশস্পর্শী সৌধমালা। কেবল ওয়াশিংটনে ঐ রকম স্কাইস্ক্রেপার-বাড়ি নেই। প্রায় ন'টায় ফিরে পাশের খুব বড় হোটেলে খেয়ে নিয়ে হোটেল্ 'স্টেট্‌লারে' ফিরে আসা হ'ল। হোটেলটিতে যত বড় বড় লোকের আড্ডা। মেম সাহেবরা সব ডান্সের ড্রেস প'রে বলরুমে ঢুকছেন



ডেট্রয়েট্

দেখলাম। নিউইয়র্কে যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম হোটেল 'স্টেট্‌লার' আছে, এ-হোটেলটি তারই শাখা-হোটেল। এদের মধ্যে এক বেশ মজা দেখি। যেটাই অনেক বড় এবং অনেক টাকার ব্যাপার, সেটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় হবেই! যেমন চিকাগোতে 'স্টিভেন্স' হোটেলটি দেখিয়ে বললে, এটা পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় হোটেল। এখানে একপাশ দিয়ে বরাবর লেক চলে যাওয়ায় জায়গাটি সুন্দর লাগে এবং উত্তাপও কম। এই লেক নাকি বরাবর কানাডা পর্যন্ত

চলে গিয়েছে। কাল একবার শহরটি ঘুরে দেখে নিতে হবে, কারণ কাল পাঁচটায় আমরা ট্রেনে উঠব ডেট্রয়েট্ ছেড়ে।

বৃহস্পতিবার, ১৪ জুলাই ১৯৪৯। ডেট্রয়েট্॥

সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। এখানে যত গাড়ি তৈরির কারখানা বা ফ্যাক্টরি, গাড়ির পার্টস্ তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি। গাড়ির এক-একটি কারখানা প্রায় এক-একটি গ্রামের মত ব্যাপার। সেখানে হাজার হাজার লোক কাজ করছে। তাদের বসবাসের জন্য সেখানেই ছোট ছোট বাড়ি তৈরি ক'রে দিয়েছে। ঐসব দেখে আমরা বারোটার পর ফিরে এলাম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমরা নায়গ্রায় রওনা হবো। পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত নায়গ্রা ফল্‌স্ দেখতে যাব। ডেট্রয়েটে বিশেষ কিছু দেখার নেই ব'লে দু'দিন থাকার পরিবর্তে আজই চ'লে যাচ্ছি।

শুক্রবার, ১৫ জুলাই ১৯৪৯। হোটেল 'নায়গ্রা', নায়গ্রা॥

কাল সাড়ে পাঁচটায় ডেট্রয়েট থেকে ট্রেন ছেড়েছে। স্টেশনে একটিও কুলি না পাওয়ায় কাল আমার স্বামীকে প্রায় তিন-তলার সমান নিচু ভূগর্ভস্থ স্টেশনে সিঁড়ি বেয়ে সিকি মাইল পথ হেঁটে বড় স্যুটকেস্‌টি বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে অনেক কষ্টে। আমি ছোট T. W. A. ব্যাগটি নিয়েছিলাম। ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই দু'জন ইউনিফর্ম-পরা লোক এসে বললে, 'তোমাদের পাসপোর্ট ও লাগেজ দেখি।' তা'রা পাসপোর্ট ও ব্যাগ দেখে বিদায় হ'লে স্বামী একজন সহযাত্রী ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানলেন যে 'ওয়েল্‌ল্যাণ্ড' স্টেশনে

যেখানে আমরা নামব, সেটা কানাডার মধ্যে পড়ে। সেখান থেকে আবার U. S. A. বাসে আমাদের নায়গ্রা যেতে হবে। সেইজন্য কানাডার পুলিশ ট্রেনেই সব সার্চ ক'রে গেল। নায়গ্রা ফল্‌সের খানিকটা ইউনাইটেড স্টেটের মধ্যে আর খানিকটা কানাডার মধ্যে। আটটার সময় ডাইনিংকারে ডিনার খেয়ে এলাম। ন'টা পনেরো মিনিটে আমরা 'ওয়েল্‌ল্যাণ্ডে' পৌঁছলাম। সেখানে রেল কোম্পানীর বাস্ দাঁড়িয়েই ছিল, ট্রেন থেকে নামামাত্র যাত্রীদের বাসে তুলে নিলে এবং আর একবার কাস্টমের লোকেরা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিয়ে বাস ছাড়লে। 'ওয়েল্‌ল্যাণ্ড' জায়গাটিও বড় শহর। অনেক দোকান-পাট, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, যদিও অন্ধকারে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না স্পষ্ট। প্রায় একঘণ্টা বাদে আমরা 'নায়গ্রা' স্টেশনে এলাম। পথের মধ্যে কানাডার এলাকায় একপাশে কানাডার অফিস এবং অন্যপাশে ইউনাইটেড স্টেটের অফিস। ছ'জায়গাতেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রত্যেক যাত্রীর ছাড়পত্র পরীক্ষা এবং নামধাম ইত্যাদি জেনে নিলে। 'নায়গ্রা' স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এলাম। স্টেশন থেকে 'নায়গ্রা হোটেল' আধ মাইলও দূর নয়। হোটেলটি এখানকার অন্যান্য হোটেলের তুলনায় সব চেয়ে বড়। পথে আসতে বহু 'টুরিস্ট হোম্' 'ছোট কেবিন ভাড়া' 'হোটেল রুম' ইত্যাদি চোখে পড়েছে। সেগুলির তুলনায় এটি যথেষ্ট ভালো। এগারোতলার এই হোটেলটি। এগারোতলার উপরেই একটি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা তখনই ক'রে দিলে। উপরে এসে সারা শহরের দৃশ্য সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। এই হোটেলটি ছাড়া এখানে সবই একতলা ছ'তলা বাড়ি, সেইজন্য সমস্তই

সারি সারি আলোর মতো দেখাচ্ছে। বহুদূর পর্যন্ত শহরটি বিস্তৃত।

আজ সকালের দিকে আমি বেরুই নি। শরীর ভালো ছিল না। উনি কাল বাসের মধ্যে ভুলে টুপি ফেলে এসেছেন, আজ ছুটেছিলেন বাস্-কোম্পানীতে টুপির জন্য। পাওয়া গেছে। এইবার নিয়ে ভদ্রলোকের ছ'বার টুপি হারালো এবং পাওয়াও গেল। উনি সারা সকাল ও দুপুর যথারীতি টো-টো ক'রে ঘুরে সারা নায়গ্রা শহর এবং নায়গ্রা ফল্‌স্ চষে' এসেছেন। আমি পাঁচটার পরে টম্‌টম্ ক'রে বেরুলাম। নায়গ্রা ফল্‌স্ আমাদের হোটেলের পিছন দিকে, খুবই কাছে। পায়ে হেঁটে



নায়গ্রা ফল্‌স (আমেরিকার দিকে)

মিনিট দুই তিনে যাওয়া যায়। আমাদের টম্‌টম্ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। ফল্‌স্-এ যেতে পথের দু'ধারে সব বড় বড় দোকান দেখলাম নানা জিনিসের, নানারকমে সাজানো। ফল্‌স্‌টি বিরাট। এত বড় ফল্‌স্ আগে কোথাও দেখিনি। এক-একটি

জায়গায় নেমে গিয়ে আমরা সেখান থেকে ফল্‌স্‌টি দেখছিলাম। 'লুনা আয়ল্যাণ্ড্', — সেখানে নেমে ছবি নেওয়া হ'ল, আর একজায়গায় 'থ্রি সিস্টার্স আয়ল্যাণ্ড' — সেখানে নেমে ফল্‌সের দৃশ্য দেখা গেল। এইভাবে আমরা সবটা ঘুরে দেখে প্রায় সাতটার পর গাড়ি ছেড়ে দিলাম। তারপর হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে দুটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁ'রা গল্প করতে করতে আমাদের সঙ্গে হোটেলে এলেন। তাঁ'রা বল্লেন "এই পাসপোর্টেই আপনাদের কানাডার দিকে যাওয়া চলবে। রাত্রে ফল্‌সের উপরে যে নানা রংএর লাইট্ ফেলে, সেটা কানাডার দিক থেকে দেখতে খুব সুন্দর। চলুন, সেটা দেখিয়ে আনি।"

আবার সেই ছাত্র দু'টির সঙ্গে বেরিয়ে নায়গ্রা ব্রীজের উপর দিয়ে যেতে লাগলাম। প্রথমে U. S. A. কাস্টম্‌স্ আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করলে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ সেণ্ট্ ক'রে নিয়ে তবে ব্রীজ পার হতে দিলে। আবার কানাডার কাস্টম্‌স্‌কেও পাসপোর্ট দেখিয়ে এবং দশ সেণ্ট ক'রে দিয়ে ঢুকতে হ'ল। রাত্রি ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তীব্র ১,৩০০,০০০,০০০ Candle Powerএর বৈদ্যুতিক রঙিন আলো ফল্‌সের উপরে ফেলে দেখানো হয়। আমরা হেঁটে অনেকটা নিচে নেমে ফল্‌সের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এরা এদিকের বাগানটি ফুলে ফুলে ভরিয়ে রেখেছে। অতবড় ফল্‌সের উপর লাইট্ ফেলে লাল নীল সবুজ নানা রং করছিল এবং অপূর্ব দেখাচ্ছিল। ছাত্র দু'টি আমাদের বল্লেন, "এদিকের পোস্টকার্ড কিনে পোস্টেজ লাগিয়ে এখানে পোস্ট ক'রে দিন কানাডা থেকে।" তখনই পোস্টকার্ড ও টিকিট কেনা হ'ল, সামনেই

বিক্রি হচ্ছিল। রাত্রি প্রায় দশটা বাজে দেখে ছেলেরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরা কাছেই একটি রেস্টুরেণ্টে খেয়ে সেখানেই বসে চিঠি লিখে পোস্ট ক'রে আবার ব্রিজের উপরে এলাম। প্রায় এগারোটা পর্যন্ত কানাডা এলাকায়



নায়গ্রা ফল্‌স (কানাডার দিকে)

থেকে আবার U. S. A. এলাকায় চলে এলাম। যে-ছাত্র দুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল এখানে — এঁরা একজন বম্বের লোক, অন্যজন মাদ্রাজের।

নায়গ্রা ফল্‌স্ দেখে বড়ই ভালো লেগেছে। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য এই প্রকাণ্ড জলপ্রপাত। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করার মত শক্তি আমার দুর্বল লেখনীর নেই। বিধাতার সৌন্দর্যসৃষ্টি যে মানুষের সৌন্দর্যসৃষ্টির কত বেশি ঊর্ধ্বে, সে এই নায়গ্রা জলপ্রপাতের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায়। ইউনাইটেড স্টেটের দিকের প্রপাতটির চেয়ে কানাডার দিকের প্রপাতটিই বেশি বড়ো।

ব্রিজের উপরে একধারে U. S. A. পতাকা, অন্যদিকে কানাডার পতাকা উড়ছে। নায়গ্রা নদীটি প্রকাণ্ড হয়ে প্রায় ২০।২৫ মাইল চলে গেছে শুনলাম, চওড়ায় অনেকটা দেখা যায়।

শনিবার, ১৬ জুলাই ১৯৪৯। নায়গ্রা ॥

সকাল বেলায় সেই ভারতীয় ছাত্র তু'জনের মধ্যে একজন এসে আমাদের অনেক ছবি তুললেন। কত লোকই যে এসেছেন ফল্‌সের ধারে ছবি তুলতে, সবার হাতেই তুই-একটি ক্যামেরা। আমরাও ফল্‌সের ধারে ঘুরে ঘুরে ভারতীয় ছাত্রটিকে দিয়ে অনেক ছবি তোলালাম। শেষকালে স্বামী ছাত্রটির কাছে প্রস্তাব করলেন—"আমি একটা ফিল্মরোল কিনে দিই, আপনি আপনার মুভি-ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলে দিন। তাহলে ইণ্ডিয়াতে ফিরে সবাইকে এই ছবি দেখাতে পারবো।" ভদ্রলোক রাজি হ'লে আমরা বারোটা নাগাদ হোটেলে এসে স্নান সেরে তিনজনে খেতে গেলাম। লাঞ্চ্ খেয়ে এক ফিল্ম্‌রোল কিনে ফল্‌সের ধারে ঘুরে ঘুরে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খুব ছবি তোলা হ'ল।

বিকেল ছ'টায় হোটেলের অফিসঘরে জিনিসপত্র রেখে ঘর ছেড়ে দিয়ে ফল্‌সের ধারে ব'সে বাড়িতে চিঠি লেখা গেল। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত ওখানে ব'সে থেকে তারপর গিয়ে ডিনার খেয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে স্টেশনে এলাম। আমাদের 'স্লিপিংকার্' রিজার্ভ থাকায় ওরা ট্রেনের কামরা খুলে দিলে। সুন্দর বিছানা পাতা আছে দেখে শুয়ে পড়লাম। কাল বেলা ন'টার পর নিউইয়র্ক

পৌঁছবো, তারপর সেখান থেকে এবার যাত্রা আয়র্ল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে।

রবিবার, ১৭ জুলাই ১৯৪৯। 'হোটেল লেক্সিংটন'—নিউইয়র্ক ॥

সকাল বেলায় নিউইয়র্কে পৌঁছেছি। এবার আমাদের পঁচিশতলায় একটি ঘর দিয়েছে। এদের কাছে যা বাক্সপত্র রেখে গিয়েছিলাম, আনিয়ে নিয়ে গুছিয়ে নিলাম। বেলা দেড়টার পর স্নান ক'রে 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' খেতে যাওয়া হ'ল। পনেরো দিন বাদে আবার দেশীয় রান্না খেয়ে প্রাণ বাঁচলো। মিস্টার ওয়াদিয়ার দু'টি মেয়েকে আজ দেখলাম। খুব সুন্দরী মেয়ে দু'টি। ওখানে খেয়ে গল্প ক'রে তিনটেয় আমি হোটেলে ফিরলাম, স্বামী গেলেন T.W.A. অফিসে আবার ইয়োরোপ যাত্রার বন্দোবস্ত করতে। আজ ক'দিন ধ'রে এখানে বাস 'স্ট্রাইক্' করেছে, সেইজন্য মহা মুস্কিল। আজ সকাল থেকে মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন। বেশ বর্ষাকালের মত বৃষ্টি। কলকাতার কথা মনে পড়ছে এই বৃষ্টিতে।

সোমবার, ১৮ জুলাই ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

আজ সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কেটেছে কেবলমাত্র ইরাকের Visa-র জন্য। পাস্‌পোর্টের জন্য ফোটো তুলিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি নিয়ে রেডিও সিটির মধ্যে আমাদের ইণ্ডিয়ান এম্‌বেসির অফিসে যাওয়া হ'ল। তাঁরা ব'লে দিলেন 'এখানে তো হবে না, আপনাদের যেতে হবে অমুক জায়গায়।' বেলা সাড়ে এগারোটায় ট্যাক্সি ক'রে সেখানে গিয়ে পাসপোর্ট দাখিল করতে তখন তাঁরা বললেন, বেলা দুটোর পরে

যেতে। আমরা ব্রড্ওয়েতে ফিরে একটা রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে আবার ছুটলাম সেখানে। পৌঁছলাম ছু'টো দশ মিনিটে। ভাইস্-কন্সাল্ বেরিয়ে গেলেন মিটিংএ। বেলা পাঁচটায় তিনি ফিরলেন। তারপর সেই পাসপোর্ট ও ভিসা মিললো।

সন্ধ্যায় স্নান ক'রে কাপড় বদ্লে আমরা 'রাজা রেস্টুরেণ্টে' চা খেয়ে ওখানেই গল্পগুজব ক'রে ডিনার খেয়ে নিলাম। আজ ওখানে আর্টিস্ট অমর ঘোষ ছিলেন। আমার স্বামী তাঁকে আমাদের ছবি রং করতে দিতে চাইলেন। হোটেলে এসে আমাদের সমস্ত ছবি দেখে তাঁর পছন্দ হ'ল না। তিনি বললেন, 'আমি নিজে ভালো ছবি তুলে তবে পেণ্ট্ করবো। বহু বড় বড় লোক আমার পেণ্ট-করা ছবি ইণ্ডিয়ায় নিয়ে গেছে এবং তাই দেখে আরো বহু ছবির অর্ডার আমার এসেছে।' শেষে রাত দশটায় আমাদের হোটেলের ঘরের ভিতর আমাদের তু'জনের ফোটো তুলে নিয়ে রাত এগারোটায় তিনি বিদায় নিলেন।

মঙ্গলবার, ১৯ জুলাই ১৯৪৯। নিউইয়র্ক ॥

আজ ব্রেকফাস্ট খেয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমেই আমেরিকা ছেড়ে বেরুবার পারমিট্ সংগ্রহ করতে যাওয়া হ'ল। সেখান থেকে চশমার দোকানে চশমা নিয়ে ঈজিপ্টের Visa-র জন্য ছুটতে হ'ল। ঘণ্টাখানেক ব'সে থেকে ঈজিপ্টের ভিসা তৈরি করিয়ে বেলা একটায় ফিরলাম আমরা।

তুপুর বেলা অমর ঘোষ একরাশ ফোটো নিয়ে হোটেলে এলেন। তার থেকে তিনটে কপি পছন্দ ক'রে দেওয়া হ'ল।

আমাদের তু'জনের একটা ফোটো 'টোনিপেণ্ট্' হবে, দেড়শো ডলার দাম। সাতটার পর ভদ্রলোক ডলার নিয়ে উঠলেন। ছবি তৈরি হ'লে ভারতবর্ষে পাঠাবেন বললেন। তুঃখের বিষয়, তারপর আজ তু'বৎসর হয়ে গেছে, অমর ঘোষ ছবি পাঠাননি। আমাদের পুনঃপুনঃ পত্র লেখা সত্বেও কোনও উত্তর দেননি। থাকগে সে কথা। সমস্ত গোছগাছ সেরে প্রায় ন'টায় আমরা 'রাজা'য় খেতে গেলাম। মিস্টার ওয়াদিয়া আজ অনেকক্ষণ গল্প ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। শেষে বললেন, 'আজকের খাওয়ার দাম নেবো না।' অনেক ক'রে তাঁর ওয়েটারকে রাজি করিয়ে যা-হোক-কিছু দেওয়া গেল। আসার সময় মিস্টার ওয়াদিয়া ও মুন্সি অনেকক্ষণ ধ'রে কথা ক'য়ে বিদায় নিলেন। আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হ'য়ে গেল। কাল সকালে প্লেনে উড়ব ইয়োরোপের দিকে।

স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ ও আয়ার্ল্যাণ্ড্‌

বুধবার, ২০ জুলাই ১৯৪৯। T. W. A. বিমানপোত,
বিকেল সাড়ে ছ'টা ॥

আজ সকাল সাড়ে ন'টায় প্লেন ছেড়েছে। সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ খেতে দিলে। লাঞ্চ খেয়ে অনেকে কম্বল চাপা দিয়ে দিব্যি ঘুমোতে লাগলো। আমার স্বামীও বেশ এক দফা ঘুম দিয়ে নিলেন। প্লেনে আমার কিছুতেই ঘুম হয় না। আজ প্লেন বেশ দুলছে, কারণ মেঘের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, অথচ রোদও বেশ রয়েছে। বেলা আড়াইটায় নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডে পৌঁছে গেলাম। এরা তখন নামবার আগেই ব'লে দিলে, এখন এখানকার সময়ে পাঁচটা বাজে। এই এয়ারপোর্টটির নাম 'গ্যাণ্ডার' এয়ারপোর্ট। এখানে প্লেন ৪৫ মিনিট থাকবে। আমরা নেমে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিলাম। চারিদিকে ছোট ছোট জলা এবং গাছপালা মাঠ,—একটা দ্বীপের মধ্যে এয়ারপোর্টটি অবস্থিত।

এখন ৯০০০ হাজার ফীট্‌ উঁচু দিয়ে যাচ্ছি। ২১০ মাইল গতিবেগে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে স্যানন্‌ ২০০০ হাজার মাইল। ন'ঘণ্টা পরে স্যাননে প্লেন্‌ নামবে—ভোর ছ'টায়। ঘড়িতে নিউইয়র্ক টাইম ৭-১৫, ঐ সময়ে স্যানন্‌ টাইম ১২-১৫।

বৃহস্পতিবার, ২১ জুলাই ১৯৪৯। 'রাসেল্‌' হোটেল, ডাব্‌লিন ॥

স্থানীয় সময় পৌনে সাতটায় আমরা স্যানন্‌ এয়ারপোর্টে নেমেছি আজ। কাস্টম্‌স্‌ বিশেষ গোলমাল করেনি। ওখান

থেকে বাসে ক'রে 'লাইম্‌রিক' নামে এক জায়গায় এসে সেখান থেকে ট্রেনে ডাব্‌লিন যেতে হয়। বেলা দশটার পর 'লাইম্‌রিকে'র বাস্‌ ছাড়ে শুনে ছু'জন আমেরিকান সাহেব এবং আমরা— এই চারজনে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলাম 'লাইম্‌রিক' অভিমুখে। স্যানন্‌ নদীর নামেই এখানকার এয়ারপোর্টটির নাম। গাড়ি ক'রে আসতে কেবল মাঠ ও শস্যক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। ট্যাক্সি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলে। 'লাইম্‌রিক' একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কয়েকখানি দোকান ও বাড়িঘর ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেশনটিও ক্ষুদ্র। এসে ট্রেনে উঠলাম। আমেরিকার সেই 'পার্‌লার কার' চড়ার পরে এই ট্রেন খুবই নোংরা ও খারাপ লাগছিল। তবে লণ্ডন, ইটালি ও অন্যান্য জায়গার ট্রেনেও চড়েছি, সেগুলো এত বিশ্রী নয়। এ ঠিক ভারতবর্ষের ট্রেনের মত। কয়লায় চলে এবং অনেকক্ষণ হুস্‌-হুস্‌ ক'রে আওয়াজ ও প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে তবে ছাড়ে। আটটায় ছেড়ে বেলা বারোটায় 'ডাব্‌লিনে' পৌঁছল। যত স্টেশনে গাড়ি থামলো সবই মধুপুর বৈদ্যনাথ লাইনের ছোট ছোট স্টেশনের মত। প্ল্যাটফর্ম নেই অর্দ্ধেক স্টেশনে। ডাব্‌লিন এদেশের রাজধানী, তাই স্টেশনটি অন্যান্য স্টেশনের চেয়ে একটু বড়। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এলাম। ডাব্‌লিনে 'রাসেল' হোটেলই সবচেয়ে বড় হোটেল। প্রধান রাস্তার উপরেই। হোটেলে এসে স্নান ক'রে কাপড় বদ্‌লে দেড়টার সময় নিচে ডাইনিং-হলে গিয়ে খেলাম। আমেরিকার বড় বড় হোটেলে থেকে এসে এসব হোটেল খুব ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। খাওয়াও তাই। ওদের দেশে প্রচুর ফল, মাছ, দুধ, ক্রীম্‌ কিছুরই অভাব নেই।

তাছাড়া সবই খাঁটি ও টাট্কা। এখানে সে-সব কিছুই নেই। মানুষগুলি দেখছি সেই পুরনো ধরনের পোষাক-পরা নিরীহ শ্রেণীর। প্লেনে ঘুম না হওয়ায় আমি সারা দুপুর ঘুমিয়ে পাঁচটায় উঠলাম এবং উনি সারা দুপুর পায়ে হেঁটে চক্র দিয়ে ডাব্লিন শহর ঘুরে এলেন। সাড়ে পাঁচটায় দু'জনে বেরুলাম।



ডাব্লিন

সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে ফিরলাম আটটায়। প্রায় সবই দেখা হয়ে গেল। ছোট্ট জায়গা, দেখার এমন কিছুই নেই। হোটেলের সামনে 'সেণ্ট্ স্টিফেন্স্ পার্ক' নামে মস্ত বড় পার্ক আছে। খুব সুন্দর ফুল ফুটেছে এবং মাঝখানে ছোট্ট পুকুরে হাঁস রেখেছে। বেশ সুন্দর দেখতে। পার্কটি ঘুরে আমরা নেল্সন কলম, ব্যাঙ্ক অফ্ আয়ার্ল্যাণ্ড, হাসপাতাল, ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরি ঘুরে সব শেষে এখানকার মস্ত গার্ডেন 'ফিনিক্স গার্ডেনে' গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে লোকজনের সঙ্গে

কথাবার্তা কয়ে চলে এলাম। আমাদের হোটেলের পাশেই 'রয়্যাল সোসাইটি অফ্ সার্জেনস্' কলেজ। এই তো দেখার সামগ্রী!

আমেরিকা থেকে এসে আজ প্রথমেই সব-কিছু চোখে অত্যন্ত ছোট এবং খারাপ লাগছে। কিন্তু এখানকার যে-দোকানগুলি বড় বড় দোকান নামে খ্যাত, সে আমাদের কলকাতার দোকানের তুলনায়ও খুব ছোট। এখানে মেয়েদের সাজপোষাক খুব সেকেলে এবং সাধারণ। লণ্ডন প্যারিস্ আমেরিকার ছাঁট-কাট ও ফ্যাসান দেখে এসে এ-সব কি রকম যেন লাগছে। এ আমাদের মতই গরিব দেশ। বেশভূষা



নেলসন্ স্তম্ভ ও পোস্টঅফিস— ডাব্লিন

ও বাড়িঘর দেখলেই অবস্থা বোঝা যায়। ডাব্লিন শহরে কোঠাবাড়িই বেশির ভাগ, কিন্তু গ্রামগুলিতে দেখলাম অনেক খোড়ো-বাড়ি এবং ছোট ছোট টিনের চালের বাড়ি। গরু, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুগুলিরও শারীরিক অবস্থা ও

আয়তন আমাদের দেশের ঘোড়া গরুর মতই। যা' দেখছি, ডাব্‌লিনের সমস্তটা তিনঘণ্টায় দেখা হয়ে যায়। ডাব্‌লিনের 'ওকোনেল ব্রিজ' নাকি এদের খুব একটা গর্বের ধন। দেখে এলুম, অসাধারণ কিছুই নয়।

শুক্রবার, ২২ জুলাই ১৯৪৯। ডাব্‌লিন॥

আজ ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্নান ক'রে বেরুতে বারোটা বাজলো। সামনের পার্কটিতে গিয়ে অনেকগুলি ফোটো তোলা হ'ল।

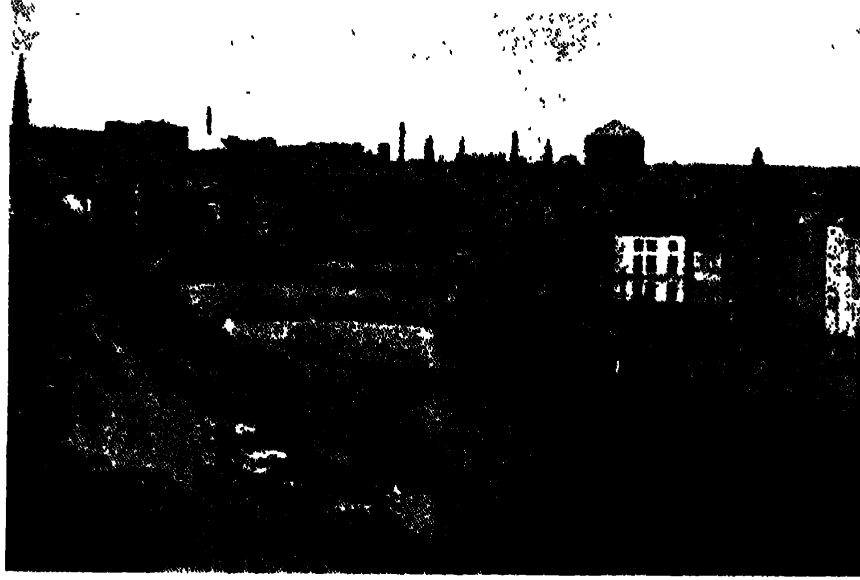


কলেজগ্রীন ও ব্যাঙ্ক অফ্ আয়ার্ল্যাণ্ড

পার্ক থেকে বেরিয়ে মিউজিয়ম, ন্যাশন্যাল আর্টগ্যালারি, পার্লামেণ্ট হাউস দেখে ফিরবার পথে পোস্টঅফিসে ঢুকে কতকগুলি পোস্টেজ ও ছবি-পোস্টকার্ড কিনে হোটেলে ফিরেছি। মিউজিয়মটি ছোট্ট। পার্লামেণ্ট হাউসের ভিতরটাও আমাদের দেখতে দিয়েছিল।

শুক্রবার, ২২ জুলাই ১৯৪৯। 'গ্রেট সেণ্ট্রাল হোটেল' বেলফাস্ট্॥

ডাব্লিনের স্টেশনে এসে কিউ দিয়ে কাস্টম্স অফিসে ঢোকা হ'ল। প্রশ্নের উত্তরে আমরা ভারতীয় ভ্রমণকারী জেনে ব্যাগ না খুলেই আমাদের ছেড়ে দিলে। ট্রেনে উঠে হাঁফ ছাড়লাম। সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন ছাড়ার পর ট্রেনের মধ্যেই



ওকোনেল ব্রিজ — ডাব্লিন

চা, আইসক্রীম প্রভৃতি সার্ভ করছে দেখে চা খাওয়া গেল। ট্রেনে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, আয়ার্ল্যাণ্ডের একভাগ স্বাধীন এবং অন্যভাগ বৃটিশের অধীন। ডাব্লিন হচ্ছে স্বাধীন এবং বেলফাস্ট্ বৃটিশদের অধীনেই আছে। বেলফাস্টে পৌঁছে কাস্টম্সে বেশি হয়রানি হতে হয়নি। হোটেলে এসে জিনিসপত্র রেখেই আমরা শহর দেখতে বেরুলাম। বেলফাস্ট্ সুন্দর শহর। বড় বড় দোকান, সুন্দর সব বাড়ি, রাস্তাগুলি পরিষ্কার ঝক্ঝক্ করছে। দূরে

পাহাড়ের সারি ও সমুদ্র থাকায় অনেকটা সুইজারল্যাণ্ডের মত লাগছিল। একটি গাড়ি ক'রে এখানকার সিটি হল, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, পার্লামেণ্ট হাউস ইত্যাদি দেখে এলাম।



বেলফাস্ট্ সিটি হল

রাস্তাগুলি ভারি সুন্দর, এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে উঠেছে। এমন জানলে এখানেই একদিন বেশি থাকলে হ'ত। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। কাল সকালে আমরা এডিন্‌বরা রওনা হবো। সব ব্যবস্থা পূর্ব হ'তে স্থির করা আছে। রাত্রি সাড়ে

দশটায় হোটেলে এসে তখন ডিনার পাবো আশা করিনি, কিন্তু পেলাম। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। সকাল থেকে মনেই ছিল না। এখন মনে পড়লো।

শনিবার, ২৩ জুলাই ১৯৪৯। 'রয়্যাল ব্রিটিশ হোটেল' এডিন্‌বরা॥

আজ সারাদিন ট্রেনে আর জাহাজে কেটেছে। প্রায় সন্ধ্যা সাতটায় হোটেলে পৌঁছেছি। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে 'ইয়র্ক রোড্' স্টেশনে এলাম। ন'টার সময় ট্রেনে চেপে একঘণ্টা বাদেই Larne harbour-এ পৌঁছে ট্রেন থেকে নেমে অন্য-ধারে 'প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া' জাহাজে উঠলাম। দশটার পর



গ্লাসগো — আর্গাইল ও জামায়কা স্ট্রিটের সংযোগস্থল

জাহাজ ছাড়লো। সমুদ্রের রং ঘন নীল কালির মত। খানিকক্ষণ বাদে আর কোনওদিকে পারাপার দেখা যাচ্ছিল না। মস্ত বড় জাহাজটি — চারতলা। অনেক বড় বড় ঘর আছে। ডাইনিংরূম, স্মোকিংরূম, বার্, লাউঞ্জ, লেডিস্ লাউঞ্জ

ইত্যাদি। প্রায় একটার সময় Stranraer Harbourএ স্টিমার থামলো। নেমে সামনেই প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে উঠলাম, তখনই ট্রেনটা ছাড়লো। প্রায় ৪টা নাগাদ্ গ্লাসগো পৌঁছেছি। স্টেশনটির নাম Eroch. মস্ত বড় রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের রেস্টুরেণ্টে চা রুটি ও কেক্ খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি করে আবার 'কুইন্ স্ট্রিট' স্টেশনে আসা গেল। আবার ট্রেনে উঠলাম। এখানকার গাড়িটি ভালো। লণ্ডন, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেনের মত। পাঁচটায় ট্রেন ছাড়লো এবং এডিন্‌বরাতে ছ'টা কুড়ি মিনিটে পৌঁছলো। এখানে নেমে দেখি বিরাট স্টেশন, লোকজনে সর্‌গরম। পোর্টার এসে মাল নিয়ে গেল এবং আমাদের বলে দিলে, 'তোমরা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে 'কিউ'এ যাও।' এ এক নতুন ব্যাপার। লণ্ডনে বাসে ট্রামে টিকিট কেনার কিউ দিয়েছি, এখানে আজ ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে কিউ দিয়ে আধঘণ্টা পরে ট্যাক্সি পেলাম। হোটেলে এসে ডিনার খেলাম ন'টায়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের চেয়ে স্কটল্যাণ্ড অনেক বড় এবং এরা বেশ অবস্থাপন্ন। ট্রেনে আসতে আসতে দেখছিলাম, ঠিক লণ্ডনেরই মত সুদৃশ্য সুপরিচ্ছন্ন বাড়িঘর বাগান এখানে। খুব গোলাপ ফুটে আছে। আমার আজ আর বেরুবার মত অবস্থা ছিল না, কিন্তু স্বামী ডিনার খেয়েই ঘুরতে বেরুলেন।

শুনেছিলাম স্কটল্যাণ্ডে বেজায় শীত, কিন্তু তেমন শীত এখনও তো কিছু বোধ করছি না। আয়ার্ল্যাণ্ডের মতই ঠাণ্ডা। আজ ট্যাক্সিতে আসার সময় দেখেছি খুব বড় বড় দোকান ও বাড়ি। সবই সুন্দর দেখতে। নিচে

ডাইনিংহলে খেতে নেমে দেখলাম, একধারে উঁচু প্ল্যাটফর্মে বাজনা বাজছে, তার চারধারে ফুল দিয়ে সাজানো। আমরা খেতে বসার পরে একটি লোক এসে আলাপ ক'রে বললে যে সে কলকাতায় চৌরঙ্গিতে তিন বৎসর ছিল। খানিকক্ষণ গল্প ক'রে তবে গেল। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই একটা কেষ্ট-বিষ্টু মস্ত কিছু ছিল। এখন বোধ হয় এখানে এসে ওয়েটার হয়েছে।

এখানে এসে আবার সেই 'নেই-নেই'র পালা। চিনি নেই, খাবার নেই। খুব সামান্য চিনি দেয় লণ্ডনের মত। এদের সবই কেতাদুরস্ত-ভাব। ডাইনিংহলে সব ফিস্‌ফাস্ কথা, চুপ্‌চাপ্ শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। এদিক দিয়ে আমেরিকার লোকেরা বেশ হৈ-চৈ করে খোলাখুলিভাবে।

রবিবার, ২৪ জুলাই ১৯৪৯। এডিন্‌বরা ॥

সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আজ হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম কাছা-কাছি। রাস্তাগুলি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। আজ রবিবার, সব দোকানপাট বন্ধ। দুপুরে দেড়টায় আবার বেরিয়েছিলাম। বেশ শীত, আবার সব গরম পোষাক পরতে হয়েছে। কাছেই প্রিন্সেস্ স্ট্রিটে সুন্দর ফুলভরা পার্ক। ঢুকে দেখি, সেটা কবি স্কট মেমোরিয়্যাল্ পার্ক। কবির মস্ত মর্মরমূর্তি পার্কের মধ্যে রয়েছে। এদের দেশে দেখছি চারিদিকে খুব ফুল ফুটে আছে। দোতলা ট্রামে চেপে সমুদ্রতীর দিয়ে অনেক দূর বেড়িয়েছি। চারিদিকেই পাহাড়। 'বার্চ হিল' নামে শেষ স্টপেজ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে অন্য এক ট্রামে চেপে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলাম। সেদিকে সব ছোট ছোট

বাড়ি ও ফুলের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। পেঁয়াজ, শাক, মূলা, টম্যাটো, আলু ইত্যাদির চাষও দেখলাম। বড় ভাল লাগছিল দেখে। বাসিন্দারা সবই খুব গৃহস্থধরনের, অথচ বাড়িগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য ক'রে রেখেছে। লণ্ডনের গ্রামের দিকে এই রকম বাড়িঘরই দেখেছি। স্কটল্যাণ্ডের চালচলন, খাওয়া-দাওয়া সবই লণ্ডনের মত।



প্রিন্সেস্ ষ্ট্রিট (মধ্যে স্কট মেমোরিয়্যাল দেখা যাচ্ছে)

আজ উনি সাইট্ সীয়িং-এর টিকিট কিনতে গিয়ে পান্‌নি। সমস্তই ভর্তি। কাল বেলা তু'টোর ট্রিপে আমরা যাবো। গতকাল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'তে তিনি আমার স্বামীকে বললেন, স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিন্‌বরা, কিন্তু গ্লাসগো এর চেয়েও বড় শহর। এডিন্‌বরা অবশ্য গ্লাসগোর চেয়েও পরিষ্কার এবং সুন্দর।

বিকেলে ট্রামে বেরিয়েছিলাম। ট্রামটি ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপরে উঠলো। সেখানে সব বড় বড় অফিস, ইনসিওরেন্স্

কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক। প্রায় সব বাড়িই একই ডিজাইনের। তাই আরও সুন্দর লাগে দেখতে।

সোমবার, ২৫ জুলাই ১৯৪৯। এডিন্‌বরা॥

আজ ন'টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে উনি গেলেন আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসে নরওয়ে, সুইডেন্, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের হোটেলের ব্যবস্থা জেনে নিতে। আমি হোটেলে ব'সে চিঠিপত্র লেখা সারতে লাগলাম। উনি ফিরলে একটায় লাঞ্চ খেতে গেলাম। এদের খাদ্য একেবারে বাজে। বাঁধা-কপির পাতা ও আলুসিদ্ধ, মাছসিদ্ধ — এইটা এখানে প্রধান ডিস। খেয়ে দৌড়নো হ'ল অ্যাণ্ড্রুজ স্কোয়ারে। সেখানে টিকিট



স্কট ক্যাস্‌ল্ বা এডিন্‌বরা দুর্গ

দেখিয়ে লাইন দিয়ে আধ ঘণ্টা বাদে সাইট্-সীয়িং-বাসে ওঠা হ'ল এবং সওয়া দু'টোয় বাস্ ছাড়লো। অ্যাণ্ড্রুজ স্কোয়ারে

গ্ল্যাড্স্টোনের স্ট্যাচু, স্কট্ মেমোরিয়্যাল্, স্কট্ ক্যাস্ল্ বা এডিনবরা দুর্গ (এই ক্যাস্ল্টির ভিতরে নিয়ে গিয়ে প্রায় দেড়-ঘণ্টা ধ'রে দেখিয়েছে) সেণ্ট্ গিল্স্ ক্যাথিড্রাল্, প্যালেস্ অফ্ হলিরুড্ হাউস্ (এখানে রাজারা এসে থাকেন), কিংস্ পার্ক, ইউনিভার্সিটি, ইন্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি। পুরনো ক্যাস্ল্টিতে সব হাইল্যাণ্ডের ড্রেস্ প'রে পাহারা দিচ্ছে। সেখানে রাজা-রানীদের সব ঘর ও তোষাখানা দেখালে। বেশ মস্ত বড় দুর্গ। তখনকার দিনের কিছুকিছু জিনিসপত্রও আছে। হলিরুড্ প্যালেস্ দু'শ তিনশ' বৎসর আগের তৈরি। এটিও মস্ত বড়। ইংল্যাণ্ডের রাজারানীরা এখানে এলে এখনও এখানেই ওঠেন। কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ঘর, কুইন্ মেরির ঘর ইত্যাদি সব সাজানো আছে। প্রিন্সেস্ এলিজাবেথ বিয়ের পরে এখানে যখন এসেছিলেন, এখান থেকে তাঁকে যে-সমস্ত উপহার দেওয়া হয়, সেগুলিও সাজানো আছে। প্যালেস্ দু'টি ঘুরে ঘুরে দেখেই পা ব্যথা হ'য়ে গেল।

আজ আমার খুকুর জন্মদিনের প্রণাম পাঠানো ২২শে জুলাই তারিখের টেলিগ্রামখানি আমেরিকান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানী থেকে এসে পৌঁছানোয় মন খুব খুশি হ'ল।

মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ১৯৪৯। এডিন্বরা॥

আজ এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম ট্রামে ক'রে। সেখানে বেলা তিনটেয় পৌঁছে আমরা সমুদ্রতীর ধ'রে হেঁটে এগিয়ে চললাম বেড়াতে বেড়াতে। এদের সব জায়গাই সুন্দর। কত মানুষই যে সেখানে বেড়াতে গেছে তার সংখ্যা নেই। অনেকে স্নান করছে,

নৌকা চড়ছে, বসে আছে। বুড়োবুড়িরা সব আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন। পুরো সংসার নিয়ে গেছে তা'রা। ঠেলাগাড়ি ক'রে শিশু, বালিশ, কম্বল, স্যুটকেস্ ইত্যাদি। সমুদ্রের ধার খুব উঁচু পাড় ক'রে বাঁধানো, মাঝে মাঝে বসারও জায়গা আছে। এখানে দেখলাম পুরুষরা ও বালক-বালিকারাই বেশি সমুদ্র-স্নান করছে, মেয়ে খুব কম। অন্য একধারে কতরকম খেলনা, পুতুল, খাবার ইত্যাদির দোকান। ঠিক যেন আমাদের কালিঘাটের ব্যাপার। এক জায়গায় Cony Island-এর মত। ট্রেন, নৌকা, মোটর, সাইকেল, এরোপ্লেন্ ইত্যাদিতে চ'ড়ে ছোটদের আমোদ ও ফূর্তি চলেছে। অন্য আর একদিকে বড়দের জুয়াখেলার ব্যাপার। প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত ঘুরে আমরা একটি এ্যাম্ফিবিয়াস্ মোটরলঞ্চে চ'ড়ে বেড়াতে গেলাম কিছুদূরে। আধঘণ্টা পরেই ফিরে আসা হ'ল। আমাদের সঙ্গে আরও জনকতক যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোক আমাদের ছবি তুলে নিলেন। কাল ন'টার ট্রেনে আমরা গ্লাসগো যাত্রা করবো।

বুধবার, ২৭ জুলাই ১৯৪৯। 'সেণ্ট্রাল্' হোটেল, গ্লাসগো॥

গ্লাসগোতে এসেছি। দুপুরে গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি ও ইনজিনিয়ারিং কলেজ দেখতে। পাহাড়ের উপরে অনেক জমি নিয়ে ইউনিভার্সিটি এবং সব কলেজ। কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ায় তাঁরাই আমাদের সমস্ত ঘুরিয়ে দেখালেন এবং চা খাওয়ালেন। ওদের মিউজিয়মটিও দেখালেন, তাতে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, যা' সত্যিই দেখার মত। জেম্‌স্ ওয়াট্ প্রথম যে স্টিম্ ইঞ্জিনটি বার করেন,

সেটি এখানে রয়েছে। এই সম্বন্ধে যে-সব চিঠিপত্র তিনি লেখেন সেগুলিও সশ্রদ্ধভাবে রক্ষিত আছে এখানে। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এবং লিস্টারিনের তৈরি মৌলিক সব যন্ত্রপাতিও রয়েছে। আমরা মিউজিয়ম দেখে বাইরে থেকে ইউনিভার্সিটির একটি ছবি তুলে ছাত্রদের কাছে বিদায় নিলাম।



গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়

বিকেলে হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, কুইন্‌স পার্ক, বোটানিক্যাল্‌ গার্ডেন্‌ ইত্যাদি ঘুরেছি। গ্লাসগো মস্ত বড় শহর এবং সুন্দরভাবে সাজানো। এডিন্‌বরার চেয়ে এখানে লোক সংখ্যা বেশি এবং দোকানগুলিও খুব জম্‌কালো। এটাই এদের ব্যাবসাকেন্দ্র।

কাল ভোরে আমরা 'অস্‌লো' রওনা হবো।

নরওয়ে, সুইডেন ও হল্যাণ্ড্

বৃহস্পতিবার, ২৮ জুলাই ১৯৪৯। S. A. S. বিমানপোত ॥

আজ ভোর পাঁচটায় ফোনে রিং ক'রে হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছেন। সামান্য চা রুটি খেয়েই কোনওরকমে এদের বাস্‌সার্ভিসে পৌঁছেছি ছ'টায়। সাড়ে ছ'টার পর বাস্ ছাড়লো। বেশ মেঘ্‌লা করেছিল। পথেই সুরু হ'ল বৃষ্টি। খুব শীত করছিল, ওভারকোট প'রে থাকা সত্ত্বেও।

ন'টা চল্লিশ মিনিটে বিমান ছাড়লো। শুল্ক-বিভাগের পরীক্ষায় বেশি কিছু ঝঞ্ঝাট হয়নি। বাক্সপ্যাঁটরা খোলেনি কিছুই। এই প্লেনটি আমেরিকার প্লেনের চেয়ে ছোট। যাত্রী আমরা দশজন মাত্র। প্লেনে একুশটি আসন আছে। বেলা সাড়ে দশটায় জানিয়ে গেল ৯০০০ হাজার ফীট্ উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা ২১৫ মাইল গতিবেগে। এগারোটা নাগাদ কিছু আলু, শাক ও ডিমসিদ্ধ এবং এক পেয়ালা চা খেতে দিলে। আমার বেজায় খিদে পেয়েছিল, শুধু চা ও ডিম খেলাম। সব্জিসিদ্ধ-র মধ্যে এমন একটা গন্ধ যে তা ছুঁতে পারলাম না। সাড়ে বারোটার সময় Stavenger নামে এক জায়গায় আধঘণ্টার জন্য প্লেন মাটিতে নামলো। তখন টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। এখানেই মালপত্র নামিয়ে কাস্টম্‌স্ সব পরীক্ষা ক'রে নিলে। এ জায়গাটা নরওয়ের মধ্যে। 'অস্‌লো'য় নেমে আর বোধহয় এ-হাঙ্গামা করবে না। বেলা একটায় আবার প্লেন ছাড়লো। দু'টোর পরে অস্‌লো পৌঁছবো।

বৃহস্পতিবার, ২৮ জুলাই ১৯৪৯। 'রেজিনা হোটেল', অস্‌লো ॥

বেলা আড়াইটায় অস্‌লোতে পৌঁছেছি। S.A.S. বাসে ক'রে এদের অফিসে পৌঁছে সেখান থেকে ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে এলাম বেলা চারটেয়। ঘরটি দিয়েছে মস্ত বড় এবং খুব চমৎকার আসবাবে সুসজ্জিত, কিন্তু সংলগ্ন-বাথরুম নেই। তবে ঘরের মধ্যে মুখ ধোয়ার বেসিন এবং জল আছে। যে-মহিলাটি রিসেপ্‌শানে আছেন, তিনি ইংরাজিভাষা ভালই বোঝেন। তাঁকে ব'লে আমরা চায়ের জন্য উপরে ডাইনিংহলে গেলাম। চা, রুটি, বিস্কুট দিলে। এখানে চিনির কষ্ট নেই দেখছি। নিচে নেমে রাতে আমরা কি খাবো সেই ভদ্রমহিলার কাছে জানিয়ে বেড়াতে বেরুলাম পাঁচটার পর।

রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবে পাহাড়ে-রাস্তা। একবার নেমে গেছে, একবার উপরে উঠেছে। রাস্তায় লোক খুব কম। ট্রাম বাস্ আছে। বাড়িগুলি সবই সেকেলে ছাঁদের এবং বড় বড়। মাঝখানে পার্ক ও ফুলে-ভরা জমি। লোকের বাড়িতেও খুব ফুল ফুটে আছে। কিছুদূর যাবার পর বৃষ্টি আসায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে চ'লে এলাম।

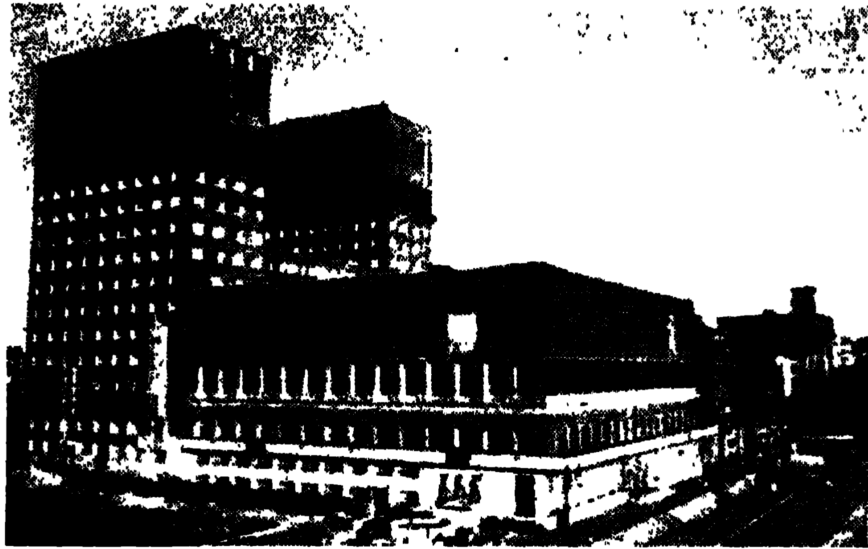
হোটেলে এসে এক ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বম্বে থেকে স্বামী-স্ত্রী এখানে এসেছেন। ওঁরা ইয়োরোপ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোক এসেছেন নিজের ব্যবসায়ের কাজ-কর্মে, ঐ সঙ্গে ভ্রমণটাও সেরে যাচ্ছেন।

রাত্রে খাওয়া বেশ ভালই দিয়েছিল আজ। এখানকার মাছ খুব মিষ্টি। এখান থেকেই মাছ ইংল্যাণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সব জায়গায় যায়। শশা এখানে একটা খুব ভাল খাদ্যরূপে গণ্য। খেয়ে আমি ঘরে এলাম। স্বামী সামনেই

বসার ঘরে এক ড্যানিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়েছেন।

শুক্রবার, ২৯ জুলাই ১৯৪৯। অস্‌লো॥

এরা সকালে ব্রেকফাস্ট ঘরেই দিয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে এখানকার বড় পোস্টঅফিসে গিয়ে পোস্টেজ কেনা হ'ল। হোটেল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমার স্বামী জেনে নিলেন কোথায় গেলে ফিশারি ডিপার্টমেণ্টে যাওয়া যাবে। খুঁজে খুঁজে সেখানে যাওয়া হ'ল। প্রথমে যে-ভদ্রলোক সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন, তিনি তাঁদের অফিসারের ঘরে আমাদের পৌঁছে



অস্‌লো টাউন হল

দিলেন। তাঁর সঙ্গে উনি কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এদের বিরাট আকারের মৎস্য-ব্যবসায়। এখানে তারই সব অফিস। ঘণ্টাখানেক কথা ক'য়ে ঠিক হ'ল যে, ওঁদের যেখানে মাছধরা বা রাখার ব্যবস্থা, অফিসার ভদ্রলোক সেখানে ফোন ক'রে যদি

সম্ভবপর হয় আগামীকাল দেখাবার ব্যবস্থা করবেন এবং কাল ফোনে সে-সংবাদ আমাদের জানাবেন।

হোটেলে ফেরার পথে 'সাইট্ সীয়িং টুরে'র টিকিট কিনে ফেরা হ'ল। চট্পট্ খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম। এখানে



ফ্রোনার পার্কে বিখ্যাত ভিল্যাণ্ডস্ মনোলিথ্ স্তম্ভ

এমনিই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে সুন্দর। দ্রষ্টব্য হিসাবে যা'-কিছু আছে, দু'ঘণ্টায় সবই দেখিয়ে দিলে— এখানকার রয়্যাল প্যালেস্, পাব্লিক লাইব্রেরি, টাউন হল, কোর্ট, ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার, মিউজিয়াম, কয়েকটি গির্জা, স্ট্যাচু, ফ্রোনার পার্ক ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর পার্ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই চার বছরে এরা যে নতুন শহরটি বাড়িয়েছে, সেটাতে সব সুন্দর বাড়ি বাগান তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে পুরনো শহর। পুরনো ধরনের বড় বড় পাথরের বাড়ি ও কাঠের ছোট ছোট বাড়ি। পাহাড়ের ঊর্ধ্বে ঘুরে ঘুরে পাক্ দিয়ে শহর উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়ে সেখানে

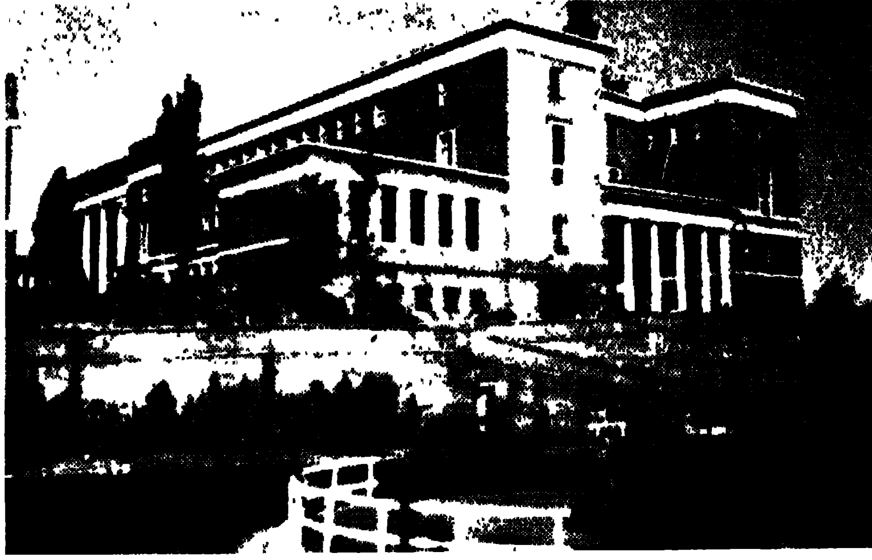
দশ মিনিটের জন্য নামিয়ে উপর থেকে শহরের দৃশ্য দেখালে পাহাড়ের উপরটিতে অনেক জমি সমতল ক'রে নিয়ে সুন্দর ক'রে খেলার এবং বেড়াবার লন্ তৈরি ক'রে রেখেছে।



ন্যাশনাল থিয়েটার — অস্‌লো

নতুন শহর যেটি হয়েছে তা'তে বেশিরভাগই ফ্ল্যাট্ এবং তা' আমেরিকান ধরনের। তবে আটতলার বেশি কোনোটা উঁচু নয়। এখানকার হাসপাতালটি বেশ বড় এবং অনেকটা জমি নিয়ে বাইরেটা সুন্দর বাগান ক'রে রেখেছে। সেই বাগানের মধ্যে ছোট ছোট কটেজ আছে। যারা ইচ্ছা করে, হাসপাতালে না থেকে কটেজ ভাড়া ক'রেও থাকতে পারে। হাসপাতালটিতে ৭০০ বেড্ আছে। এখানে এই দু'দিন এত ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদের হোটেলের সেই ভারতীয় মুসলমান-দম্পতি ছাড়া আর দ্বিতীয় ভারতবর্ষীয় মানুষ চোখে পড়েনি। এখানকার মেয়েরা অনেকেই লম্বা প্যান্ট্ প'রে আছে। বোধহয় শীতের জন্য। এক আমেরিকা ছাড়া লণ্ডন ও ইয়োরোপের

অন্যান্য জায়গায় লম্বা-প্যান্ট-পরা মেয়েদের খুব কমই দেখেছি। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ভাঙা ভাঙা ইংরাজি জানে, তাই বেশি অসুবিধা হয় না। তবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইংরাজি জানে না। যেমন, হোটেলের দাসী, ওয়েটার, কুলী বা মোটর-ড্রাইভাররা। প্রত্যেক দেশের খাওয়ার পদ্ধতি



পাব্‌লিক লাইব্রেরি — অস্‌লো

বিভিন্ন এবং খাদ্যসামগ্রীরও পার্থক্য আছে। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে খাবার পরিবেশন ক'রে পরিবেশনকারী কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। খাওয়া হয়ে গেলেই সে-ডিশ্‌ সরিয়ে নিয়ে আবার নতুন ডিশ দিয়ে যায়। এখানে সমস্ত রকম খাদ্য-সামগ্রী টেবিলে সাজিয়ে রেখে দরজাটি বন্ধ ক'রে তারা চলে যায় ; দরকার হ'লে কলিংবেল্‌ টিপে ডাকলে আসে।

শনিবার, ৩০ জুলাই ১৯৪৯। অস্‌লো॥

সকাল থেকে আজ ঘরেই ছিলাম আমি। স্বামী ব্রেক-ফাস্টের পর একপাক ঘুরে এলেন। তারপর স্নানাহার সেরে

আবার একবার বেরিয়েছিলেন Casino দেখার জন্য। কিন্তু আজ শনিবার, খুব ভিড়, তাই টিকিট পান নি। বিকেলের দিকে একবার সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে সাতটায় ফিরেছি। এখান থেকে হেঁটে রয়্যাল প্যালেস পর্যন্ত উঠে সামনের পার্কে ব'সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে একটি রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা খাওয়া গেল। চা খেয়ে একটি বাসে চেপে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে আবার সেই বাসেই ফেরা হ'ল। আজ শনিবার, সব দোকান অফিস ছু'টোর সময় বন্ধ হয়ে গেছে। বিকেল হ'তে না হ'তেই রাস্তায় লোকই যেন নেই। এখানে লোক খুবই কম। আয়ার্ল্যাণ্ডও এইরকম ফাঁকা, কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে বহু লোক। রাস্তায় লণ্ডনের মত ভিড় লেগে আছে।

এখানকার মেয়ে পুরুষ খুব লম্বা এবং অধিকাংশ মানুষই বেশ দোহারা-চেহারা। নরওয়ের পালা শেষ। কাল শুরু হবে আমাদের সুইডেনের পালা।

রবিবার, ৩১ জুলাই ১৯৪৯। 'হোটেল ডেকার', স্টকহল্‌ম॥

সকাল সাতটায় হোটেল থেকে বেরিয়েছি আজ। আগের দিন হোটেল কর্তৃপক্ষ বলেই দিয়েছিল, অত সকালে চা দিতে পারবে না। আমরা ঠিক করেছিলাম স্টেশনে চা রুটি কেক খেয়ে নেবো। ওমা! স্টেশনে এসে দেখি একটাও চায়ের দোকান নেই। অত সকালে ওখানে দোকানপাট খোলে না। সাড়ে সাতটায় ট্রেন ছাড়লো। ডাইনিং-কার নেই এ-ট্রেনে। এদিকে তো খিদেয় ছু'জনের পেট চুঁইচুঁই করছে। তার উপরে প্রাতঃকালীন চায়ের তৃষ্ণায় সারা শরীরে অস্বস্তি। ক্রমাগত হাই উঠছে আর ঘুম পাচ্ছে।

বেলা প্রায় দশটায় ব'লে গেল, একটা স্টেশনে পনেরো মিনিটের জন্য ট্রেন থামবে, সেখানে চা খেয়ে নিতে পারো। সেখানে গাড়ি থামবামাত্র পিল্ পিল্ ক'রে প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়লো। আমরাও নামলাম। কিন্তু হায়, একটি মাত্র রেস্টুরেণ্ট। সেখানে ঢোকে কার সাধ্য? স্বামী তো সে-ভিড়ে ঢুকতেই পারলেন না। বেলা প্রায় তিনটের সময় ট্রেনের সঙ্গে একখানি ছোট রেস্টুরেণ্ট-কার জুড়ে দেওয়ায় তখন এক কাপ ক'রে চা ও বিস্কুট অনেক কষ্টে সংগ্রহ ক'রে খেয়ে এলাম দু'জনে। কারণ, রেস্টুরেণ্ট-কারে তখন বেজায় ভিড়।

সাড়ে ছ'টায় স্টকহল্মে পৌঁছুবার কথা। সাড়ে সাতটায় পৌঁছলো গাড়ি। একটি ঘণ্টা লেট্। স্টেশনে নেমেই কি অব্যাহতি আছে? সারাদিন উপবাসে অবসন্ন দেহে ট্যাক্সির জন্য ধর্না দিয়ে লাইন ক'রে কিউয়ে দাঁড়াতে হ'ল। প্রায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। আটটার পর হোটেলে এসে পৌঁছলাম। যাক্! হোটেলে পৌঁছে ভাবলাম, এবার খেতে পাবো এবং খেয়েই শুয়ে পড়বো। কিন্তু বিধাতা আজ আমাদের প্রতি বিমুখ! রিসেপ্‌শনে যে-ভদ্রলোক ছিলেন তাঁকে খাওয়ার কথা বলতেই তিনি উত্তর দিলেন—আজ রবিবার। সেইজন্য ছ'টার সময় হোটেলের সমস্ত খাবার নিঃশেষ হয়ে গেছে। খাদ্য কিছুই নেই।

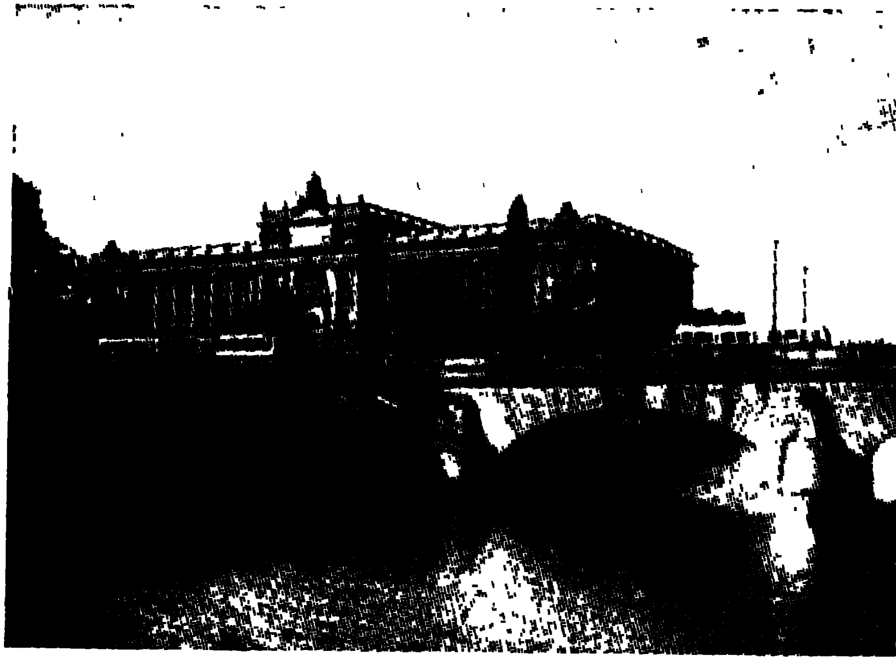
মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ার অবস্থা হ'ল তখন। যাই হোক, তিনি দয়া ক'রে বলে দিলেন, 'কাছেই রেস্টুরেণ্ট আছে, তোমরা সেখানে গিয়ে খেয়ে আসতে পার।'

কোনওরকমে হাতে মুখে জল দিয়েই আবার ছুট্—ছুট্! আবার না হাতছাড়া হয়ে যায় খাবার। রেস্টুরেণ্টে

গিয়ে দেখি সেখানেও আজ বেজায় ভিড়। প্রায় আধঘণ্টা ধর্না দিয়ে বসে থেকে সমস্ত দিনের পর আমরা খেতে পেলাম।

সোমবার, ১ অগাস্ট ১৯৪৯। স্টকহল্‌ম॥

সুইডেনে এসেছি। লণ্ডনে থাকতে অনেকেরই মুখে শুনেছিলাম, সুইডেন্ হচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভেনিস্। সত্যিই এখানে পাহাড় এবং লেক অনেক থাকায় শহরটি ভারি সুন্দর। ১৬টি দ্বীপ নিয়ে স্টকহল্‌ম, সেইজন্য জলের উপর দিয়ে অনেক পুল রয়েছে পারাপারের জন্য। প্রতিটি দ্বীপই সুন্দর সাজানো

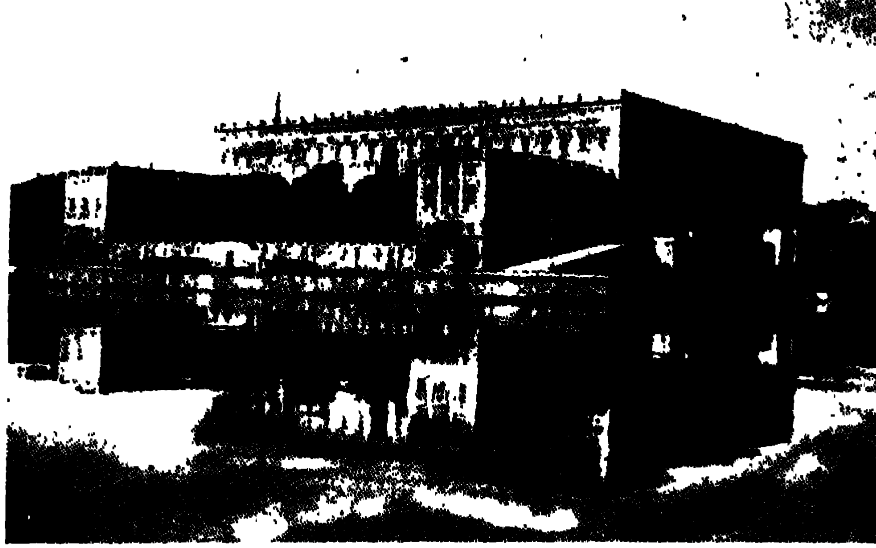


স্টকহল্‌ম পার্লিয়ামেণ্ট

শহর। কেবলই মনে হয়, এদিকে-ওদিকে জল, মধ্যের মাটিতে রয়েছি আমরা। পাহাড়গুলি কেটে বাড়ি করেছে, কিন্তু আশপাশের পাহাড় যেমন তেমনি রেখেছে। সেইজন্য দেখতে অতি মনোরম।

আজ সকালে বেশ মেঘলা করেছিল। ঠাণ্ডাও খুব। ব্রেকফাস্ট খেয়ে কন্‌কনে হাওয়া আর ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টির মধ্যে আমরা বেরুলাম সাইট্‌ সীয়িং কোম্পানীর উদ্দেশে। খুঁজে খুঁজে ওদের অফিসে পৌঁছে টিকিট কেনা হ'ল ১০টার ট্রিপের জন্য।

আজ সাইট্‌ সীয়িং কোম্পানী প্রথমে পুরনো শহরটি দেখালে। প্রাচীন কালের সব বিরাট বিরাট পাথরের বাড়ি। মডার্ন শহরটি আধুনিক ধরনের বাড়ি-ঘরে তৈরি। বহু ফ্ল্যাট-বাড়ি হয়েছে — আমেরিকান পদ্ধতিতে দশ বার-তলার উঁচু ফ্ল্যাটে বিভক্ত বাড়ি। এই সব বাড়িতে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকেরাও থাকে। লীজ্‌ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ভাড়ায়



স্টকহল্‌ম রাজপ্রাসাদ

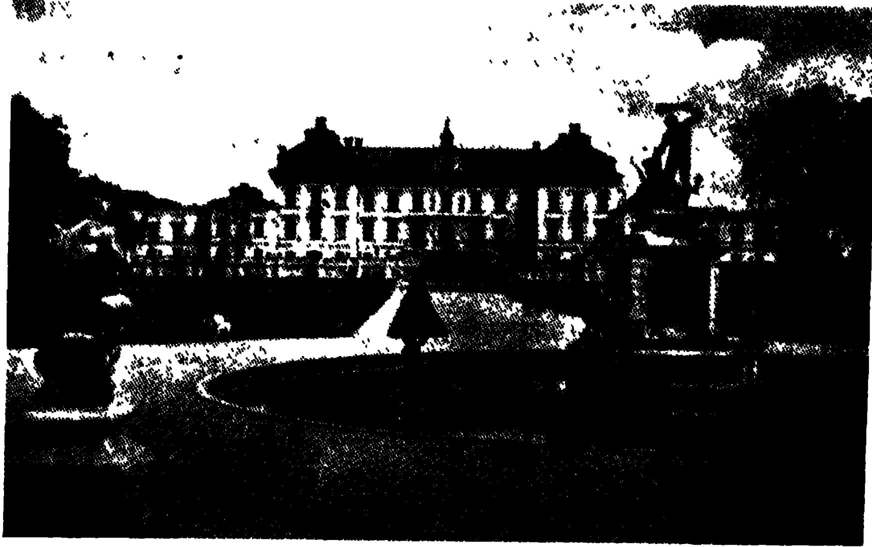
পাওয়া যায় ঐ সব ফ্ল্যাট্‌। এখানকার রাজপ্রাসাদ, পার্লামেণ্ট, লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি, নানারকম স্কুল, হাসপাতাল, অনেকগুলি গির্জা, সিটি হল, কোর্ট ইত্যাদি বহু দ্রষ্টব্য জিনিস দেখালে। অনেকখানি জমি নিয়ে বিরাট হাসপাতাল

— সেখানে ১২০০০ বেড্ আছে। প্রত্যেক রোগীর জন্য এক-একখানি ঘর এবং এর তলায় একটি প্রকাণ্ড এ. আর. পি. 'শেল্টার্' আছে, যেখানে, দরকার হ'লে সমস্ত রোগীই আশ্রয় নিতে পারে। এদের বিরাট স্টেডিয়ামও দেখার মত। বহু খেলার মাঠ তৈরি ক'রে রেখেছে ছেলেদের জন্য। বালক-বালিকাদের জন্য সুইমিং-পুল, চিল্ড্রেন্স্ গার্ডেন্, দোল্না, সী-স, প্রভৃতি নানারকমের খেলার খেয়াল সাজিয়ে রেখেছে। ছোট বাচ্ছাদের একটি পার্কে ছোট ছোট কাঠের ঘর এমন ভাবে বানিয়ে রেখেছে, যার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা সহজেই ঢুকতে পারে। তার পাশেই এমন সব টুক্‌রা কাঠ রাখা আছে, যেগুলি নিয়ে বাচ্ছারা স্ব-ইচ্ছায় ঠিক অমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের ঘর তৈরি করবে ঐ ঘরখানি দেখে দেখে। শিশুদের জন্য বহু নার্সারি-স্কুলও আছে দেখলাম।

গাড়ি যখন এক-একটি পাহাড়ে উঠছিল, খুব ভালো লাগছিল। দু'পাশে সুন্দর গাছপালা, মাঝ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা উঠেছে পাহাড়ে। পুরনো শহরের মধ্যে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বহু শতাব্দী আগে সুইডিশ্‌রা কিরকম বাড়িতে বাস করতো তার কয়েকটা নমুনা দেখালে। পাহাড়ের গায়েই এত সুন্দর হাতে-তৈরি ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ি, ঠিক যেন পাহাড়ের মধ্যেই ঘর, মনে হয়। এখনও কবিরা নাকি ঐ সব বাড়িতে গিয়ে বাস ক'রে থাকেন। যখন ঘুরছিলাম, দেখলাম পথের দু'পাশে গাছে আপেল ও চেরি লাল হ'য়ে ফলে রয়েছে। দেখে ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে পেড়ে আনি হাতে ক'রে।

বেড়িয়ে বেলা সাড়ে বারোটায় সাইট্ সীয়িং কোম্পানীর অফিসে আমরা ফিরলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল ব'লে ওখান থেকে

একখানি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। শীতে আমার তো হাত-পা জ'মে যাবার জোগাড়। ভাবলাম আজ আর বাইরে খেতে বেরুবো না, হোটেলেই যা-হোক-কিছু খেয়ে নেবো। ওমা! এরা বলে কি না যে হোটেলের মেম্বার-লিস্টে আজ আমাদের নাম নেই! আবার বেরুতে হ'ল বাইরে। কাল রাত্রে যে-রেস্টুরেণ্টে খেয়েছিলাম সেখান থেকে খেয়ে এলাম বেলা প্রায় দু'টোয়। খেয়ে উঠে আমি আর



সোয়েডেনের রাজার গ্রীষ্মাবাস

বেরুলাম না। উনি গেলেন দাদার জন্য দূরবীন্ কিনতে। চারটের সময় তিনি ফিরে এলেন। বললেন, একটি দোকানে দূরবীন্ দেখে পছন্দ ক'রে রাখা হয়েছে। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। চা খেয়ে পাঁচটার সময় বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে এক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কোন্ নম্বরের ট্রামে উঠলে বেশি দূরে যাওয়া যায়। সে আমাদের চার নম্বর ট্রামে তুলে দিলে। বলে দিলে, 'এই ট্রামটি সমস্ত• স্টকহল্মের

ট্রাম-লাইন ঘুরে এখানে ফিরে আসবে। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে আমরা সারা স্টকহল্‌ম প্রদক্ষিণ ক'রে যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম সেই জায়গায় আবার ফিরে এলাম। শহরটি অতি সুন্দর, যেন একখানি ছবি।

বিকেলে আমরা গরিবদের পল্লীর দিকে গিয়েছিলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় ফ্ল্যাট্‌বাড়ি। এদেশে জনসংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্যে বেশ একটি নিয়ম আছে শুনলাম। প্রত্যেক সন্তান-পিছু ভাড়াটিয়াদের দশ পার্সেণ্ট ক'রে ভাড়া কমে যায়, এমনি ব্যবস্থা আছে। এই রকমে পর পর আটটি সন্তান হ'লে আশি পার্সেণ্ট ভাড়া কমে যায়, কিন্তু তার বেশি হ'লে আর কমে না। এই ব্যবস্থা দেখে খুব আনন্দ হ'ল। এর ফলে দেশের দু'টি কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট দেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য এই যে সুব্যবস্থা করেছেন, ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সংকোচের সমতার চেষ্টা — এর দ্বারা দেশের জনসাধারণ সেই গভর্নমেণ্টের অনুরাগী ও অনুগত না হয়ে পারে না। আমাদের ভারতবর্ষের দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্তরা অবস্থার চাপে নিষ্পিষ্ট মরণাপন্ন হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লেও গভর্নমেণ্ট আজও পর্যন্ত এমন একটাও কিছু বন্দোবস্ত করতে পারেন নি, যাতে দেশের দরিদ্র ও আর্ত মানুষরা উপলব্ধি করতে পারে যে আমাদের নিজেদেরই গভর্নমেণ্ট হয়েছে, আমরা আজ স্বাধীন দেশের মানুষ। কোনও সুবিধা, কোনও স্বস্তি, এমন কি কোনও ন্যায্যপ্রাপ্য সুব্যবস্থাও দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় পায়নি আজও ভারতবর্ষে। বরং বিপরীত ব্যাপারই চলেছে। আমাদের দেশের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের দুঃখময় জীবনযাত্রাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই স্টকহল্‌মে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক বাস করে। নরওয়ের মত সুইডেনেরও মেয়ে এবং পুরুষরা খুব লম্বা। এখানে আর-একটি মজার দৃশ্য দেখলাম। বড় বড় রাস্তার মোড়ে সাইকেলস্ট্যাণ্ড আছে, সেখানে হাজার হাজার সাইকেল রয়েছে। গাইড দেখিয়ে বললে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাইকেল ব্যবহৃত হয় কোপেনহেগেনে এবং তার পরেই এই স্টকহল্‌মে। সত্যিই দেখবার মত ব্যাপার। আমি কয়েকটি



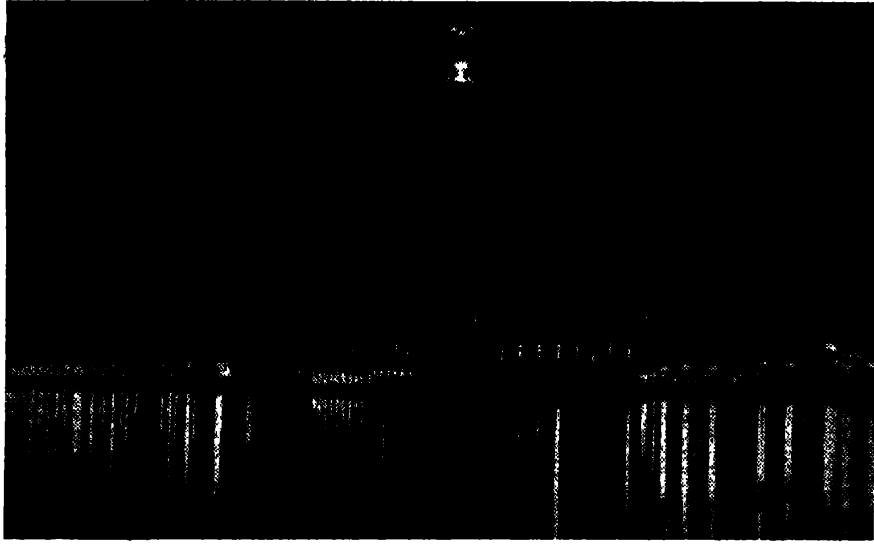
স্টকহল্‌ম লাইব্রেরি

স্ট্যাণ্ডে গুণ্‌তে গিয়ে শেষ করতে পারিনি। সমস্ত সাইকেলই আল্‌গা দাঁড় করানো, চাবির বালাই নেই। আমাদের দেশের মত ওদেশে সাইকেল চুরি যায় না। গাইড বলছিল,— 'আমাদের দেশে অত্যন্ত দরিদ্র বা ভিক্ষুক কেউ নেই।' আমার মনে হ'ল, হায়! কবে ভারতবর্ষের গাইডরাও বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের ভারতবর্ষ দেখাবার কালে এমনি ক'রে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারবে, 'আমাদের দেশে অতিদরিদ্র অথবা ভিখারী নেই।'

মঙ্গলবার, ২ অগাস্ট ১৯৪৯। স্টকহল্‌ম ॥

কাল আমরা এখানকার প্রকাণ্ড অপেরা দেখলাম। এছাড়া এখানকার ন্যাশন্যাল ড্রামাটিক্‌ হল্‌ও দেখেছি।

সকাল বেলায় ঘরের মধ্যেই প্রাতর্ভোজন সেরে উনি নেমে গেলেন চুল কাটতে। হোটেলের নিচেই হেয়ারকাটিং সেলুন। উনি ফিরলে দু'জনে বেরুলাম পায়ে হেঁটে শপিং-সেণ্টারে।



স্টকহল্‌ম টাউন হল— রাত্রে

এখানেও খুব বড় বড় দোকান সুন্দর ক'রে সাজানো আছে। ঘুরে ঘুরে ছোটখাটো দু'একটি জিনিস কিনে বেলা একটায় ট্রামে ক'রে ফেরা গেল। এখানে ট্রামে প্রতিজনের ভাড়া ত্রিশ 'অর' ক'রে। সেই টিকিটে একঘণ্টা যে কোনও ট্রামে যতদূর ইচ্ছা বেড়াতে পারা যায়, তারপর সে-টিকিট আর চলবে না। সেইজন্যে টিকিটের গায়ে তারিখ এবং সময়ের উপরে দাগ দিয়ে দেয়। হোটেলে এসে স্নান ক'রে এদেরই ডাইনিংহলে খাওয়া সেরে নেওয়া গেল। খেয়ে উঠে আজ একটু শুয়ে বিশ্রাম

করা গেছে। তারপর সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে পার্কে ও ফুলের বাজারে ছবি তোলা হ'ল।

ঘুরে ঘুরে আজ পা ব্যথা করছিল, তাই এরিক্‌সন স্ট্যাচুর নিচেয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে একখানি ট্যাক্সি ধ'রে হোটেলে



স্টকহল্‌ম ফুলের বাজারে

ফিরে চা খেলাম। আজ এখানে আমাদের পরম ভক্তিভাজন সাধুবাবার জন্য একখানি এদেশী রেশ্‌মি বেড্‌কভার কিন্‌লাম। আমার নিজের ঘরের জন্য একটা কিনে নেওয়ার বড় ইচ্ছা ছিল,

কিন্তু বিমানপথে ওজনের হাঙ্গামা এবং পথে পথে শুল্কঘাটের ঝঞ্ঝাটের জন্য সঙ্গী ভদ্রলোকটি কিছুতেই কিনতে দিলেন না।



এরিক্‌সন্‌ স্ট্যাচুর নিচেয়

বুধবার, ৩ অগাস্ট ১৯৪৯। 'আমেরিকান্‌ হোটেল', আম্‌স্টার্ডাম॥

সকাল আটটায় স্টকহল্‌ম থেকে এয়ারপোর্টে আসি এবং ন'টা দশ মিনিটে প্লেন ছাড়ে। স্টকহল্‌মে ঢুকবার সময়ে এবং বেরুবার সময়ে কাস্টমস্‌ বিভাগ কিছুমাত্র কষ্ট দেয়নি। পাস-পোর্ট দেখে যৎসামান্য জিজ্ঞাসা ক'রেই ছেড়ে দিয়েছে।

দশটার সময় বিমানের মধ্যে চা, কেক্, রুটি ও চীজ্ একবার খেতে দিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ্ কোপেন্‌হেগেনে (ডেন্‌মার্ক) নেমে বিমান প্রায় আধঘণ্টা সেখানে ছিল। এয়ার-পোর্টের একটি দোকান থেকে আমি একটি ক্ষুদ্র খেল্‌না-বোট্ এবং ছবি কিনলাম। ডেন্‌মার্কের টাকা না থাকায় সুইডেনের অর্থ বদ্‌লে জিনিস কেনা হ'ল। প্লেন ছাড়ার একটু পরেই লাঞ্চ দিয়ে গেল। আজ দূরবীন্ সঙ্গে থাকায় উপর থেকে নিচের দৃশ্য বসে বসে দেখছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল। বারোটার সময় ব'লে গেল, আমরা চৌদ্দহাজার ফীট্ উপর দিয়ে আড়াইশো মাইল স্পীডে উড়ে চলেছি ব্যাল্‌টিক্ সাগরের উপর দিয়ে। ঠিক বেলা ত্ব'টোয় আমস্টার্ডাম এয়ারপোর্টে নামলাম।

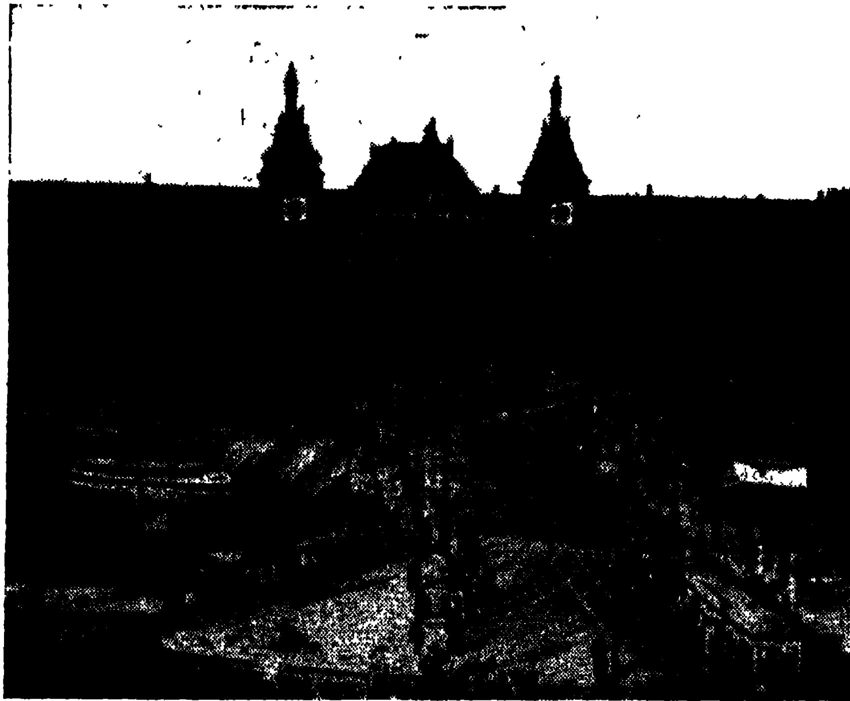


আমেরিকান হোটেল—আমস্টার্ডাম

আমেরিকান্ হোটেলটি প্রকাণ্ড এবং চৌরাস্তার মোড়ের উপরে। মস্ত বড় ঘর এবং প্রকাণ্ড বাথরূম দেখে স্বামী খুব সন্তুষ্ট ; কারণ, অস্‌লো এবং স্টকহল্‌মে সংলগ্ন-বাথরূম পাওয়া না

যাওয়ায় বেচারার বড়ই অসুবিধা হয়েছিল। কোনও বিলাসিতা বা বাবুগিরি এঁর দেখলাম না কোনও দিনই। কেবলমাত্র ঐ নিজস্ব ঘর ও স্নানকক্ষটি না হ'লে ভারি মুস্কিলে প'ড়ে যান।

এখানকার হোটেলের মেড্, ওয়েটার, লিফট্‌ম্যান সকলেই বেশ ইংরাজিতে কথা বলছে। তাই কোনই অসুবিধা নেই। আজ ঝির্‌ঝির্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে এবং আকাশ মেঘ্‌লা হয়ে আছে।



আমস্টার্ডাম সেণ্ট্রাল স্টেশন

বৃহস্পতিবার, ৪ অগাস্ট ১৯৪৯। 'আমেরিকান্ হোটেল,' আমস্টার্ডাম্॥

সকাল থেকে আজ খুব ঘোরা হয়েছে। প্রায় ১০টার সময় সাইট্‌ সীয়িংএর বাস্ এলো আমাদের তুলে নিতে। এখান থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে সাড়ে দশটায় বেরুলো শহর দেখাতে। প্রথমে সেণ্ট্রাল স্টেশন দেখিয়ে তারপর

রয়্যাল্ প্যালেস্ দেখালে। অত্যন্ত সাদাসিধা প্রকাণ্ড এক বাড়ি, অনেক কালের পুরনো — দেখলেই বোঝা যায়। গাইড্ ব'লে দিলে, এই প্রাসাদটি ১৬৪৮ সালে নির্মিত। টাউনহল, সিটি কোর্ট (এটি প্রকাণ্ড), রেমব্রান্ট্স্ হাউস, ক্যাথলিক্ চার্চ, জ্যুইস্ সিনাগগ্, মিণ্ট্ টাওয়ার, স্টেডিয়াম্ (১৯২৭), এখানকার সব চেয়ে উঁচু বাড়ি মিউজিয়ম ও নতুন শহর



আমস্টার্ডাম মিউজিয়ম

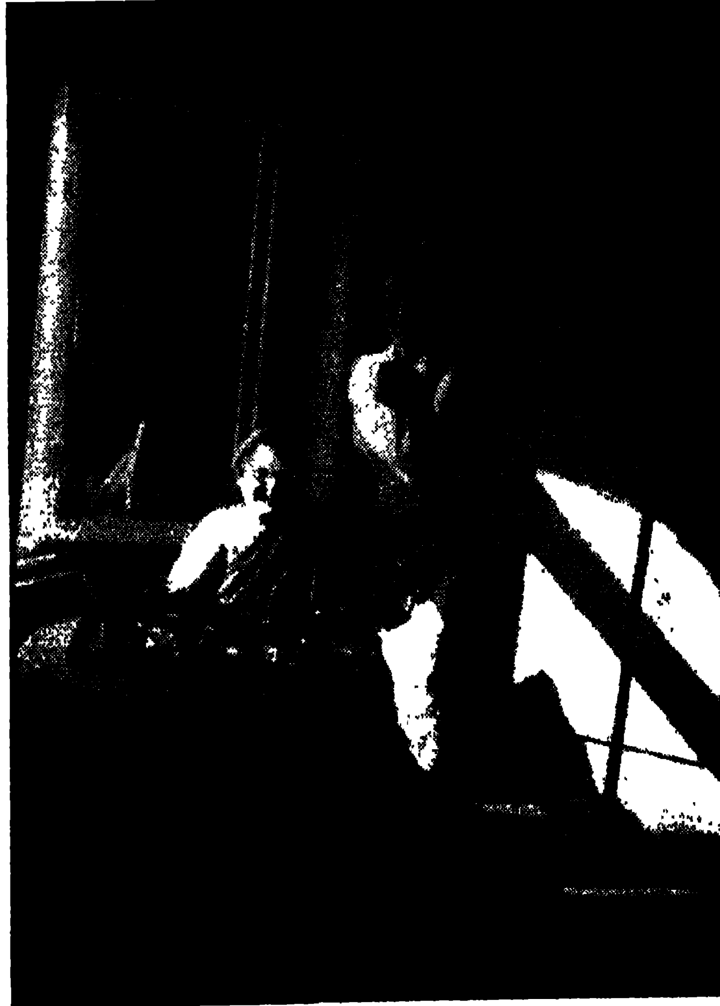
দেখলাম। মিউজিয়মটি খুব বড় এবং চমৎকার। দেড়ঘণ্টায় কিছুই দেখা যায় না তার। সুন্দর ছবি এবং স্ট্যাচুও আছে। ইটালী ও ফ্রান্সের মিউজিয়মে এই রকম সব ছবি দেখেছিলাম। নতুন শহরটি তৈরি হ'য়েছে ১৯২০ সালের পরে। এ শহরটি ঠিক ছবির মতন। রাস্তার দু'পাশে এক আকারের এক

মাপের এক প্যাটার্নের এবং এক রঙের বাড়ি। একসারি বাড়ি, তারপরে চওড়া রাস্তা, তারপরে পার্ক, আবার রাস্তা, আবার এপাশে একসারি বাড়ি। মধ্যের পার্কে সুন্দর লন্ ও বসার জায়গা। এইরকম প্ল্যানে আগাগোড়া গড়া শহরটি দেখে খুব ভালো লাগলো। তারপরে আর-একটি জায়গায় নিয়ে গেল — সেদিকটি জার্মানরা যুদ্ধের সময়ে হেড্-কোয়ার্টার করেছিল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চিহ্নিত অনেক ভাঙাচোরা বাড়ি দেখালে। গাইডটি বৃদ্ধ। সে বলতে লাগলো — '১৯৪১ সালে আমরা কতো কষ্টে ছিলাম ভাবা যায় না। কত-দিন ভাল ক'রে খেতেও পাইনি' ইত্যাদি। একটি জায়গায় খুব সুন্দর বাগান রচনা ক'রে এখানকার একটি জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ক'রে রাখা রয়েছে এক বেদীর উপরে। শুনলাম, জার্মানরা প্রথম যে-রাতে এখানে প্রবেশ ক'রে এখানকার সতেরোজন যুবককে ধ'রে এনে ঐ জায়গায় হত্যা করে, — তাদেরই স্মৃতির জন্য ঐ বেদীটি রচনা ক'রে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ক'রে মৃতদের সম্মানিত ক'রে রাখা হয়েছে। 'শহীদ বেদী' আর কি! অনেক ঘুরিয়ে প্রায় দেড়টার সময় আমাদের ছেড়ে দিলে। হোটেলে ফিরে আজ স্নান হ'ল না, খেতে চলে গেলাম।

শুক্রবার, ৫ অগাস্ট ১৯৪৯। 'আমেরিকান্ হোটেল',
আমস্টার্ডাম্॥

এখানে খুব ফুল ফুটে আছে চারিদিকে। রাস্তায় ঠেলাগাড়ি ক'রে ফুল ও ফল বিক্রি হচ্ছে। এদেশের মানুষগুলি খুব লম্বা ও সুশ্রী।

উনি তো এবার দেশে ফেরার জন্য বেজায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। বলছেন, — 'প্যারিসে দু'দিনের বেশি আর থাকবো না। আর ভালো লাগছে না।'



আমেরিকান হোটেলে প্রাতরাশ

এখানে স্টকহল্‌মের মতই শীত। তবে কাল ও আজ আবহাওয়া খুব ভাল পড়েছে, তাই বেশি শীত করছে না। এই হোটেলের দু'টি মেড্‌ অল্পবয়সী মেয়ে। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। তারাও সামান্য একটু একটু ইংরাজি জানে। সেই

জন্য কথা বলা যায়। তারা মাঝে মাঝে এসে গল্প ক'রে যায়। আজ আমার সঙ্গে তা'রা ছবি তুলেছে। আমার শাড়ি ওদের বেজায় পছন্দ।

আজ সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বড়ই ক্লান্ত। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে আমেরিকান্ কোম্পানীতে কাজ সারতে এগারোটা বাজলো। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ড্যাম্ স্কোয়ারে শপিং-সেণ্টারে পৌঁছলাম। তখন প্রায় একটা। সেখানেই একটি বড় হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে চারটে পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দোকান দেখে এবং কিছু জিনিসপত্র কিনে আবার হোটেলে ফেরা হ'ল। চা খাওয়ার পরে আবার বেরিয়েছিলাম। হেঁটে কাছাকাছি ক্যানেলের পাশ দিয়ে ঘুরে ফিরলাম। কাল সকালে আটটা পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন ধরতে হবে। এইবার প্রত্যাবর্তনের মুখে বাড়ির জন্য মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। আমাদের ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণের পালা এই আম্-স্টার্ডামেই সমাপ্ত হ'ল। এবার প্রত্যাবর্তন-পথের শেষ কাহিনীটকু জানিয়ে বিদায় নেবো।

ভারতবর্ষের পথে

শনিবার, ৬ অগাস্ট ১৯৪৯। 'অ্যাম্বাসাডার হোটেল', প্যারিস ॥

এতদিন চ'লেছিলাম দেশ ছেড়ে বিদেশের অভিমুখে। এবার প্রবাসবাসের পালা সাঙ্গ হ'ল। পথচলার গতি ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছি দেশের দিকে। মনের মধ্যে অনুভূতির আস্বাদ এবার অন্যরকম। উৎসাহ ও আনন্দ প্রচুর। তার সঙ্গে ভাবনা আশঙ্কারও মিশ্রণ যে নেই এমন নয়। কি-জানি, সকলে কেমন আছেন স্বদেশে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি, অতি-বৃদ্ধা শ্বাশুড়ি, তাঁদের জন্য চিন্তা প্রবল হ'লেও আপনজন আরও সকলেই তো আছেন। ভাই-বোন, প্রিয়-পরিজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, যাঁদের সঙ্গে হৃদয়-মনের যোগ নিজের সংসারের সকলের চেয়ে বড় কম নয়। চিঠি এবং টেলিগ্রাম নিয়মিত পেয়েছি এবং কুশল-সংবাদ সকলেই জানিয়েছেন। তবুও, মনের কোণে আশঙ্কার ছায়া দেখা দিচ্ছে, দুর্ভাবনার ছায়া নামছে। আসার সময়ে যাঁরা আমাদের প্রদীপ্ত উৎসাহ দিয়ে হাসিমুখে সজলচোখে বিদায় দিয়েছেন, ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানালাম দেশে পৌঁছেও যেন তাঁদের প্রত্যেকেরই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই।

সকাল সাড়ে আটটায় আমস্টার্ডাম ছেড়ে ট্রেনপথে যাত্রা ক'রে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্যারিসে পৌঁছেছি। ছ'টায় পৌঁছুবার কথা, কিন্তু ট্রেন লেট্ ছিল দেড়ঘণ্টা।

প্যারিসে হোটেলে পৌঁছে সারাদিনের পর ডিনার খাওয়া গেল। আবার সেই প্যারিস্। এখানে পদার্পণ করা মাত্রই কুলীরা হাঙ্গামা ক'রে যা' তা' পারিশ্রমিক নিলে,

তারপরেই ট্যাক্সি। আমরা ওদের ভাষা বুঝতে পারি না ব'লে ওরা তার সুযোগ গ্রহণ করে। প্যারিস বিদেশীদের বড় ঠকায়!

রবিবার, ৭ অগাস্ট ১৯৪৯। 'অ্যাম্বাসাডার হোটেল', প্যারিস॥

এখানে খবর নিয়ে জানা গেল, প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে যাওয়ার প্লেন সপ্তাহে তিনদিন মাত্র। যেতে হ'লে কাল সোমবার, নয়তো বৃহস্পতিবার। কালই যাতে সীট্ পাওয়া যায় তার জন্য উনি ব'লে এসেছেন। যদি দিতে পারে, তাহ'লে কাল সকালে ন'টার মধ্যে জানাবে। আজ এখানকার ভূগর্ভ-ট্রেন মেট্রোতে চড়া হ'ল। স্টেশনগুলির নাম এমন অদ্ভুত যে, আমরা উচ্চারণই করতে পারি না। অনেক কষ্ট ক'রে প্রায় দু'শো লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে 'কন্‌কঁর্দ' (Concord) ব'লে এক জায়গায় নামা হ'ল। আবার অন্য ট্রেনে ক'রে 'নিয়ো' (Nevelleyo) নামে এক জায়গায় পৌঁছলাম। বুঝুন তো ব্যাপারটা! এত বড় নাম — এতগুলো হরফ — কিন্তু উচ্চারণ — 'নিয়ো'! উপরে উঠে কোথায় যে যাবো তা' জানি না। এখানে একটি লোকও ইংরাজি জানে না। বরাতক্রমে কোনও বিদেশী পেলে তবেই কথা বলা ও বোঝা যায়। শেষে ওখান থেকে একটি ট্যাক্সি ক'রে পূর্বপরিচিত বাঙালি বন্ধু মিস্টার ব্যানার্জীর বাড়ি যাওয়া হ'ল। প্রায় ঘণ্টা দুই গল্পগুজবে কাটিয়ে ওঁদের কাছে যে সকল জিনিসপত্র আমরা গতবারে রেখে গিয়েছিলাম সেগুলি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ওঁদের বাড়ির কাছেই মেট্রো স্টেশনের নাম—Maillto। কিন্তু, — উচ্চারণ, মাইয়ো। যদি হরফগুলো সব উচ্চারণই

করবে না তাহ'লে মিছামিছি অতগুলো হরফের বাজে খরচ করা কেন বাপু? বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র সব খুলে আবার বাক্সে ঠিক ক'রে প্যাক্ ক'রে নেওয়া হ'ল। কাল সকালেই যদি খবর আসে প্লেনে সীট্ আছে, তাহ'লে কালই বোম্বাই রওনা হতে হ'বে। আজ রাত্রে আমরা Casinoতে যাবো। টিকিট কেনা আছে।

সোমবার, ৮ অগাস্ট ১৯৪৯। 'অ্যাম্বাসাডার হোটেল', প্যারিস॥

আজকে মন ভাল নেই। প্লেনে আজ তো সীট্ পাওয়া গেলই না, আগামী বৃহস্পতিবারেও পাওয়া যাবে কিনা তারও স্থিরতা নেই। আমি আজ আর কোথাও বেরুই নি। উনি খাওয়ার পর কলকাতায় টেলিগ্রাম ক'রে এলেন। সারা দুপুর ঝির্‌ঝির্ বৃষ্টি হয়েছে। পাঁচটার পর ঘরেই চা দিতে বলা হ'ল। চা ও খাবার খেয়ে আমি চুপচাপ্ ব'সে রইলাম এবং উনি একটু ঘুরতে বেরুলেন। মন মেজাজ খারাপ। শরীরও ভাল ঠেকছে না। এবেলা রাত্রে আমি ফল খেলাম। অসম্ভব দাম। একটি কলা ৬০ ফ্রাঙ্ক। একটি ন্যাস্‌পাতি ৮০ ফ্রাঙ্ক। কিছু আঙুর ১০০ ফ্রাঙ্ক। এরা বেজায় চার্জ করে বিদেশীদের উপর। হোটেলে টেলিগ্রাম করতে গিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন প্রতি শব্দে কত ক'রে খরচ পড়বে? হোটেলের লোকরা বললে, এক-একটি শব্দে ১৪০ ফ্রাঙ্ক ক'রে খরচ পড়ে। আমি ওঁকে বল্‌লাম, 'পাশেই তো পোস্টঅফিস, গিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে এসো।' উনি টেলিগ্রাম ক'রে এসে বললেন —'প্রতিশব্দে আশি ফ্রাঙ্ক ক'রে খরচ পড়ে।' বুঝুন, এ কোন্ দেশে এসেছি!

মঙ্গলবার, ৯ অগাস্ট ১৯৪৯। 'অ্যাম্বাসাডার হোটেল', প্যারিস॥

আজ সকালের দিকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের পথে টি. ডব্লিউ. এ. অফিসে গিয়ে আমরা বললাম, 'বৃহস্পতিবারে প্লেনে আমাদের সীট্ দিতেই হবে।' তারা বললে, বিশেষ চেষ্টা করবে, কিন্তু আগে থাকতে বুক্ড্ থাকলে তারা নিরুপায়। ওখান থেকে আমেরিকান এক্সপ্রেসে দেশের চিঠিপত্রের খোঁজ নিয়ে আমরা এক রিলিফ্ ফোটোর দোকানে ঢুকলাম। গতবারে এখান থেকে আমার একখানি ছবি তোলার সব ঠিক্ঠাক হয়ে তারপরে আর হয়ে ওঠেনি। এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। ছবি তোলার আগে একটি পেণ্টার-মেয়ে এসে আমাকে 'মেক্-আপে'র ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রথমে 'মেক্-আপ' ক'রে দিলে, তারপরে আমাকে নিয়ে গেল ছবি তোলার ঘরে। সে-ঘরখানির ভিতরে আগাগোড়া নানারকমের যন্ত্রপাতি ফিট্ করা আছে। এরা কেউই ইংরাজি বলে না এবং বোঝেও না। সব হাতমুখ নেড়ে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়। অফিস ঘরে একটিমাত্র ভদ্রমহিলা আছেন, যিনি ইংরাজি কথাবার্তা বুঝতে ও বলতে পারেন। যাই হোক্, ওরা আমাকে যেমন-ইচ্ছা বসিয়ে ছবি তুললে। ছবি তোলার পর আমরা বাসে ক'রে হোটেলে ফিরলাম।

বিকেলে চারটের সময় বেরিয়েছিলাম। কাছেই 'লাফায়েৎ গ্যালারি'। ওখানে ঢুকে আমার একটা শাড়িপীস্ ও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে ছ'টায় ফিরে চা খেলাম। উনি সাতটার সময় আবার বেড়াতে গেলেন। আমি আর গেলাম না।

এইমাত্র T. W. A. থেকে ফোনে খবর এলো, আমাদের প্যাসেজ বৃহস্পতিবারে বুক্ড্ হ'য়ে গেছে। শুনে বড় আনন্দ

হ'ল! আমার খুব মজা লাগছে। এইবার বাড়ি ফিরবো! এখানে আর মন টিঁকছে না।

বুধবার, ১০ অগাস্ট ১৯৪৯। 'অ্যাম্বাসাডার হোটেল', প্যারিস ॥

আজ যাত্রার বন্দোবস্ত সব হ'য়ে গেল। আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ইনভ্যালিডে যেতে হবে আমাদের। ওরা আমাদের নিয়ে এরোড্রোমে যাবে এবং রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটে প্লেন ছাড়বে। শুক্রবার রাত্রি দু'টো ৪৫ মিনিটে আমরা বোম্বে পৌঁছবো।

আজ লাঞ্চ খেয়ে ট্যাক্সি ক'রে বোয়া দে বুলোঁ নামে সেই সাত মাইল স্কোয়ার গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে সেই বাগানের মধ্যে ট্যাক্সি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হয়েছে এবং মাঝে মাঝে নেমে ছবি তোলা হয়েছে অনেকগুলি। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে দেখে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে 'এ্যাভেনিউ ফোঁ'তে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। 'এ্যাভেনিউ ফোঁ' ভারি সুন্দব রাস্তা। এটি হচ্ছে বড়লোকের পাড়া! দু'ধারে চওড়া পার্ক, সবুজ লন ও নানারকম ফুলের বেড্-এর মধ্যে খুব চওড়া ঝক্‌ঝকে সুন্দর রাস্তা। সেখানে দুধারে সবুজ লনগুলির ধারে রাস্তায় অসংখ্য চেয়ার পাতা আছে দেখে দু'খানি চেয়ারে আমরা বসতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এক বুড়ি মেম এসে হাত মুখ নেড়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি বলতে লাগলো কিছুই বুঝতে পারি না। শেষে সে হাতের টিকিট দেখাতে বোঝা গেল, এখানে চেয়ারে বসলে ৩০ ফ্রাঙ্ক ক'রে লাগবে। আমরা আর কোনও কথা না ব'লে উঠে অন্য রাস্তা ধ'রে হাঁটতে সুরু ক'রে দিলাম। পিছনে সেই বুড়ি তখনও সাঁ

সে সোঁ সোঁ ফু ফাঁ ইত্যাদি ক'রে দুর্বোধ্যভাষায় বঁ'কে যাচ্ছে।

এরা রাত্রি ন'টার পরই ডাইনিংহল বন্ধ ক'রে দেয়। খেয়ে উঠে যখন বেরুচ্ছি তখন কয়েকটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমরা একসঙ্গেই প্লেনে ক'রে আম্স্টার্ডামে এসেছিলাম এবং প্যারিসেও এসেছি। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পের পর আমি উপরে এলাম এবং উনি একটু ঘুরতে বেরুলেন। আমাদের বেড়ানোর গল্প শুনে আমেরিকান ছেলেগুলি বলেছিল—'এত বড় ট্রিপ্ আমরা শুনিনি। আমরা হ'লে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।'

এদেশের মানুষগুলি দেখতে অতিসুন্দর। উনি কেবলই বলেন—'দেখ দেখ, ওয়েটারগুলো যেন এক-একটা রাজপুত্র! আমাদের দেশে এরা গেলে শুধু চেহারার জোরেই নব্বই নম্বর মেরে নেবে, কি বলো?'

সত্যিই, এদের চাকরানী, চাকর, রাঁধুনি, ঝাড়ুদারগুলিরও চেহারা, আদবকায়দা, ব্যবহার, কথাবার্তা উন্নত ধরনের এবং অনুকরণের যোগ্য। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজাতবংশীয় তাঁদের কথা তো বাদই দিতে পারা যায়। হাজার হোক, ফরাসীরা একটা বনেদী জাত। আজ অভাবে প'ড়ে একটু অসাধু ব'নে গেছে!

বৃহস্পতিবার, ১১ অগাস্ট ১৯৪৯। T. W. A. প্লেন,
রাত্রি : ১১—২০ মিনিট॥

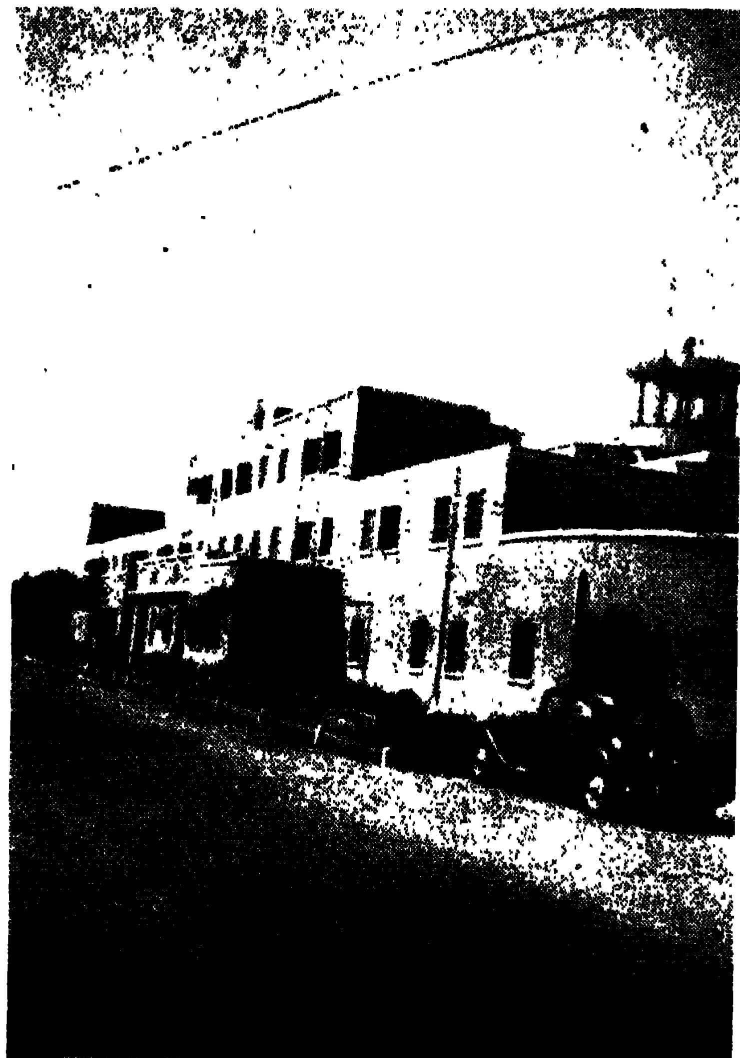
আজ সন্ধ্যা সাতটার আগেই আমরা ইন্‌ভ্যালিডে এসেছিলাম। মাল ওজন করা, টিকিট, পাস্‌পোর্ট সব ঠিক ক'রে

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আমরা লাউঞ্জে বসলাম। একটু পরেই আমাদের ডাক এলো বাসে ওঠার জন্য। এদের বাসে ক'রে এরোড্রোমে এসে হেল্‌থ, পুলিশ, পাসপোর্ট ও কাস্টম্‌স্‌ সেরে আমরা প্লেনে উঠলাম। প্রায় ন'টা কুড়ি মিনিটে প্লেন ছাড়লো। প্যারিস দেখা শেষ হ'ল। ক্রমশঃ প্লেন উপরে উঠছে। অন্ধকারে আলোর দীপালী দেখতে খুব ভালো লাগছিলো। প্লেন উপরে উঠে সমান লেভেলে চলতে সুরু করতেই আমাদের ডিনার দিয়ে গেল। ডিনার খাওয়ার একটু পরেই ঠিক এগারোটার সময় আমরা জুরিখে এসে নামলাম। এখানে কুড়ি মিনিট বিশ্রাম। নেমে বেশ শীত করছিল, বাইরে তখন টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি হচ্ছে।

শুক্রবার, ১২ অগাস্ট ১৯৪৯। T. W. A. প্লেন, বেলা এগারোটা॥

প্লেনে আমার কিছুতেই ঘুম হয় না। ভোরের দিকে ঘণ্টাখানেক তন্দ্রা এসেছিল। কাল জুরিখ থেকে প্লেন ছাড়ার পরই আমার স্বামী দিব্যি কম্বলটি গায়ে টেনে নিয়ে বেশ ঘুমোতে লাগলেন। রাত্রি দু'টো পাঁচ মিনিটে রোমে প্লেন নামলো। ওঁকে ডেকে তুলে নিয়ে দু'জনে নামলাম। রোমে নেমে অনেকক্ষণ ঘোরা গেল। পূর্বেকার চেনা ঘরগুলি বেশ লাগছিল। কিছু ইটালিয়ান অর্থ 'লিরা' সঙ্গে ছিল। মনে করেছিলাম কিছু কিনে নেবো ঐ লিরাতে। কিন্তু পছন্দমত জিনিস কিছুই ঐ লিরার মধ্যে পাওয়া গেল না। সুইজার-ল্যাণ্ডের সুইস্‌-ফ্রাঙ্ক এখানে চলে, কিন্তু তা' দিয়ে উনি জুরিখ থেকে পাঁচটি চুরুট কিনে নিয়েছেন। রোমে চল্লিশ মিনিট থেকে আবার প্লেন ছাড়লো।

প্লেনের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট দিলে। ব্রেকফাস্টের পর আটটা দশ মিনিটে কায়রোয় নামলাম। কায়রোতে এক ঘণ্টার মত ছিলাম। ভীষণ গরম। তখন আর চা খেতে ইচ্ছা হ'ল না,



কায়রো বিমানক্ষেত্র

কোকাকোলা খেলাম। আবার দেখলাম সেই বিরাট বিরাট দৈত্যের মত লোকগুলো ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'ডেজার্ট-ইন্' নামে একটিই রেস্টুরেন্ট ওখানে। সেখানে

পাখা খুলে দিয়ে আমাদের বসালে। কাস্টম্‌স্‌ এবং পুলিশের সেই লোকগুলি, যারা আমাদের অনর্থক বিষম হায়রান ক'রে ভুগিয়েছিল কায়রোয় নামার সময়ে, তারাই ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। এখান থেকে ন'টার পর আমাদের প্লেন ছাড়লো। এবার ব'লে দিলে, আমরা ১৭০০০ ফীট্‌ উপর দিয়ে ২৩০ মাইল গতিতে যাবো।

সুয়েজ ক্যানেল পার হয়ে এলাম। ঘন নীল সমুদ্রের রং, আর দূরে সবই গৈরিক মরুভূমি। বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে বস্‌রায় এসে নামলাম। প্লেন থেকে নামার সময় আগুনের মত গরম বাতাসে মনে হচ্ছিল, হাত পা গা যেন পুড়ে গেল। ট্র্যানজিট প্যাসেঞ্জারদের অন্য দিক্‌ দিয়ে ঢুকিয়ে এনে বসালো। এদের দেশে যাত্রীদের প্রতি এত বেশি সতর্ক পাহারা যে, মনে হয়, এরা যেন কোনও শ্রেণীর কোনও মানুষকেই বিশ্বাস করে না। কারণ, এ-রকম অতিসতর্ক পাহারা ও চোখে-চোখে বন্দী রাখার ব্যবস্থা তো অন্য কোনও দেশের কুত্রাপি দেখলাম না। একগ্লাস ক'রে লেবুর রস খেলাম। কেউ কেউ চা বা কফিও নিলেন। অত গরমে বরফ-মেশানো ফলের রসই ভালো লাগে। আজ বস্‌রার তাপের মাত্রা ১০৯ ডিগ্রি। এখানে নামার আগে সকলের ক্যামেরা ও পাসপোর্ট নিয়ে নিলে, পাছে কেউ ছবি তুলে নেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে আবার আমরা রওনা হ'লাম। এর পরেই সৌদি আরেবিয়ায় বিরাম। আমরা তু'জনে ব'সে তাস নিয়ে 'ফিস' খেলছি দেখে স্টুয়ার্ড এসে আমাদের সঙ্গে খেলতে বসলো। তারপরে মিসেস মিস্ত্রি এসে যোগ দিলেন। ইনি আমাদের সহযাত্রী। একে একে অনেকেই খেলা দেখতে

এলেন। বেশ কাটলো কিছুক্ষণ। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আলো নিভিয়ে একটু চোখ বুজে নেওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রি আড়াইটার সময় বোম্বেতে নামতে হবে।

শনিবার, ১৩ অগাস্ট ১৯৪৯। 'তাজমহল হোটেল', বোম্বে ॥

সারারাত্রি আমার ঘুম হয়নি। প্লেন আজ লেট্-এ এসে পৌঁছেছে। শেষরাত্রে প্রায় চারটের পর প্লেন বোম্বেতে পৌঁছলো। যাত্রীদের মধ্যে চারজন সাহেব এবং আমরা দু'জন বাঙালি ছাড়া আর সকলেই বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী। মাদ্রাজ এবং বোম্বের লোকদের নিতে তাদের আত্মীয়স্বজনরা গাড়ি এবং ফুলের মালা, তোড়া প্রভৃতি নিয়ে এসেছেন দেখলাম। বোম্বাইতে আমাদের আত্মীয় বা বন্ধু কেউ নেই, সুতরাং এখানকার বিমানঘাঁটিতে আমরা একাই। আমরা যখন দম্‌দম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছব, তখন আমাদের জন্যও অনেকগুলি হাসিমুখ অপেক্ষা ক'রে থাকবে কল্পনা ক'রে মনটা উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠছিল।

সকাল সাড়ে ছ'টায় তাজমহল হোটেলে এলাম। যাওয়ার দিন অল্পক্ষণে ভাল ক'রে দেখিনি। আজ দেখলাম তাজমহল হোটেলটি বিরাট। ইয়োরোপের বড় বড় হোটেলের পাশে দাঁড়াতে পারে। এখানে বাসকক্ষ আছে তিনশো। সম্পূর্ণ ইউরোপীয়ান পদ্ধতিতে হোটেলটি সুসজ্জিত ও পরিচালিত। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এই শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হোটেলটির সম্মুখেই বোম্বায়ের সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেট্'। দু'একদিন বোম্বাইয়ে থেকে আমরা কলকাতা রওনা হলাম।
